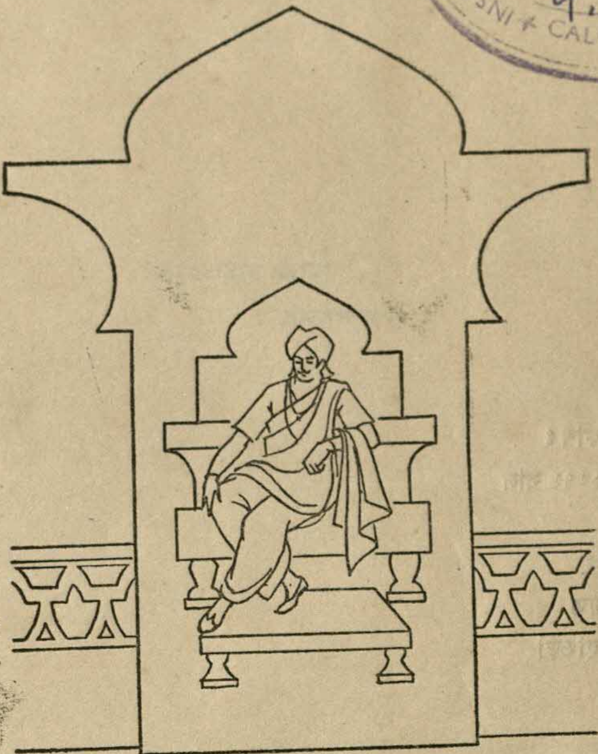

রাজদরবার
দ্বৈপায়ন



সেটা তেরো শতকের কথা। বাংলায় মুসলমান শাসনের মধ্যযুগ। ছশো বছরের মুসলমান শাসনে দেশ তখন ক্ষতবিক্ষত। বিধর্মীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বহু গুণ। দরবেশ আর মোল্লাদের অত্যাচারে নিপীড়িত হিন্দু সমাজ দ্বিধা বিভক্ত। বাংলার ভাগ্যাকাশে সূর্য প্রায় অস্তাচলে। বিধর্মীর অত্যাচারে চারিদিকে হাহাকার, আর্তনাদ—আর নারীধর্ষণ। দরবেশের পরামর্শে মোল্লারা ধর্মান্তরিত করছে অবিরত। পৃষ্ঠপোষক সুলতান গিয়াসুদ্দীন তাদের হাতের ক্রীড়নক। কিন্তু কাল সকলকে গ্রাস করে। গ্রাস করল সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে। গ্রাস করল পরবর্তী সুলতান সৈফুদ্দীনকে—শিহাবুদ্দীনকে। বাংলার মসনদ এল হিন্দুর অধিকারে। মহারাজা হলেন ভাতুড়িয়ার ভূ-স্বামী গণেশ নারায়ণ। বাংলার আকাশে উড়ল বাঙ্গালী হিন্দুর বিজয়-পতাকা। কিন্তু সেটা কতদিনের জন্য?…

দ্বৈপায়ন



রাজদরবারে

॥ পরিবেশক ॥
আধুনিক ॥ ১১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন ১৩৭৬ সাল

প্রকাশক :
শ্রীদীপক দত্ত
শিবপুর, হাওড়া

মুদ্রক :
শ্রীসুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

দশ টাকা

সনৎকুমার জানা
শ্রদ্ধাষ্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

ঘেরাও
রক্তাক্ত গৌড়
রাজতরঙ্গিনীর দেশে
রক্তস্নাতা মধুমতী
বাঈজী থেকে বেগম
মোগল হারেম
মেহেরউন্নিসা
মতিবাঈ
জিন্নৎউন্নিসা
হারেমের কোহিনুর
এই রোদ এই বৃষ্টি
বর্গী এলো দেশে

রাজদরবার

RAJ DARBAR

A Historieal Novel By

DWAIPAYAN

Rupees Ten Only

এক

হিন্দুরা জিম্মি, হিন্দুরা কাফের, মুসলমান রাজ্যে কাফের হিন্দুর কোন স্থান নেই; তারা আশ্রিতের মত জীবন যাপন করবে, নাগরিকের প্রধান প্রধান অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে। নিজের দেশে হিন্দু পরবাসী, বাংলার মাটিতে বাঙ্গালী হিন্দুর কোন অধিকার নেই। বাঙ্গালা হিন্দু দিনের পর দিন, নীরবে নতমস্তকে মুসলমানের শত অন্যায় অত্যাচার সহ্য করবে, প্রতিবাদ করতে পারবে না, হিন্দুর প্রতি মুসলমানের কোন অন্যায়ের প্রতিকার নেই। শাস্ত্রের বিধান—কোরাণ, হাদিস ও অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। সুফী দরবেশের দল সেই নির্দেশ প্রচার করেছে। দুনিয়া ইসলামের, একমাত্র মুসলমান তার অধিকারী। হিন্দু কাফের—হিন্দুর কোন অধিকার নেই। মুসলমান রাজ্যে হিন্দু পারবে না কোন দেব-দেবীর মূর্তির জন্যে মন্দির তৈরি করতে। হিন্দুর চোখের সামনে মুসলমান যদি তার ঘরের ইজ্জৎ লোঠে তাহলেও তাকে চুপ করে থাকতে হবে, বাধা দিতে পারবে না, বাধা দিয়েও কোন লাভ নেই—শুধু মরবে।

হিন্দুর মৃত্যু কাল শুরু ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে যেদিন পৃথ্বীরাজ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলেন মুহম্মদ-বিন্-সাহের (শিহাবুদ্দিন ঘোরী এবং মুইজুদ্দিন ঘোরী নামেও পরিচিত) কাছে। গজনীর সুলতান মহম্মদ ঘোরী আর্যাবর্তে প্রতিষ্ঠা করলেন মুসলিম রাজ্য। শুরু হল হিন্দুর দুর্ভাগ্যের কাল।

কিন্তু তারও আগে, মুহম্মদ ঘোরীর মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার আরো পাঁচশো বছর আগে থেকে (৭১২ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতবর্ষের দ্বারে করাঘাত শুরু করেছে মুসলমান। আরবী, গজনী, ঘোরী, আফগান,

তুর্কী, মোগল বিভিন্ন প্রবাহে সম্পদের লোভে ছুটে এসেছে বার বার।

বাংলা ছিল স্বাধীন। মহারাজ লক্ষণ সেন তখন গোড়ের রাজা। ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী অতর্কিত ভাবে জয় করলেন নদীয়া। মহারাজ লক্ষণ সেনের সাধের লক্ষণাবতী হল হস্তচ্যুত। কালে সমস্ত বাংলা হল মুসলমানের পদানত, বাঙ্গালী হিন্দু হল আপন অধিকার হারা।

আজ বাংলা কাঁদে, কাঁদে বাঙ্গালী, অসহায় দুর্বলের কান্না। বাংলার গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে শুধুমাত্র আর্তনাদ আর হাহাকার। হিন্দু মার খাচ্ছে, মরছে। কে প্রতিকার করবে,—কে ?

চমকে উঠলেন তিনি। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলেন, একটু বিহ্বলতা, অনেকক্ষণ নীরব-নিস্পন্দ ভাবে বসে রইলেন।

এক সময় উঠলেন তিনি। নীচু হয়ে ছইয়ের নীচু থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আজ অমাবস্যা। নিকষ কালো আকাশে অসংখ্য নীল নীল তারাগুলো হীরকখণ্ডের দ্যুতিতে উজ্জল হয়ে আছে। সেই তারা ভরা আকাশের সীমাহীন শূন্যতার দিকে নির্মিমেষ চেয়ে রইলেন। চেয়ে থাকতে-থাকতে এক সময় নিজের অজান্তেই বক্ষ ভেদ করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর। আবার চমকে উঠলেন।

আজ তিনি অস্থির। কিছুটা চঞ্চল। কী যেন হয়েছে আজ তাঁর। কেবলই মনে হচ্ছে কোথায় যেন ভুল হয়েছে, ভুল করেছেন তিনি। যে ভুল আজ তাঁকে সমস্ত দিন এতটুকু স্থির হতে দেয়নি। মা অসুস্থা ; তিনি তো মার কাছেই চলেছেন। সব কাজ ফেলে রেখে ছুটে যাচ্ছেন। না-না, মার জন্যে নয়। জননীর জন্যে তিনি চিন্তিত, দুর্ভাবনারও অন্ত নেই, কিন্তু এই অস্থিরতা তাঁর জন্যে নয়। তিনিই নিষেধ করেছেন তাঁকে। বার বার বলেছেন, কর্তব্য আগে। কর্তব্যকে অবহেলা করে কখনো হৃদয়াবেগকে

প্রাধান্য দিও না, তাতে অনর্থ বাধবে, ইষ্টের থেকে অনিষ্টশঙ্কাই বেশি।

তবু যখন ব্রজ এসেছিল, কুশল বিনিময়ের সময় জননীর অসুস্থতার সংবাদ দিয়েছিল, তখন তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন। সাধ্যমত হাতের কাজ সমাধা করে যাত্রা করেছিলেন গৃহাভিমুখে। মহানন্দার বুকে পাণ্ডুয়া থেকে ভাতুড়িয়ার পথে যাত্রা করেছিল তাঁর নৌকা খানি।

তখন গোধুলি লগ্ন। আকাশে বাতাসে আলো ছায়ার লুকোচুরি খেলার সময়। পাখির ডাকে নদীর দু পাশের বনভূমি মুখর। পল্লীবধূদের সন্ধ্যাদীপের শিখা কোথাও কোথাও দৃষ্টি গোচর হয়েছিল।

ছইয়ের নীচে শয্যার ওপর শরীরটাকে মেলে দিয়েছিলেন তিনি। নদীপথে দু পাশের বনভূমি-গ্রাম দেখতে দেখতে এক সময় চোখ বুজে এসেছিল। দীর্ঘদিনের এক ঘেয়েমী কর্মব্যস্ততার মাঝ থেকে কদিনের অবসর পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল তাঁর। ব্রজ ডাকছে। তিনি তার মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

ব্রজ ডেকেছিল, বড় মশায়!

কী রে? তিনি হাসতে চেয়েছিলেন।

ওরা জিজ্ঞাসা করছে নৌকা বাঁধবে কী না? বলেছিল ব্রজ।

নৌকা বাঁধবি, কেন? প্রথমটায় তিনি একটু অবাক হয়েছিলেন। ব্রজর কথাটা বুঝতে পারেন নি। তারপর আকাশের দিকে চেয়েছিলেন। কখন গোধুলি পার হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়েছে, রাত্রি এসেছে চুপে চুপে, তিনি হাসতে পারেন নি।

ব্রজকে নীরবে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেছিলেন, ওদের নৌকা বাঁধতে বল ব্রজ!

আদেশ পেয়ে সামনের চরে ওরা নৌকা বেঁধে ছিল। মশাল

জ্বালিয়ে আয়োজন করেছিল রান্নার। এই নিয়ম, অলিখিত নিয়ম--বিশ্রামের অবকাশ মিললে ওরা প্রথমে সাঙ্গ করে আহারের আয়োজন। আজ আহারের পাট নেই, অমাবস্যার উপবাস আজ তাঁর। ওরা চলে যেতে তিনি আবার তাই শয্যায় শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি একা। একাকী শুয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ঘুম আসেনি আর। শুয়ে শুয়ে ভেবেছিলেন। অতীত, বর্তমান। অতীতের বাংলা, সোনার বাংলা। বাঙ্গালীর শৌর্য্যে-বীর্য্যে, সুখে-সম্পদে ভরা বাংলা। আজও সম্পদ আছে, কিন্তু সুখ নেই। বাংলার বুক থেকে, বাঙ্গালী হিন্দুর প্রতি পদক্ষেপে ভয় আর ভয়। শান্তি হারিয়ে গেছে, কেড়ে নিয়েছে ওরা, ওই অত্যাচারীর দল।

আর তিনি? তাঁর মত হিন্দুরা? নীরবে, নতমস্তকে মেনে নিয়েছেন সব কিছু। কারণ স্বার্থ! স্বার্থ বৈকী। গোলামীর খাতায় নাম লিখিয়ে আমীর হয়েছেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ আজ তাঁর প্রভু। তিনি তাঁর কাছে দাসখত লিখে দিয়েছেন। তাঁর শত অন্যায় অত্যাচারে সমর্থন জানিয়েছেন, একটিদিনের জন্যেও প্রতিবাদধ্বনী উচ্চারণ করেন নি।

না-না, তা নয়! কোন কোন বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন বৈকী, কিন্তু লাভ কিছু হয়নি, সুলতান মেনে নেন নি তাঁর প্রতিবাদ, প্রতিকারও করেন নি। অথচ তিনি কি না করেছেন গিয়াসুদ্দীনের জন্য! দীর্ঘ কুড়ি বছর আগে, যেদিন গিয়াসুদ্দীন সুলতান হন নি, ইলিয়াস শাহী বংশের সাধারণ শাহজাদা মাত্র। পিতা সিকন্দর শাহের অসংখ্য পুত্রের মধ্যে একজন।

ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম পুরুষ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। পূর্বনাম মালিক ইলিয়াস হাজী। পূর্ব ইরানের খিজিস্থানে ছিল আদি-নিবাস। ভাগ্যান্বেষণে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলায়। দিল্লীর মসনদে তখন জুনা খান। মুহম্মদ শাহ নাম নিয়ে পিতার

মৃত্যুর পর মসনদে বসেছিলেন। ইতিহাসে তিনি মুহম্মদ তুগলক নামে পরিচিত।

গৌড় তখনও লখনৌতি। মসনদে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ। সামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর জেষ্ঠ্য পুত্র শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ বসেছিলেন মসনদে কিন্তু কটামাসের মধ্যেই বিদ্রোহী হলেন গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ। আক্রমণ করলেন লখনৌতি। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে গেলেন শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ আর নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ। অন্যান্য ভাইয়েরা নিহত হলেন গিয়াসুদ্দীনের হাতে।

যে মসনদের জন্যে ভাইয়েদের বুকে ছুরি চালাতে দ্বিধা করেননি গিয়াসুদ্দীন, সেই মসনদে তিনিও স্থিরভাবে বসতে পারলেন না। শিহাবুদ্দীন আর নাসিরুদ্দীন দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুগলকের পিতা গিয়াসুদ্দীন তুগলকের সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

গিয়াসুদ্দীনও পুত্র জুনা খানের হাতে দিল্লীর ভার দিয়ে এগিয়ে এলেন শিহাবুদ্দীন আর নাসিরুদ্দীনের সাহায্যে। পূর্ব ভারতের সোনার স্বপ্ন তিনি অনেক আগেই দেখেছিলেন, সাহসী হননি শুধুমাত্র সহযোগীর অভাবে। ত্রিহুতে নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ গিয়াসুদ্দীনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার পরেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন তুগলক প্রথম আক্রমণ করলেন ত্রিহুত। হিন্দু রাজ্য ত্রিহুত। রাজা কর্ণাট বংশীয় হরিসিংহদেব। হরি সিংহ বশ্যতা স্বীকার করলেন না, মেনে নিলেন না পরাজয়। ত্রিহুতে হিন্দু বীরের দল বুকের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু দিয়েও যুদ্ধ করল, প্রাণ দিল দেশের স্বাধীনতা রক্ষায়। ত্রিহুতের আকাশে উড়ল মুসলিম পতাকা, গিয়াসুদ্দীন তুগলক প্রতিষ্ঠা করলেন মুসলিম শাসন।

এবার লখনৌতি। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন তুগলক নিজে না এসে তাঁর পালিত পুত্র তাতার খানের অধীনে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী

নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে দিলেন। নাসিরুদ্দীন আর তাতার খানের মিলিত সৈন্যবাহিনী অধিকার করল লখনৌতি।

গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ প্রথমে পালিয়ে গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝতে পারলেন পালিয়ে থেকে তিনি বাঁচতে পারবেন না, সেই মূহুর্তে এগিয়ে এলেন। উভয় পক্ষে শুরু হল যুদ্ধ। পরাজিত হলেন গিয়াসুদ্দীন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হল গিয়াসুদ্দীন তুগলকের কাছে। গিয়াসুদ্দীন তুগলক বিচার করলেন গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহের। না—মৃত্যু দণ্ড তিনি দিলেন না, আজীবন বন্দী থাকবেন অপরাধী, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। তিনি বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

বাংলা হল তুগলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। নাসিরুদ্দীনকে ফিরিয়ে দিলেন লখনৌতির অধিকার। সাতগাঁও আর সোনার-গাঁওয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন তাতার খান। তার পরদিন বাংলার লুণ্ঠিত ধনসম্পদ ও বন্দী গিয়াসুদ্দীনকে নিয়ে দিল্লী যাত্রা করলেন। কিন্তু দিল্লীর উপকণ্ঠে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন তিনি। জুনা খান বসলেন দিল্লীর মসনদে। হলেন মুহম্মদ শাহ।

১৩২৫ খৃষ্টাব্দ। মসনদে আরোহণ করার পরেই মুহম্মদ শাহ বাংলা দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করলেন। লখনৌতি অঞ্চলের শাসনভার কেবলমাত্র নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহের হাতে না রেখে, সহযোগী শাসনকর্তা রূপে দিল্লী থেকে পাঠালেন পিণ্ডার খিলজী (কদর খান) কে। মালিক আলিরেজা এলেন উজীর হয়ে। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহকেও তিনি মুক্তি দিলেন। তাতার খানকে (বাহারাম খান) সহযোগী শাসন কর্তা করে পাঠিয়ে দিলেন সোনার-গাঁওয়ে। মালিক ইজুদ্দীন য়াহয়াকে পাঠালেন সাঁতগায়ের শাসন কর্তা করে। যুবক শামসুদ্দীন এই ইজুদ্দীন য়াহয়ার সঙ্গেই এসেছিলেন বাংলায়।

মাত্র দুটো বছর। দু-বছর মোটামুটি শান্ত ছিল বাংলা।

সুশাসনে শান্তি ফিরে আসছিল। প্রজাদের অভাব অভিযোগ ছিল, ছিল না রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

দু-বছর পরে অকস্মাৎ আবার শুরু হল হানাহানি। মুলতানের শাসনকর্তা কিমলু খান বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মুহম্মদ শাহকে সাহায্য করার জন্যে বাংলা থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লী যাত্রা করলেন নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই হয়তো ছিলেন গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ। তিনিও বিদ্রোহী হলেন, কিন্তু বাহারাম খানের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী হলেন। এবার আর বন্দী মুক্তি পেল না। বাহারাম খান তাঁকে বধ করে তাঁর গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন দিল্লীতে মুহম্মদ তুগলকের কাছে।

তারপর দশটি বছর বাংলা শান্ত। এতটুকু অশান্তি নেই কোথাও। কিন্তু অশান্তি দেখা দিল আবার, দশ বছর পরে। বাহারাম খানের মৃত্যু হল। বিদ্রোহী হলেন বাহারাম খানের বর্ম রক্ষক ফখরুদ্দীন সোনার গাঁও অধিকার করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষনা করলেন তিনি। নাম নিলেন ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ।

কিন্তু লখনৌতির শাসন কর্তা কদর খান, সাত গাঁওয়ের শাসনকর্তা ইজুদ্দীন য়াহয়া ফখরুদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। পরাজিত হলেন ফখরুদ্দীন, তাঁর সমস্ত সম্পদ হস্তগত হল কদর খানের। লুঠের বখরা নিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে শুরু হল বিবাদ, তারা তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে যোগ দিল ফখরুদ্দীনের সঙ্গে। নিহত হলেন কদর খান। ফখরুদ্দীনের গতি রোধ করা আর কারো পক্ষে সম্ভব হল না। মুহম্মদ তুগলকও তা চাননি। তিনি তাঁকে মেনে নিয়েছিলেন।

ফখরুদ্দীনের পুত্র ইখতিয়ারুদ্দিন। এই ইখতিয়ারুদ্দিনকে হত্যা করেই ৭৫৩ হিজরায় (১৩৫২-৫৩ খ্রীঃ) সোনার গাঁও অধিকার করলেন শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। বাংলার বুকে শুরু হল ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্ব কাল।

শামসুদ্দিন ইলিয়াশ শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ, তারপর গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। ইলিয়াস শাহ ৭৪৩ হিজরায় (১৩৪২-৪৩খ্রীঃ) মসনদে বসেন। বাংলার বুকে নেমে আসে শান্তি। বাঙ্গালী স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

৭৫৯ হিজরায় (১৩৫৮-৫৯ খ্রীঃ) ইলিয়াস শাহ পরলোক গমন করলেন। মসনদে বসলেন সিকন্দর শাহ! তিনিই একমাত্র ভাগ্যবান সুলতান সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেছেন। বাংলার আর কোন সুলতান এত দীর্ঘদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। হয়তো আরো কিছুদিন রাজত্ব করতে পারতেন, কিন্তু পারলেন না। বিদ্রোহী হলেন গিয়াসুদ্দীম আজম শাহ।

পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী পুত্রকে সাহায্য করেছিলেন তিনি। যদিও অসমবয়েসী, তবুও তিনি তাঁর দোস্ত ছিলেন। বন্ধু বন্ধুর হাত দুটি জড়িয়ে ধরেছিলেন। করুণ আকুতি ঝরে পড়েছিল তাঁর কণ্ঠে। বলেছিলেন, দোস্ত, আমাকে তুমি সাহায্য করো, বাঁচাও!

তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন, চিন্তা করেছিলেন। গিয়াসুদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনার উত্তরে সহসা কিছু বলতে পারেননি।

অস্থির ভাবে পদচারণা করছিলেন গিয়াসুদ্দীন। ক্ষণে ক্ষণে হতাশা ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছিলেন। তিনি চিন্তা করছিলেন শাহজাদার অবস্থাটা। বিদ্রোহী পুত্র। পিতা হলে কী হয়, বিদ্রোহীর ক্ষমা নেই। সৈন্যদের হুকুম দিয়েছিলেন সিকন্দর শাহ, যেমন করেই হোক দমন কর বিদ্রোহীকে। হয় বন্দী নয় হত্যা।

কিন্তু গিয়াসুদ্দীন বিদ্রোহী হলেন কেন? চিন্তা করছিলেন তিনি।

গিয়াসুদ্দীন বলেছিলেন, আমি বাঁচতে চাই, ম্যায় জিন্দা রানে হুঁ। সেইজন্যেই আমার এই বিদ্রোহ। না হলে আমি মরে

যাব, আমাকে মেরে ফেলবে ওরা, আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় না।

কেন? প্রশ্ন করেছিলেন তিনি। জানতে চেয়েছিলেন। কেন বিদ্রোহী হয়েছেন? রাজ্য শাসনের সমস্ত দায়িত্বই তো সিকন্দর শাহ তাঁকে দিয়েছেন। তাহলে কেন তিনি এ বিরোধের সৃষ্টি করলেন?

কেন? একটু ম্লান হাসির শীর্ণরেখা তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটেই মিলিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল সব। কিছুই গোপন করেননি।

সিকন্দর শাহের দুই বেগম। প্রথমা বেগমের সতেরটি পুত্র, দ্বিতীয়ার একটি। তিনি একমাত্র সন্তান। তাঁর জন্মের পরই মৃত্যু হয়েছিল মায়ের। মাতৃহারা দুঃখ তাঁকে কাতর করলেও পিতার স্নেহ থেকে কোনদিনের জন্যেও বঞ্চিত হননি। তিনি যথা সময়ে তাঁর সবকিছুরই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সব বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। বিমাতার শত প্ররোচনাতেও কর্ণপাত করতেন না।

এমনিভাবেই চলছিল। সামান্যব্যাপার বলেই উড়িয়ে দিতেন সব কিছু। কিন্তু সম্ভব হলনা একদিন, যেদিন সিকন্দর্ শাহ তাঁর কার্যভার তার হাতে তুলে দিলেন। নামে সুলতান রইলেন তিনিই কিন্তু সমস্ত কিছু দায়িত্ব তাঁর। বিরোধ উঠল চরমে। অশান্তি আর অশান্তি। এবার প্রকাশ্যে বিমাতা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ শুরু করলেন।

তবু একদিন তিনি তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। আম্মা বলে ডেকেছিলেন তাঁকে। বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে আম্মাজান!

আমার সঙ্গে! অবাক হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন আমার সঙ্গে আপনার কোন কথা থাকতে পারে না সুলতান!

সুলতান! আশ্চর্য হয়েছিলেন তিনি। সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল তাঁর। লজ্জায় মাথা নত করেছিলেন।

মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, এ আপনি কী বলছেন আম্মা! ওকথা বললে আমার গুণাহের শেষ থাকবে না, মেহেরবান খোদার দোয়া পাবো না আমি। আমি আদমী, আপনার সন্তান ইবলিশ বানতে আমি চাইনা!

বেগম হেসেছিলেন। করুণ আকূতি তাঁর মর্ম স্পর্শ করেনি। বলেছিলেন, দুদিন পরে তুমিই যে সুলতান হয়ে মসনদে বসবে এতো মিথ্যা নয়?

আমি মসনদে বসবো! আবার চমকে উঠেছিলেন তিনি। রাজ্য শাসনের ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত হলেও মসনদ নিয়ে তিনি কোনদিন চিন্তা করেননি। মসনদ সুলতানের। জিন্দা রয়েছেন তিনি। যতক্ষণ তিনি আছেন ততক্ষণ মিথ্যা চিন্তায় লাভ কী! তাঁকে কর্তব্য পালন করতে দিয়েছেন, তাই করছেন। তাঁর মসনদ তিনি যাকে ইচ্ছা দিয়ে যাবেন। বলেছিলেন, একথা আমি কোন দিন চিন্তা করিনি। আমি জানি এ চিন্তা মিথ্যা।

কেন?

কী হবে মিথ্যে চিন্তা করে? যে দায়িত্ব তিনি আমার মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন, তাই করছি আমি। আমি জানি মসনদ তাঁর।

লেকিন তিনি যেদিন থাকবেন না?

তিনি আছেন।

আছেন সত্য, একদিন থাকবেন না এও মিথ্যা নয়। তখন তিনি কী করবেন? আজ যা বলছো, সেদিনও কী এই চিন্তাটাই তোমার মনে স্থান পাবে? সেদিনও কী তুমি ভাবতে পারবে মসনদটা তোমার নয়, ওতে তোমার কোন অধিকার নেই?

তিনি উত্তর দেননি।

তাঁর নীরবতা দেখে হেসেছিলেন বেগম। বিমাতা যতই ঘৃণা করেছেন আঘাত দিয়েছেন ততই তিনি শ্রদ্ধা করে এসেছেন তাঁকে।

মায়ের মত সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু সেই প্রথম কী যেন হয়েছিল তাঁর, বেগমের হাসির অন্তরালে এক কাল নাগিনীর প্রকাশ ঘটেছিল। তিনি চমকে উঠেছিলেন। বেগম হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমি জানতাম তুমি উত্তর দিতে পারবে না। তোমার মনের কথা আমি জানি। কেউ না বুঝলেও আমি জানি তুমি কী চাও, সুলতান বানবার বড় সাধ তোমার।

না-না।

না নয়, হ্যাঁ। বেগম যেন ফুঁসে উঠছিলেন, গর্জে উঠেছিলেন তিনি। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিলেন, সুলতানকে তুমি ধোঁকা দিয়েছো। তাঁর হাত থেকে আস্তে আস্তে কেড়ে নিচ্ছ সমস্ত ক্ষমতা। কারণ যেদিন তিনি জিন্দা থাকবেন না, যখন মসনদটার জন্যে তোমার সতেরটা ভাই দাবীদার হয়ে দাঁড়াবে তখন, তারা তোমার ভাই হলেও, মসনদের ন্যায্য দাবীদার হলেও মসনদে বসতে পারবে না, কারণ আমীর ওমরাহের দলকে তুমি এখন থেকেই নিজের পক্ষে টেনে নিচ্ছ। তখন তাঁরা তোমাকেই সমর্থন করবেন, সুলতান বলে মেনে নেবেন।

অসহ্য বোধ হয়েছিল তাঁর, তিনি সহ্য করতে পারেননি। চিৎকার করে উঠেছিলেন, ঝুটবাত!

না, সচ! বেগম কঠিন হয়েছিলেন। ধরা পড়ে গেছ তুমি। আমি তোমার আসল উদ্দেশ্য জানি। লেকিন···। তিনি চুপ করেছিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন তাঁর মুখের দিকে।

এর নাম সংসার! খোদার দুনিয়ায় বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। কেউ যদি সাচ্চা থাকতে চায় তাকে থাকতে দেওয়া হয় না। কথাটা শুনেছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু অবিশ্বাসটুকু একমুহূর্তে কেটে গিয়েছিল। স্বার্থ মানুষকে কত নীচে নামিয়ে নিয়ে যায়। যে কোন দিন আপন স্বার্থচিন্তা করেনি, অন্যের স্বার্থে

সেও স্বার্থপর। কারণ সে অন্যের স্বার্থের বাধা স্বরূপ। সে নিজে ভাল চাইলে কী হবে, অন্যে তা চায়না!

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলেছিলেন, আমি জানতাম তুমি কিছু বলতে পারবে না, কারণ বলার কিছু নেই তোমার, তুমি ধরা পড়ে গেছ। তোমার আসল স্বরূপ আমি জেনে গেছি। আমি তোমাকে ছাড়বো না

তিনি চুপ করেছিলেন। কোন উত্তর দেননি। প্রতিবাদ জানাতে ইচ্ছা করেনি। কী হবে মিথ্যে প্রতিবাদ জানিয়ে। কোন লাভ নেই। বড় খারাপ লেগেছিল তাঁর। অসহ্য বোধ হয়েছিল। বেগমের সামনে আর একমূহুর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করেনি; অথচ চলে আসতেও পারেন নি।

অনেকক্ষণ পরে বেগমের গলাটা শোনা গিয়েছিল। আহত হলেও বিষ ঢেলে দিয়েছিলেন কণ্ঠস্বরে। তিক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, খোদা তোমার ভাল করবেন না।

খোদা নয়, মানুষই তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল। কার ষড়যন্ত্র বুঝতে এতটুকু দেরি হয়নি। ব্যাথা পেয়েছিলেন। অন্তরটা কেঁদে উঠেছিল তাঁর। অনেক কথাই চিন্তা করেছিলেন দিন-রাত্রি। একটা আতঙ্ক অবসাদ তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। মনের খুশি, প্রসন্ন ভাবটুকু হয়েছিল অন্তর্হিত। হারিয়ে ফেলেছিলেন উৎসাহ। ভয় শুধু ভয়। বেইমানীর ভয়, মিথ্যা কলঙ্কের ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। শেষে স্থির করেছিলেন কর্তব্য।

পাণ্ডুয়ায় থাকতে ইচ্ছা করেনি আর। পাণ্ডুয়ার আকাশ, বাতাস, মাটি তার সঙ্গে যেন অসহযোগিতা করেছে। মানুষ যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়েছে। কেউ কিছু বলেনি, তবু তাঁর মনে হয়েছে মানুষের চোখের নীরব ভাষা যেন অনেক কিছুই বলছে। যারা তাঁকে স্নেহ-শ্রদ্ধা ক'রত, ভালবাসতো, যাদের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রাণের সম্পর্ক, অবসর মূহুর্তে হাসিঠাট্টা কাব্যালোচনায় পার

করেছেন সময় সেই দোস্তের দল নানান অজুহাতে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে তাঁকে। জোর করলে বিনীতভাবে উত্তর দিয়েছে, শাহজাদার অখণ্ড অবসর, ভবিষ্যতের মালেক তিনি, কিন্তু তারা অতি সাধারণ, দিনের চিন্তা তাদের করতে হবে। পেটের জন্যে করতে হবে কাজ। হাসি ঠাট্টায়, কাব্যালোচনায় দিন কাটালে চলবে না।

দরবারের উজীর আমীরের দলও আগের মত আর তাঁর কথা শোনেন নি! বিনা দ্বিধায় পালন করেন নি প্রতিটি আদেশ। প্রতিবাদ তাঁরা করেন নি, কিন্তু তিনি জানতে পেরেছেন তাঁর প্রতিটি আদেশ কার্য্যে পরিণত করার আগে সুলতানকে জানিয়েছেন, তাঁর আদেশ নিয়েছেন। যা আগে কোন দিন হয়নি। তাঁর আদেশ সুলতানের আদেশ বলেই গ্রহণ করেছেন, পালন করেছেন নির্বিচারে। কিন্তু তা হয়নি আর। তাঁর আদেশ সুলতানের অনুমতি নিয়ে পালন করেছেন তাঁরা।

কেন? চিন্তা করছেন তিনি। সন্দেহ! আমীর ওমরাহরা নন, তাঁর আদেশ পালনের জন্যে একদিন সুলতান তাঁদের আদেশ দিয়েছিলেন, বিনা দ্বিধায় এতদিন তারা তা ক'রেছেন। এই ব্যতিক্রম সুলতানেরই আদেশ। বেগমের ষড়যন্ত্র। সিকন্দর শাহ নিশ্চয়ই বেগমের বলি হয়েছেন।

অসহ্য বোধ হয়েছিল তাঁর। দুনিয়ার মানুষের প্রতি মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। স্বার্থ, শুধু স্বার্থ। স্বার্থের জন্যে মানুষ পারেনা এমন কোন কাজ নেই। তিনিও পারেন। ইচ্ছা করলেই পারেন··· না, না তা তিনি চান না। তিনি সাচ্চা থাকতে চান। মসনদের লোভ তাঁর নেই। সুলতান বানবার কথা কোন দিন চিন্তা করেন নি। কিন্তু তিনি তা পারেন। ইচ্ছা করলেই পারেন। কারো সাধ্য নেই তাঁর গতি রোধ করে, বাধা দেয়! কিন্তু তিনি তা চান না। তিনি বাঁচতে চান, জিন্দা থাকতে চান, জীবনের হাসি আনন্দ

শান্তির মাঝ থেকে বঞ্চিত শুধু মাত্র মসনদের জন্যে দূরে সরে যেতে চান না।

সেই জন্যেই একদিন পিতার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। একা ছিলেন সিকন্দর শাহ। পোষা পাখিদের খাওয়াচ্ছিলেন। গিয়াসুদ্দীনকে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে তিনি তার মুখের দিকে চেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিছু বলবে?

গিয়াসুদ্দীন কিছু বলতে পারেননি। কী যে বলবেন চিন্তা করছিলেন। নিজেকে কেমন যেন তার অসহায় দুর্বল বলে মনে হয়েছিল। আব্বাজানকে তিনি চেনেন, জানেন তাঁকে তিনি কত গভীর ভাবে ভালবাসেন। সেই জন্যেই দ্বিধা জেগেছিল মনে। আব্বাজান যদি তাঁর কথা শুনে মনে ব্যথা পান।

বৃদ্ধ সুলতান কয়েক মূহুর্ত শাহজাদার মুখের দিকে চেয়েছিলেন। একটু যেন হাসির রেখা খেলে গিয়েছিল ওষ্ঠে। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, তুমি বিনা দ্বিধায় তোমার আর্জি পেশ করতে পারো।

আমাকে আপনি ছুট্টি দিন! যেন ককিয়ে উঠেছিলেন গিয়াসুদ্দীন।

ছুট্টি! বৃদ্ধ সুলতান প্রথমটায় যেন তার কথাটা বুঝতে পারেন নি। বলেছিলেন, কী বললে ছুট্টি, তুমি ছুট্টি চাও? লেকিন ক্যাহে?

সুলতানের এই কেনর উত্তর দিতে পারেননি। চুপ করেছিলেন। মাথা নীচু করে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কাছে এসেছিলেন সিকন্দর শাহ। নতমুখে পুত্রের মুখের দিকে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। সস্নেহে হাতবুলিয়ে দিয়েছিলেন পিঠে মাথায়, তারপর জানতে চেয়েছিলেন, তোমার কী হয়েছে বলতো?

কিছু হয়নি!

না না নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। ব্যস্ত হয়েছিলেন তিনি। আমি

আজই হেকিমকে কড়া করে বলে দেব, তিনি যেন তোমাকে দেখে ভাল দাওয়াই দেন।

লেকিন বিমার আমার হয়নি।

তব?

আমি ছুটি চাই। আপনার গুরুদায়িত্ব বইবার শক্তি আমার নেই! আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, ভুল হচ্ছে আমার, আমি বিশ্রাম চাই।

কতদিন?

তা আমি জানি না, আমি বলতে পারছি না কতদিন বিশ্রাম করলে আবার আগের মত কর্মক্ষম হয়ে উঠবো।

লেকিন, আমার উমর হয়েছে। তোমার ওপর সব দায়িত্ব দিয়ে বিশ্রাম নিয়েছি আমি, অনেকদিন অনভ্যাসে দরবারের অনেক কানুনও ভুলে গেছি। যদি এখন আবার সবকিছু করতে যাই পারবো কেন? তুমি সব ছেড়ে সরে গেলে এই বিরাট দায়িত্ব কে পালন করবে?

আছে সকলেই, তবু কেউ নেই। গিয়াসুদ্দীন ছাড়া আরো সতেরটি পুত্র সিকন্দর শাহের। তবু তিনি গিয়াসুদ্দীনের ওপরেই রাজ্যভার অর্পণ করেছিলেন। কারণ···কারণ যথেষ্ট। দেশটা হিন্দুর, মুসলমান শাসনে অনেক হিন্দুই মুসলমান হয়েছে, কিন্তু যারা হয়নি তাদের সংখ্যা বড় কম নয়। তারা যদি ইচ্ছা করে, যদি মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে একসঙ্গে গর্জে ওঠে সাধ্য কী মাটিতে মুসলমান শাসন বজায় রাখা। বুঝেছিলেন পিতা শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। মুহম্মদ তুগলকের মৃত্যুর পর দিল্লীর মসনদে বসেছিলেন ফিরোজ শাহ (১৩৫১ খ্রীঃ)। ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশাল বাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে এগিয়ে আসেন। কারণ ফিরোজ শাহের ত্রিহুত অধিকার করেছেন শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের ওপর অত্যাচার করে

লুঠতরাজ চালিয়েছিলেন। ছুটে এসেছিলেন দিল্লীর বাদশাহ। ছিনিয়ে নিয়েছিলেন পাণ্ডুয়া। নিরুপায় শামসুদ্দীন আশ্রয় নিয়েছিলেন গৌড়ের কাছে ভাগিরথীর পাশ্ববর্তী একডালা দুর্গে।

ফিরোজ শাহ ফিরে যাননি, একডালা দুর্গ অবরোধ করেছিলেন তিনি দিনের পর দিন। তারপর একদিন দুর্গ ত্যাগ করে ফিরোজ শাহের বিরাট বাহিনীকে আক্রমণ করেছিলেন শামসুদ্দীন। সে যুদ্ধে জয় পরাজয় চূড়ান্ত ভাবে নিষ্পত্তি না হলেও দিল্লীর বাদশাহ দিল্লী ফিরে গিয়েছিলেন। যাদের জন্যে সেদিনের যুদ্ধে রক্ষা পেয়েছিলেন শামসুদ্দীন, তারা বাঙ্গালী; বাঙ্গালী হিন্দু বীরদের জন্যেই রক্ষা পেয়েছিল একডালা দুর্গ। সন্ধি হয়েছিল দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে।

বুঝেছিলেন সিকন্দর শাহ, বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে, তাদের ঘরের ইজ্জতে যদি হাত না দেওয়া হয় তাহলে বিপদে তারা অন্যের জন্যে প্রাণ দিতে পারে হাসতে হাসতে। কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে যে কোন মুহূর্তে গর্জে উঠবে তারা। তাদের রুদ্ররূপ শান্ত করার সাধ্য কারো নেই। শামসুদ্দীন তাই তাদের যথেষ্ট সমীহ করতেন, কখনো তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। তিনিও তাই করেছেন। কিন্তু তাঁর পুত্রেরা? একমাত্র ব্যতিক্রম গিয়াসুদ্দীন। অন্যরা শাহজাদা বলে যথেচ্ছা ব্যবহার করে হিন্দুদের সঙ্গে। অনেক অভিযোগ তাঁর কানে এসেছে। কিন্তু কিছুই করতে পারেন নি তিনি। কারণ বেগম।

গিয়াসুদ্দীনের হাতে রাজ্যভার তুলে দেওয়ার সময়ও আপত্তি জানিয়েছিলেন বেগম। বলেছিলেন, এ আপনি কী করছেন জাহাঁপনা?

হেসেছিলেন তিনি। হাসি মুখেই জানতে চেয়েছিলেন, গিয়াসুদ্দীন কী অনুপযুক্ত?

আমি সে কথা বলছি না। একটু চুপ করে থেকে বেগম

বলেছিলেন, রাজ্য আপনার, মসনদ আপনার। আপনি আপনার ইচ্ছামত মসনদ যাকে ইচ্ছা দিন, লেকিন, শাহজাদা কাফেরদের দোস্ত। কাফের হিন্দুদের জন্য শাহজাদার দিলে বড় দর্দ। আমার চিন্তা মুসলমানরা তার কাছে ন্যায় বিচার পাবে না।

বেগমের কথা শুনে তিনি রাগ করেন নি, মেনেও নেন নি অভিযোগটা। তিনি বেগমের মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বিরোধ এড়াবার জন্যে বলেছিলেন, মসনদটা আমার, সুলতান আমি জিন্দা আছি। তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই বেগম, যেদিন বুঝবো রাজ্যভার পালনে সে অযোগ্য, মুসলমান সুবিচার পাচ্ছে না, সেদিন তার হাত থেকে দায়িত্ব ভার কেড়ে নিতে এতটুকু দেরি হবে না আমার।

কিন্তু কেড়ে নিতে হল না গিয়াসুদ্দীন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলেন সব দায় দায়িত্ব। বললেন, আমি অন্য কোথাও যেতে চাই আব্বাজান।

কোথায় যাবে? চমকে উঠেছিলেন তিনি। কিছুই যেন তিনি বুঝতে পারেন নি। চিন্তা শক্তি অবশ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, তুমি এখানেও থাকতে চাও না?

যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি সোনারগাঁওয়ে গিয়ে কিছু দিন বিশ্রাম নিতে পারি? মৃদু অথচ বিনীত কণ্ঠে বলেছিলেন তিনি।

বেশ তাই যাও। তিনিও মেনে নিয়েছিলেন।

সোনারগাঁও যাত্রা করেছিলেন গিয়াসুদ্দীন। যাত্রার পূর্বে বেগমের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বলেছিলেন, আপনি বোধহয় শুনে থাকবেন আমি পাণ্ডুয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি?

হেসে ছিলেন বেগম। বলেছিলেন, কথাটা কদিনই কতজনের মুখে শুনেছি। না-না, অবিশ্বাস করিনি। তবে পাণ্ডুয়া থেকে সোনারগাঁও খুব বেশি দূর নয়!

নগ্ন ইঙ্গিত করেছিলেন বেগম। যা তিনি চিন্তা করতে পারেননি। শুধু মনে হয়েছিল দেখা করতে এসে এই অপমানটুকু না কুড়ালেই

পারতেন। বেগম চান তিনি দূরে চলে যান, অনেক দূরে, যেখানে থেকে মসনদের দাবীদার হয়ে আসতে পারবেন না কোন দিন। আর তা জানিয়ে ছিলেন বিনা দ্বিধায় তা যে মিথ্যা নয়, বেগম যে তাই চান—সোনারগাঁও পৌঁছবার কদিন পরেই তার প্রমাণ পেয়েছিলেন।

সেদিনটাকে স্পষ্ট মনে পড়ে তাঁর। সবেমাত্র সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়েছে তখন। গাছের মাথায় মাথায় শেষ সূর্যের একটু আলো লেগে আছে। হারেমের মসজিদে সবেমাত্র আজরের নমাজ শেষ করেছেন। পায়চারী করছিলেন মসজিদ সংলগ্ন উদ্যানে। ইচ্ছা মগরিরের নমাজ শেষ করে হারেমে ফিরবেন। এ তাঁর নিত্য দিনের অভ্যাস। যতই কাজ থাক তাঁর, যত বড় গুরু দায়িত্ব কিংবা বিপদের মধ্যেই থাকুন সকালে ফজেরের, দুপুরে আসরের, বিকালে আজরের, সন্ধ্যায় মগরিরের আর রাত্রে আশের নমাজ তিনি পড়বেন। খোদাবানে ডাকবেন, তাঁর দোয়া ভিক্ষা করবেন। খোদা যেন তাঁকে দোয়া করেন, অন্ধকার থেকে তিনি যেন চিরদিন তাঁর হাত ধরে আলোর পথে নিয়ে যান। তিনি যেন সৎভাবে চলতে পারেন, সৎ কামনা করেন, অন্যায় আর অসত্যকে যেন চিরদিত ত্যাগ করতে পারেন। খোদা তুমি দোয়া কর, আমার মন থেকে অন্ধকার দূর কর, আমাকে পথ দেখাও। দোয়া কর খোদা, তুমি আমাকে দোয়া কর। আমি তোমার কাছে কিছু চাই না, কোন কামনা নেই আমার। আমি যেন শুধু তোমার এই সুন্দর দুনিয়ায়, তোমার সৃষ্ট আলো বাতাসের মাঝে সৎভাবে বেঁচে থাকতে পারি। তোমার ওপর আমার যেন মতি থাকে। আর কিছু চাইনা আমি। তুমি আমাকে এইটুকু দোয়া কর খোদা, খোদা তুমি দোয়া কর।

মসজিদ সংলগ্ন উদ্যানে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। দেখছিলেন রঙের খেলা। খোদার সৃষ্টি। আলোর পরে অন্ধকার, অন্ধকারের পরে আলো। মানুষের জীবন, সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু,

শোক-আনন্দ সবই তাঁর নিয়মে চলে। এতটুকু ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা তিনি, কারো সাধ্য নেই আপন ইচ্ছায় কেউ কিছু করে। তিনি করান তাই আমরা করি, করতে বাধ্য হই।

তিনি মগ্ন ছিলেন তাঁর চিন্তায়। বার বার দোয়া প্রার্থনা করছিলেন। অশান্ত মনের আকুতি ঝরে পড়ছিল তাঁর ডাকে। তাঁর জীবনে ঝড় উঠেছে। অন্ধকারে ভরে গেছে পথ—এতটুকু আলো নেই। কী যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। একবার ভাবছেন তিনি কোথাও চলে যান, দূরে অনেক দূরে। যেখানে কেউ তাঁকে চেনে না, তিনি সেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত—একা। কেউ নেই, নেই কোন চিন্তা, ঘুরে বেড়াবেন—খোদার নাম নিয়ে কাটিয়ে দেবেন জীবন। সারা জীবন দোয়া ভিক্ষা করবেন। কিন্তু পারেন না তা। তিনি কোথাও যেতে পারেন না। কারণ তিনি একা নন। তাঁর বিবি আছে, বাচ্চা আছে ; তারা চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। তাদের সকলের চিন্তা, দায়িত্ব আজ তাঁর। তাদের অস্বীকার করার উপায় তাঁর নেই। তা যদি করেন, ভুল করবেন, গুণাহ হবে তাঁর—খোদার দোয়া থেকে বঞ্চিত হবেন। তাই তিনি পারেন না, সাধ থাকলেও সাধ্য নেই তাঁর। এদিকে সংসারে থাকতেও ইচ্ছা হয় না, স্বার্থ আর স্বার্থ, শুধু জ্বালা। তিনি যা নন, সে চিন্তা একটি দিনের জন্যেও মনে স্থান দেননি, অন্যে তাঁকে তাই ভাবে। অন্যের বিচারে তিনি স্বার্থপর। আপন স্বার্থের জন্যেই সব করেন তিনি। তাই পালিয়ে এসেছেন, স্বার্থের মাঝ থেকে মুক্তি চেয়েছেন। খোদার কাছে মাথা কুটেছেন, এ তুমি কী করলে খোদা! আমাকে তুমি বদনামী করলে ? এ তোমার কী পরিহাস। তুমি আমাকে দোয়া কর খোদা, আমাকে মুক্তি দাও।

হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ জেগেছিল মনে। সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন। অন্তরটা তাকে সাবধানী করে তুলেছিল। তাঁর

মনে হয়েছিল কে যেন তাঁর জন্যে ওৎ পেতে আছে। তাঁকে খতম করতে চায়।

মানুষ! মানুষ নিজের স্বার্থে ছুরি সানায়, সেই ছুরি হাসতে হাসতে বসিয়ে দেয় মানুষের বুকে। কষ্ট হয় তাঁর। মানুষের এই স্বার্থপরতা, জঘন্য মনোবৃত্তিতে মনে দুঃখ পান। মনে পড়ে পশুর কথা! হিংস্র জীব তারা। কিন্তু বিনা কারণে তারা একে অপরকে অন্যায় ভাবে আক্রমণ করে না। কিন্তু মানুষ? মানুষ তা করে। সে যদি অন্যকে তার স্বার্থের অন্তরায় সৃষ্টিকারী বলে মনে করে, প্রকৃত তা না হলেও শুধুমাত্র ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দূরে সরিয়ে দেয়। হাসতে হাসতে বুকে ছুরি চালায়। তার জন্যে এতটুকু অনুশোচনা, দুঃখবোধ জাগে না তার অন্তরে! এমনই মানুষের মন। পাষাণের বুক আর্দ্র হয় কিন্তু স্বার্থ মানুষকে পাষাণের চেয়েও কঠিন, নির্মম করে। মানুষের জন্যে তার প্রাণ কাঁদে না। কারণ স্বার্থ। স্বার্থ মানুষকে অমানুষ করে তোলে।

সেই অমানুষিকতার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তিনি। মন তাঁকে বিপদে সতর্ক করলেও আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না তাঁর। কারণ তিনি নিরস্ত্র। খোদার দরবারে আদমী এসেছেন অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে। তাই আসেন তিনি। কবার যে মনে বিপদ শঙ্কা জাগেনি তা নয়, কিন্তু তা তিনি অস্বীকার করেছেন। অস্ত্র ত্যাগ করে এসে প্রবেশ করেছেন মসজিদে। হিংসার মাঝে ধর্মের স্থান নেই। অস্ত্রতো হিংসার প্রতীক।

কিন্তু গুপ্তঘাতক অপেক্ষায় ছিল। কার নির্দেশে সে এসেছিল জানা যায়নি। সফল হয়নি তার উদ্দেশ্য। হিন্দু বন্ধুর অব্যর্থ শরসন্ধানে নিহত হয়েছিল ঘাতক, রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি।

বন্ধুর হাত দুটি গভীর কৃতজ্ঞতায় জড়িয়ে ধরেছিলেন গিয়াসুদ্দীন। বলেছিলেন, বন্ধু, খোদা আপনাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর দোয়াতেই

আজ আমি রক্ষা পেলাম। আপনার ঋণও আমি ভুলবো না। আপনি আমাকে আজ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন।

হেসেছিল যুবক। পরিহাস তরল কণ্ঠে বলেছিলেন শাহজাদা যদি কিছু মনে না করেন তা হলে কটা কথা বলি ?

গিয়াসুদ্দীন বলেছিলেন, আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

হাসতে হাসতে যুবক বলেছিল, আপনি বলছেন খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই রক্ষা করিয়াছেন আপনার জীবন। কথাট আমিও অবিশ্বাস করিনা, অবিশ্বাস করিনা এই কারণে আপনার এখানে আসবার সময় পথে এটা সংগ্রহ করবো কেন। যুবক তার হাতের ধর্ম্মবান দেখিয়েছিল। বলেছিল, পাণ্ডুয়া গিয়েছিলাম। সেখানেই শুনলাম কদিন আগে আপনি সোনার গাঁ চলে এসেছেন। ভাবলাম দেখা করার যখন ইচ্ছাটা হয়েছে তখন কী পাণ্ডুয়া কী সোনার গাঁ দুই সমান। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিতে বললাম। অবশ্য ব্রজ আপত্তি করেছিল, আসতে চায়নি, সোনার গাঁয়ের মাটিতে নৌকা ভেড়ার আগে পর্যন্ত বলেছে ফিরে চল।

যুবকের কথা শুনে মুহূর্তে গিয়াসুদ্দীনের মুখটা ম্লান হয়েছিল। মৃদু কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন ও হয়তো ঠিক কথাই বলেছিল। কারণ···

কারণ আমি জানি। বাধা দিয়ে বলেছিল যুবক। এবার তার কথাটা একটু ম্লান শুনিয়েছিল। আপনি যে কারণের কথা বলছেন তা সত্য নয়। পাণ্ডুয়াতেই শুনেছিলাম। শুনে আরো বেশি করে দেখতে ইচ্ছা হ'য়েছিল আপনাকে। সেই জন্যেই ছুটে এলাম। আর ব্রজ যে কারণে আমাকে বার বার ফিরে যেতে বলেছে সে কারণটা সম্পুর্ণ ভিন্ন।

একটু নীরব ছিল যুবক। একটু চিন্তা করেছিল। তার পরেই স্বভাব সুলভ পরিহাস ছলে বলেছিল, কথাটা শুনে হয়তো আপনি হাসবেন, কিন্তু এই সত্য। স্ত্রীর সঙ্গে একটু সামান্য কারণে আমার

কলহ হয়েছে। দোষটা হয়তো আমারই, কিন্তু পুরুষ মানুষ আমি তার কাছে নতি স্বীকার আমার শোভা পায় না। সেই জন্যেই বিনা কারণে শুধুমাত্র নিজের দোষ ঢাকবার উদ্দেশ্যে পাণ্ডুয়া চলে এসে-ছিলাম। পাণ্ডুয়া এসে আপনার সংবাদ শুনলাম। ভাবলাম মন্দ কী আরো কটা দিন একটু ঘুরে আসি না কেন। ওধারে আমার সাধ্বী স্ত্রী বিরহ ব্যাথায় কিছুটা চোখের জল ফেলুক। তারপর ফিরে গেলে নিশ্চয়ই সে ছুটে এসে আমার পায়ে পড়ে দোষ না করেও দোষীর ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আমি অবশ্য তাকে পায়ে পড়তে না দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে ক্ষমা করে দেব। সকলে জানে আমি জরুরী প্রয়োজনে পাণ্ডুয়া এসেছি। ব্রজ জানে আমার প্রয়োজনটা কী। সেব জন্যেই সে আমাকে বার বার ফিরে যাবার কথা বলেছে। কিন্তু ফিরে যাব কেমন করে? প্রাসাদে আসার পথে এক বালকের কাছ থেকে এটা সংগ্রহ করলাম। দিতে চায়নি সে, আমিও ছাড়বো না। শেষকালে আমার গায়ের জরিদার কুর্তাটা তাকে দিয়ে এটা নিলাম। জিনিসটা আমার বড় পছন্দ হয়েছিল। শুনলাম আপনি মসজিদে। আসার পথে দূর থেকে দেখতে পেলাম আপনার এক বন্ধু আপনাকে খতম করার জন্যে ওৎ পেতে আছে। যে কোন মুহূর্তে আপনাকে আক্রমণ করতে পারে। একবার ভাবলাম কাছে যাই। গিয়ে তাকে ধরি। তারপর হাতের বন্ধুটার দিকে নজর পড়লো। অনেক দিনের অনভ্যাস। হয়তো আগের মত আর সে দৃষ্টি নেই। তবুও পরীক্ষা করার জন্যে আমিও তৈরী হয়ে বসে রইলাম। আপনার বন্ধুও এক সময় ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো আপনার ওপর, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার অব্যর্থ শর সন্ধান। দেখলাম লক্ষ্যভেদে আমার দৃষ্টিশক্তি আগের মতই তীক্ষ্ণ আছে। কিন্তু এতো কিছুর মূলে আমার দাম্পত্য কলহ। ভাগ্যিস স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে পাণ্ডুয়া চলে এসেছিলাম।

গিয়াসুদ্দীন অনেকক্ষণ নীরব থাকেন। অনেকক্ষণ নীরবে তিনি

রক্ষা কর্তা বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, আপনার কথা আমি ভুলবো না কোনদিন।

ভোলেননি তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সোনার গাঁওয়ে থাকা নিরাপদ মনে করেননি। বুঝতে পেরেছিলেন সব কিছু। কার ষড়যন্ত্রে এমন হচ্ছে। তবু নীরব ছিলেন। ধৈর্য্য হারাননি। ভাবতে পারেন নি বেইমানীর কথা। কিন্তু একদিন ভাবলেন। ভাবতে বাধ্য হলেন তিনি। পিতা তাকে পত্রে তিরস্কার করলেন। অসংখ্য অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। সুলতানের বিরুদ্ধে তিনি নাকি ষড়যন্ত্র করছেন। সেইজন্যে পাণ্ডুয়া ত্যাগ করে দূরে চলে গেছেন। সব সংবাদ তিনি পেয়েছেন। এতদিন পুত্র বলেই ক্ষমা ক'রে যাচ্ছেন। কিন্তু ভবিষ্যতেও যদি তিনি ষড়যন্ত্রের পথ ত্যাগ না করেন তখন আর তাঁর পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব হবে না। পুত্র বলে ক্ষমা করবেন না তিনি। সুলতান হয়ে ষড়যন্ত্রকারীকে কঠিন দণ্ড দেবেন।

সুলতানের পত্র পেয়ে মর্মাহত হয়েছিলেন তিনি। আজন্মের বিশ্বাস বোধটা তাঁর একমুহূর্তে ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। চিন্তা করেছিলেন তিনি, কী করবেন, তাঁর কর্তব্য কী? অপরাধী না হয়েও মেনে নেবেন মিথ্যা অভিযোগ। মাথা পেতে গ্রহণ করবেন দণ্ড?

না-না কক্ষনো নয়। যা তিনি নন, কোনদিন যা চিন্তা করেননি, তাই যদি সকলে চায়, তাই করবেন। বিদ্রোহী হবেন তিনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন! ছিনিয়ে নেবেন আপন অধিকার।

বিদ্রোহী হলেন তিনি। পূর্ণ হল মনোবাঞ্ছা। সুলতান সিকন্দর শাহ বিদ্রোহীকে দমনের আদেশ জানালেন সৈন্যদের। হয় বন্দী করো, না হলে খতম করে দাও। পুত্র বলে ক্ষমা নেই। বিদ্রোহীর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু দণ্ড।

পাণ্ডুয়া থেকে ছুটে এল সুলতানের সৈন্যদল। সোনার গাঁওকে

ঘিরে ফেলল তারা। যুদ্ধ হল। পরাজিত হলেন গিয়াসুদ্দিন। আপন সৈন্যদের কিছু অংশ তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। পালিয়ে গেলেন তিনি।

স্থান থেকে স্থানান্তর এমনিভাবে চলল কিছুদিন। কিন্তু আর চলে না। নিঃশেষিত রসদ। ক্লান্ত সৈন্যরা। ওধারে সুলতানের সৈন্যদল দিন রাত্রি ঘূরে বেড়াচ্ছে তাঁর সন্ধানে।

এমন সময় মনে পড়ে গেল যুবক বন্ধুটির কথা। একদিনের রক্ষাকর্তা। ছুটে এসেছিলেন। হাতদুটি জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, আমাকে আপনি সাহায্য করুন বন্ধু, আমাকে বাঁচান।

বিদ্রোহীকে সাহায্য! চিন্তিত হয়েছিলেন তিনি। সহসা কোন উত্তর দিতে পারেন নি! বিদ্রোহীকে সাহায্য করা অপরাধ।

কিন্তু বন্ধু চায় বন্ধুর সাহায্য। আজ তাঁর পরিচয় তিনি বিদ্রোহী। কিন্তু কেন বিদ্রোহী হয়েছেন তিনি, কারা তাঁকে বিদ্রোহী হতে বাধ্য করেছে। তিনি তো ভাল থাকতে চেয়েছিলেন, সৎভাবে জীবন যাপন কামনা করেছিলেন। তবু পারলেন না কেন? দোষ কার?

তিনি শাহজাদার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছিলেন। কারণ তিনি তাঁকে চেনেন। দীর্ঘদিনের পরিচয় উভয়ের। চেনেন তাঁর ভাইয়েদের ও। বাল্যে তিনি পাণ্ডুয়ায় থেকে মৌলবী নজরৎ আলমের কাছে ফরাসী শিক্ষা করতেন। শাহজাদাদেরও শিক্ষা গুরু ছিলেন তিনি। হারেমে গিয়ে তাদের তিনি পড়িয়ে আসতেন। সেই সময় হয়তো কোন কারণে তাঁদের কাছে তাঁর কথা তুলে থাকবেন।

একদিন শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন এসেছিলেন তাঁর কাছে! শাহজাদা এসেছেন সামান্য এক বালকের কাছে। আশ্চর্য হয়েছিলেন। এ যেন তাঁর সৌভাগ্য।

গিয়াসুদ্দীন বলেছিলেন, আমি তোমাকে দেখতে এলাম। তোমার কথা শোনার পর নিজেকে স্থির রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

তিনি বলেছিলেন, সংবাদ দিলেই আমি নিজে গিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসতাম।

আমি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছি। আব্বাজানও তোমাকে দেখতে চান।

কেন?

মৌলবী সাহেবের কাছে তিনি তোমার ফরাসী ভাষায় বুৎপত্তির কথা শুনেছেন। হিন্দু হয়ে ওই দুরুহ শিক্ষা তুমি কেমন করে আয়ত্ব করলে তা তোমাকে না দেখা পর্যন্ত ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারছেন না।

বলেছিলেন, আমি সামান্যই শিখতে পেরেছি। মৌলবী সাহাব আমাকে স্নেহ করেন, তাই হয়তো তিনি আপনাদের এক সুলতানকে ওকথা বলে থাকবেন।

তার পরিচয় আমরা পেতে চাই। বলেছিলেন গিয়াসুদ্দীন। জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাসাদে। পরিচিত হয়েছিলেন সকলের সঙ্গে। অসমবয়েসী হলেও বন্ধুত্ব হয়েছিল গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে।

খুশি হয়েছিলেন সুলতান সিকন্দর শাহ। বলেছিলেন, তুমি আজ থেকে আমার পুত্রদের বন্ধু। আমার প্রাসাদদ্বার তোমার কাছে সব সময়ের জন্যে অবারিত রইলো। এখানে আসতে কোন দ্বিধা কোর না তুমি।

তাই হয়েছে। ইচ্ছা মত তিনি প্রাসাদে গেছেন। কেউ একটি দিনের জন্যেও বাধা দেয়নি, গতি রোধ করেনি। তিনি যেন শাহজাদাদেরই একজন।

ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছেন গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে। অসমবয়েসী,

তবু বন্ধুত্ব হতে বাধেনি। কারণ গিয়াসুদ্দীন মনে আর মুখে এক। উপরন্তু গরীব এবং হিন্দুদের প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই তাঁর মনে।

একদিন পাণ্ডুয়া ত্যাগ করে ভাতুড়িয়ায় চলে এসেছেন, কিন্তু যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি উভয়ের মধ্যে। একে অপরের সংবাদ নেন, পত্রের আদান-প্রদান করেন, উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সময় সুযোগ মত। কাব্যালোচনা, রসালাপে কাটিয়ে দেন প্রহরের পর প্রহর। দুজনে একাত্মা হয়ে যান তাঁরা। কে শাহজাদা আর কে সামান্য এক ভূস্বামী এটুকু তফাৎও থাকে না।

যাকে তিনি চেনেন, বহুদিনের পরিচিত তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারেননি। প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর। নিরুপায় শাহজাদা বাধ্য হয়েছেন বিদ্রোহী হতে। বিদ্রোহ করা ভিন্ন বাঁচার আর কোন পথ নেই তাঁর।

সব বুঝেছিলেন তিনি। তবু দ্বিধা জেগেছিল মনে। শাহজাদা তাঁর সাহায্য প্রার্থী, কিন্তু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তিনি দিতে পারেননি।

কারণ সুলতান। তিনিই তাঁকে কম স্নেহ করেন না। মুসলমান হয়েও এক হিন্দুর জন্যে মনের দ্বার খুলে দিয়েছেন। এ তাঁর মহত্ব। মহৎ তিনি। যে মুসলমান হিন্দুকে কাফের ভিন্ন আর কিছুই ভাবতে পারে না, সেই মুসলমান হয়েও হিন্দুর জন্যে মনে তাঁর দরদ আছে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর কাছে সমান। সকলের জন্যই তাঁর কাছে ন্যায় বিচার। মুসলমানের পক্ষপাতিত্ব তিনি করবেন না।

সেই সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছেন তাঁরই পুত্র। সাহায্য প্রার্থী এক হিন্দুর কাছে। যে হিন্দু সুলতানের কাছে উপকারী।

কী যে করবেন ভাবতে পারেন নি। শুধু চিন্তা আর চিন্তা। নীরবে শুধু চিন্তা করছিলেন তিনি।

তাঁর মনের কথা যেন বুঝতে পেরেছিলেন গিয়াসুদ্দীন। এক সময় স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সামনে। মৃদু কণ্ঠে ডেকেছিলেন, দোস্ত!

তিনি তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

একটু ম্লান হাসি ফুটেছিল গিয়াসুদ্দীনের মুখে। বলেছিলেন, আমি বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা। আমি জানি···

না-না।

বাধা দিয়েছিলেন গিয়াসুদ্দীন। বলেছিলেন, এতে লজ্জা কী বন্ধু। কোন লজ্জা নেই। আপনি যা চিন্তা করেছেন তাতো মিথ্যা নয়। লেকিন—

চিন্তিত হয়েছিলেন তিনি। একসময় মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, অনেক আশা হয়তো আমি করেছিলাম। অনেক আশা নিয়েই আপনার কাছে এসেছিলাম। আজ যদি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়, আমার দুঃখ নেই। আমার একমাত্র সান্ত্বনা আপনি সত্যিকারের বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আপনি সাচ্চা আছেন।

সত্যই আমি পারি না।

যদি পারতেন তাতে দুঃখ বাড়তো ছাড়া কমতো না। আপনার ওপর বিশ্বাস হারাতাম আমি। আপনার সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও আমি ভাবতাম নিশ্চয়ই আপনি আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে আমাকে সাহায্য করছেন।

স্বার্থের চেয়েও কর্তব্য আমার কাছে বড়।

আমিও তাই মনে করি, আজও সে বিশ্বাসটুকু আমার মনে অটুট। যদিও আজ আমার পরিচয় স্বার্থপর বলে। যা আমি চাইনি, তাই হতে বাধ্য হয়েছি। মানুষ আমাকে বেইমান বলেছে। লেকিন, কেন আমি বেইমানি করতে বাধ্য হয়েছি একথা কেউ একবার ভাবছে না। আমার বদ নসিব। আমি ভাল থাকতে পারলাম না। আমি খোদার দোয়া থেকে বঞ্চিত হলাম।

তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাচ্ছিল। আকাশের বুকে লালের আলপনা। গিয়াসুদ্দিন সেই অসীম শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। কণ্ঠে যেন কান্না ঝরছিল তাঁর।

শাহজাদা! অনেকক্ষণ পরে ডেকেছিলেন তিনি।

সম্বিত ফিরে পেয়েছিলেন গিয়াসুদ্দিন। যেন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়েছিল। তাঁর একখানা হাত জড়িয়ে ধরে ছিলেন। হেসে ছিলেন। বলেছিলেন, আমার একটা অনুরোধ আছে দোস্ত!

বলুন!

জানিনা সে অনুরোধ রক্ষা করা আপনার পক্ষে সম্ভব কী না। একটু চুপ করেছিলেন তিনি। মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, সত্যই আমি ভাল থাকতে চেয়েছিলাম দোস্ত। আমি সৎভাবে জীবন কাটাবার জন্যে খোদার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম। কিন্তু কেন পারলাম না? কোথায় আমার গুনাহ? আমি কী তাহলে এতদিনে যা করেছি, ভেবেছি—তা মিথ্যা, ভুল? আমি কী এতদিন ধোকা দিয়েছি নিজেকে, আমার মনকে? আমি কি আমার মনের অজান্তে স্বার্থ চিন্তা করেছি? সকলকে ভুল বুঝিয়েছি?

সমস্ত মুখখানা তার ব্যাথায় ভরে গিয়েছিল। তিনি ছটফট করেছিলেন। এক সময় বলেছিলেন, আমি চলি দোস্ত।

চলে যাবেন?

হ্যাঁ দোস্ত। বলেছিলেন তিনি, এখানে থাকা আমার ঠিক হবে না। সুলতান সিকন্দর শাহ হাজার হাজার সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছেন আমার পেছনে। তারা আমার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যদি তারা জানতে পারে আমি আপনার এখানে এসেছি তাহলে বিপদে পড়বেন আপনি।

তা হোক। দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন তিনি, আজকের দিনটা আপনি এখানে বিশ্রাম করুন।

লেকিন আপনার বিপদ হতে পারে?

বন্ধুকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যে এ বিপদটুকু আমি হাসি মুখে গ্রহণ করবো।

বন্ধু হলেও আমি বিদ্রোহী। যে বিদ্রোহ করে আর যে তাকে আশ্রয় দেয় তারা দুজনেই সমান অপরাধী।

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বিদ্রোহী আপনাকে তো আমি সাহায্য করছি না, বিদ্রোহীর প্রতি আমার এতটুকু সমর্থন নেই কিন্তু বন্ধুকে আতিথ্য গ্রহণে আমন্ত্রণ জানাতে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাতে অন্যে কী ভাববে আমি জানিনা, হয়তো অন্যের চোখে আমিও অপরাধী। হয়তো বিপদ হবে আমার। তবু আজ আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। নির্ভয়ে বিশ্রাম করুন রাত্রিটুকু।

কথা বলতে পারেননি গিয়াসুদ্দীন। হিন্দু বন্ধুর মুখের দিকে অপলক নেত্রে চেয়েছিলেন। আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিলেন বুকে।

চিন্তা আর চিন্তা। চিন্তার কি শেষ আছে। গিয়াসুদ্দীনকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি, তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন না। বন্ধু হলেও সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু চিন্তার শেষ হয়নি। রাত্রে ঘুম নামেনি চোখের পাতায়। তিনি চিন্তা করছেন। কখনো শয্যা থেকে উঠে পায়চারী করছেন। গবাক্ষ পথে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে থেকেছেন। চিন্তার শেষ হয়নি তাঁর।

স্বামীর ভাবান্তর, অস্থির ভাবটুকু লক্ষ্য করেছেন সত্যবতী। কিশোরী বধূটির কোমল অন্তর অজানা আশঙ্কায় থরথর করে কেঁপে উঠেছে। ব্যাকুল হয়েছে সে। জানতে ইচ্ছা করেছে। কী হল তাঁর ? কেন অমন করছেন ? কিন্তু সাহসী হয়নি। হয়তো জানতে চাওয়া তার উচিত হবেনা। স্বামী হয়তো পছন্দ করবেন না তার এই অনাবশ্যক কৌতূহল। বিরক্ত হবেন। তাই বাধ্য হয়েই চুপ করেছিল।

গভীর রাত্রি। জেগে থাকতে থাকতে সত্যবতীর দুচোখের

পাতায় .কখন যে ঘুমের ঢল নেমেছে বুঝতে পারেনি। ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। তারপর কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না। একসময় ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছিল তার। শয্যার ওপর উঠে বসেছিল সে। সেজবাতীর মৃদু আলোয় কক্ষের মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করে কী যেন খুঁজেছিল।

নেই-নেই। অথচ তিনি ছিলেন। মনে পড়েছিল তার। স্বামীকে গবাক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। অন্ধকার আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। কী যেন চিন্তা করছিলেন। কী চিন্তা করছেন সে কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সত্যবতী।

পালঙ্ক থেকে নীচে নেমেছিল সে। মুক্ত দ্বার পথ। বাইরে সর্বগ্রাসী অন্ধকার। ভয় পেয়ে ছিল সত্যবতী। কিন্তু আপন ভয়ের চেয়েও দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কোথায় গেলেন তিনি?

সাহসে বুক বেঁধে বাইরে আসে সত্যবতী। তার চলার তালে নীবিবন্ধের মৃদু আওয়াজ উঠেছিল, ঝুম-ঝুম সেই শব্দে কে যেন প্রশ্ন করেছিল, কে?

স্বামীর কণ্ঠস্বর। বলেছিল, আমি!

সত্যবতী! তিনি কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, কী হল?

লজ্জা করেছিল সত্যবতীর। প্রায় দুটি বছর হল পিতৃগৃহ থেকে স্বামীর কাছে এসেছে, কিন্তু বড় লজ্জা করে তার। ঠিক মত সহজ ভাবে কথা বলতে পারে না। অনেক চিন্তা করেছে—ভেবে পায়নি।

সখীরা বলেছে, তুই তোর স্বামীকে ভয় করিস।

না-না। প্রতিবাদ জানিয়েছে সত্যবতী।

সখীরা বলেছে, তবে ভাল করে কথা বলতে পারিস না কেন?

কেন? সত্যবতীও ভেবেছে। অনেক দিন চিন্তা করেছে

একাকিনী। স্বামীর মূর্তিটা চোখের সামনে কল্পনা করেছে, কিন্তু তাঁর মধ্যে ভয়ের কিছু খুঁজে পায়নি সে।

কেমন যেন হয়। কেমন লজ্জা লজ্জা। মুখ তুলে চাইতে পর্যন্ত পারে না। তিনি যখন আদর করেন চুপ করে থাকে।

তুমি এমন কেন সত্যবতী, কী হয়েছে তোমার?

সত্যবতী শুনেছে অভিযোগ জানাচ্ছেন স্বামী। জানতে চাইছেন কী হয়েছে! সেও জানেনা কী হয়েছে তার। চুপ করে থেকেছে।

সত্যবতী! গম্ভীর কণ্ঠে ডেকেছেন স্বামী।

সত্যবতী শুনেছে, সাড়া দেয়নি। বুকের গভীরে মুখ লুকিয়েছে।

তিনি তার মুখখানা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, আমার দিকে চাওতো। চাও।

সেজবাতীর আলোয় একবার মাত্র চেয়েই চোখ বুজে ফেলেছে।

আমাকে তোমার ভয় করে? জানতে চেয়েছেন তিনি।

মাথা নেড়েছে সত্যবতী। জানিয়েছে এতটুকু ভয় করেনা তার।

তবে?

তবে কী, জানেনা সে। লজ্জা করে। মনে হয়, অনেক কিছু মনে হয় সত্যবতীর। অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করে। কত কথা বুকের মধ্যে জমে আছে। প্রকাশ করতে পারে না। লজ্জা। স্বামীর সান্নিধ্যে এলে সব কিছু কেমন যেন এলো মেলো হয়ে যায় তার। সুখ-সুখ, নিজেকে বড় সুখী বলে মনে হয়। সে ভাগ্যবতী। দেহে মনে সুখ, শান্তি, তৃপ্তির ঢল নামে তার। সব ভুলে স্বামীকে আঁকড়ে ধরে। তাঁর বিশাল বুকে মাথা রেখে স্বপ্ন দেখে, কত রঙীনকল্পনা। ভুলে যায় কথা বলতে।

বলতে পারেনি সত্যবতী। জানাতে পারেনি কেন সে গৃহ ছেড়ে বাইরে এসেছে। নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল শুধু।

তিনি তার হাত ধরেছেন। কক্ষে প্রবেশ করে বলেছেন, রাত্রি প্রভাত হতে এখনো অনেক দেরী আছে, তুমি শুয়ে পড়।

তুমি ? মৃদু কণ্ঠে একটি কথা বলেছিল সত্যবতী। ছোট্ট একটি প্রশ্ন।

হেসেছিলেন তিনি। স্ত্রীর পিঠের ওপর হাত রেখে সস্নেহে বলেছিলেন, আজ আর আমি ঘুমাবো না।

কেন ? আবার একটি ছোট প্রশ্ন করেছিল সে।

এবার আর তিনি হাসেননি। বলেছিলেন, আজ আর আমার চোখে ঘুম নামবে না। আমি আজ ঘুমাবো না সত্যবতী।

ঘুমাবে না ?

না। একটু চিন্তা করছিলেন, আজ আমার ঘুমানো উচিৎ হবে না। আমার ঘরে আজ অতিথী।

আর কিছু জানতে চায়নি সত্যবতী। কোন প্রশ্ন করেনি। নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল শুধু।

তিনি ওর দিকে চেয়েছিলেন। কিশোরী মেয়েটি যে তাঁর কথা বিশ্বাস করেনি বুঝতে পেরেছিলেন তা। শাহজাদা যে তাঁর গৃহে অতিথী একথা সত্যবতী জানে। তাঁর লেঠেল দল সন্ধ্যা থেকে পাহারা দিচ্ছে শাহজাদাকে। আর আছে ব্রজ। লেঠেল সর্দার ব্রজ গিয়াসুদ্দীনের কক্ষদ্বারে ওৎ পেতে বসে আছে। সে জীবিত থাকতে কারো সাধ্য নেই তাঁর ক্ষতি করে। নিশ্চিন্ত তিনি। তবু ঘুমাতে পারেন নি। ঘুম নামেনি তাঁর চোখে। চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়েছেন, ছটফট করেছেন। কী করবেন তিনি ? কী করা তাঁর কর্তব্য ?

সত্যবতী বিশ্বাস করেননি তাঁর কথা। মুখে কিছু না বললেও তাঁর যুক্তিটি যে ও মেনে নেয়নি তা ওকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন, সত্যিই আমি শাহজাদার জন্যে ঘুমোতে পারছি না। যদি তাঁর কিছু হয়•••

সত্যবতী তাঁর মুখের দিকে নীরবে চেয়েছিল মাত্র।

তিনি ওকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। ডেকেছিলেন, সত্যবতী !

বল !

তুমি বিশ্বাস কর…

তোমাকে অবিশ্বাস করার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কথাটা বলেছিল সত্যবতী।

তিনি চমকে উঠেছিলেন। ওর মুখখানা দুহাতে তুলে ধরে বলেছিলেন, এ তুমি কী বলছো সত্যবতী ?

এই সত্যি !

স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। কিশোরী সত্যবতী, এ বিশ্বাসটুকু সে পেল কোথায় ? কবে, কখন সে লাভ করলো ? বিবাহ হয়েছে অনেক দিন। দুজনেই তখন নিতান্ত ছোট। স্বামী-স্ত্রী কী জিনিষ তা তারা দুজনেই জানতো না। দুজনেই জেনে ছিল তাদের বিয়ে হয়েছে। সত্যবতী কদিন পরেই পিতৃগৃহে চলে গেছে। পুতুল খেলেছে এই সেদিন পর্যন্ত। কখন সে বুঝলো স্বামীর মর্ম। স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস শুধু অপরাধ নয়, মহাপাপ।

স্ত্রী যদি স্বামীকে বিশ্বাস করতে পারে, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসে মৃত্যু কামনা করে, তাহলে তিনিই বা কেন বিশ্বাস করতে পারেন না ওকে ? কেন গোপন করছেন সব কিছু।

না-না, তা সম্ভব নয়। উচিত হবে না তার। ও ভয় পাবে।

বলেছিলেন, আমিও তোমাকে বিশ্বাস করি সত্যবতী। আমি তোমাকে ভালবাসি।

ওকে দুই হাতে বুকের গভীরে বড় নীবিড় করে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি। ওষ্ঠে এঁকে দিয়েছিলেন ভালবাসার চিহ্ন। সত্যবতীর সব অভিমান ধুয়ে মুছে জল হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর বুকে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিল সে।

তোর কী হয়েছে বলতো ?

মা !

আমাকে বল তুই, কিছু গোপন করিস নি! রাজেশ্বরী পুত্রের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন।

সকালে মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন তিনি। প্রণাম করে উঠতে পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা করেই প্রশ্ন করেছিলেন জননী।

চমকে উঠেছিলেন তিনি। মায়ের মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। জননী কী অন্তর্যামী? কী করে জানলেন তিনি তাঁর মনের খবর?

গণেশ! আবার ডেকেছিলেন রাজেশ্বরী।

মা।

কী হয়েছে তোর?

কিছু তো হয়নি মা।

মিথ্যা বলিসনি গণেশ, আমি সব জানি। বউমা আমাকে সব বলেছে। কাল সারা রাত্রি তুই দু চোখের পাতা এক করিসনি কেন?

সব কিছুই স্বচ্ছ হয়েছিল তাঁর কাছে। সত্যবতী, সে-ই সমস্ত কথা জানিয়েছে মাকে। কিশোরী মেয়েটা বড় চতুর। বলেছিলেন, সত্যই আমার কিছু হয়নি মা। তুমি বিশ্বাস করো।

তবে সারা রাত ঘুমাস নি কেন, কী হয়েছিল তোর?

আমি···

আমাকে বল তুই।

না, এরপর আর কিছুই গোপন করেন নি। সবকিছুই একে একে প্রকাশ করেছিলেন জননীর কাছে। সব শুনে রাজেশ্বরী জানতে চেয়েছিলেন, শাহজাদা কোথায়?

তখন সবে মাত্র ভোর হচ্ছে। দিনের আলো ফুটছে ধীরে ধীরে। একটু আগে ব্রজ জানিয়ে গিয়েছিল গিয়াসুদ্দীন তখনও ঘুমাচ্ছেন। হয়তো বহুদিন অনিদ্রিত তিনি। নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে নির্ভয়ে ঘুমাচ্ছেন তাই।

বলেছিলেন, শাহজাদা এখনও ঘুমাচ্ছেন।

তিনি উঠলেই জানাবে, তুমি তাঁকে সাহায্য করবে।

মা!

হ্যাঁ গনেশ! বলেছিলেন রাজেশ্বরী। সুলতান সিকন্দার শাহের সঙ্গে তোমার বিরোধ নেই সত্য, হয়তো তিনি তোমাকে স্নেহও করেন, কিন্তু গিয়াসুদ্দীন তোমার বন্ধু। বিপদে যে সাহায্য করে সেইতো প্রকৃত বন্ধু। শুধু তাই নয়, বন্ধু বলেই বন্ধুর বিপদে আমি তোমাকে সাহায্য করতে বলছি না। তুমি যা বললে তা যদি সত্য হয়, যদি সত্যসত্যই সৎ হন গিয়াসুদ্দীন তাহলে তোমার তাঁকেই সাহায্য করা উচিত। কারণ তিনি তো সৎ ভাবেই জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন।

জননীর পদধূলি মাথায় নিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, তাই হবে মা। তোমার আদেশই আমি মাথা পেতে নিলাম।

আমার আদেশ নয় গণেশ। বলেছিলেন রাজেশ্বরী, একটু চিন্তা ক'রে দেখ। দেখবে, এ তোমার কর্তব্য বলে বোধ হচ্ছে।

চিন্তা করেন নি তিনি। চিন্তা করতে ইচ্ছা করেনি আর তাঁর। দেখেছিলেন, মনের অশান্তি মুহূর্তে দূর হয়েছে। ফিরে এসেছে শান্তি।

গিয়াসুদ্দীনকে বলেছিলেন, আমি আমার মত পরিবর্তন করেছি শাহজাদা।

মত পরিবর্তন করেছেন? কথাটা বুঝতে পারেননি তিনি। অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন শুধু।

তিনি বলেছিলেন, আমি আপনাকে সাহায্য করবো।

সাহায্য করবেন?

হ্যাঁ।

লেকিন···

এ আমার মায়ের আদেশ। সিকন্দর শাহ সুলতান, আর আপনি

আমার দোস্ত। মা বলেন, বন্ধুর বিপদে যে বন্ধু, সেইতো প্রকৃত বন্ধু। শুধু মাত্র বন্ধু বলেই নয়, আমি জানি বিশ্বাস করি অন্যায়ের পক্ষ আমি সমর্থণ করছি না।

দুই হাতে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন গিয়াসুদ্দীন। বলেছিলেন, আপনি আমাকে বাঁচালেন দোস্ত, আপনার এ ঋণ জিন্দেগীতে আমি শোধ দিতে পারবো না। আপনার মাকে আমার সালাম দেবেন। আর···

বলুন!

আপনি যে আমাকে সাহায্য করবেন এই আমার যথেষ্ট। আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন। তবে বন্ধু হয়ে বন্ধুকে আমি বিপদে ফেলতে চাই না।

আমি আমার পাইকের দল নিয়ে আপনার পক্ষে লড়াই করতে রাজি।

কিন্তু আমি তা চাই না। যুদ্ধ আমি করবো, লেকিন সে যুদ্ধে যদি পরাজিত হই, যদি মৃত্যু হয় আমার, তখন বিপদে পড়বেন আপনি। সুলতান সিকন্দর শাহ আপনাকে নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি দেবেন না। একটু চুপ করেছিলেন গিয়াসুদ্দিন। চিন্তার সমুদ্রে যেন ডুব দিয়েছিলেন তিনি। তারপর অনেকক্ষণ পরে, কতকটা যেন আত্মগতভাবে বলেছিলেন, যুদ্ধ আমিও চাই না। আব্বাজানের বিরুদ্ধে আমার এই বেইমানী আজ আমাকে কী আঘাত হেনেছে তা বলে বোঝাতে পারবো না। কেউ বিশ্বাসও করবে না হয়তো আমার কথা। বলবে মিথ্যা কথা বলছি, আমি মিথ্যাবাদী স্বার্থপর। নিজের স্বার্থের জন্যে মসনদের লোভে আমি পাগল হয়েছি। ভুলে গেছি ন্যায়, অন্যায়—বিচার, বুদ্ধি, বিবেককে দিয়েছি জলাঞ্জলী।

আবার চুপ করে ছিলেন তিনি। দিনের আলোয় তার কান্না মণ্ডিত মুখখানা বড় করুণ দেখাচ্ছিল। মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, বন্ধু, তোমার কাছে, তোমাদের হিন্দুর কাছে, পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ।

আমরা মুসলমান। আব্বাজানও আমাদের কাছে কম শ্রদ্ধার নন। খোদাতালার দুনিয়াতে তিনিই তো আমাকে পয়দা করেছেন। লেকিন, স্বার্থ সব ভুলিয়েছে। মসনদ সুলতানকে অন্ধ করেছে। অন্যের প্ররোচনায় তিনি পুত্রকে করেছেন অস্বীকার। কারণ স্বার্থ। আমার সংগ্রাম তাঁর এই অন্ধত্বের বিরুদ্ধে। আমি প্রমাণ করতে চাই, তিনি যা ভেবেছেন তা ভুল, মিথ্যা।

নীরব হয়েছিলেন গিয়াসুদ্দীন। অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিলেন।

তিনি ডেকেছিলেন, শাহজাদা!

গিয়াসুদ্দীন মুখ তুলে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, আমার কাজকে সকলেই ঘৃণা করবে। আমি আজ সকলের চোখে ঘৃণিত, অপরাধী।

এ বিরোধ মেটানো সম্ভব নয়? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

না দোস্ত। মাথা নেড়েছিলেন গিয়াসুদ্দীন। আমি সে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। হয়তো দোষ আব্বাজানের নয়। সুলতান আজ অন্যের হাতের ক্রীড়নক। আমি যে তাঁর পুত্র। আমি যে সৎভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম, আমি যে অন্যায়কে ঘৃণা করি একথা আজ বিস্মৃত হয়েছেন তিনি। আজ আমি বিদ্রোহী, শত্রু। আমাকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন না। দুনিয়ার আলো বাতাসের মাঝে আমাকে বাঁচতে দিতেও তাঁর আপত্তি। লেকিন, আমি বাঁচতে চাই। অন্যায়কে মাথা পেতে গ্রহণ করে মরতে আমি পারবো না।

আমি কী করবো? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

আপনি? গিয়াসুদ্দীন তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, আমাকে আপনি কিছু অর্থ আর খাদ্য দিয়ে সাহায্য করুন। আমি আর কিছু চাই না আপনার কাছে।

বেশ, তাই দেব আমি আপনাকে। আর···

কী?

আমি একবার পাণ্ডুয়া যাব।

পাণ্ডুয়া যাবেন। কেন? বিস্মিত গিয়াসুদ্দীন জানতে চেয়েছিলেন।

যদি আপনি অনুমতি দেন আমি একবার শেষ চেষ্টা করবো।

কী চেষ্টা করবেন আপনি?

আপনাদের পিতা পুত্রের বিরোধ নিষ্পত্তির।

গম্ভীর হয়েছিলেন গিয়াসুদ্দীন। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বলেছিলেন, আপনি যদি তা করেন আমি বাধা দেব না। লেকিন, তা বোধ হয় সম্ভব নয়। তাছাড়া এতে আপনার বিপদ হতে পারে।

তিনিও চিন্তা করেছিলেন। শাহজাদার আশঙ্কা মিথ্যা নয়। হয়তো সুলতান সিকন্দর শাহ তাঁকেও ভুল বুঝবেন। কিন্তু অনাবশ্যক রক্তপাত বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন শান্তিতে বিশ্বাসী। তার একমাত্র কামনা, মানুষ হিংসা দ্বেষ ভুলে শান্তিতে বাস করুক। অশান্তি আগুন জ্বালায়। কত শত সুখের সংসার পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। বলেছিলেন, আমি অনাবশ্যক রক্তপাত বন্ধ করতে চাই।

আমিও তাই চাই বন্ধু। বলেছিলেন গিয়াসুদ্দীন। আব্বাজানকে আমি সেকথা জানিয়েও ছিলাম। পত্র লিখেছিলাম, আপনি আমাকে দমন করার জন্যে যাদের পাঠিয়েছেন, তাদের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। আমিও কোন অন্যায় করিনি। তবু কেন আপনি এই অনাবশ্যক রক্তপাত চাইছেন। উত্তরে সুলতান জানিয়েছেন, বিদ্রোহীর কোন উপদেশ তিনি শুনতে চান না। আমি জানিয়েছিলাম, আমাকে শুধু বেঁচে থাকার ব্যবস্থাটুকু করে দিন। তিনি জানিয়েছেন, আমার মৃত্যু চান তিনি।

তবু তিনি সব শুনেও পাণ্ডুয়ায় গিয়েছিলেন। সুলতান তখন বড় ব্যস্ত ছিলেন। অনেক কষ্টে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

সিকন্দর শাহ সব শোনার পর ভ্রুকুঞ্চিত করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, তুমি তাহলে বিদ্রোহীকে সমর্থন করো?

না জাহাঁপনা। মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি।

তাহলে তোমার উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য! মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, বিনা উদ্দেশ্যে আমি আপনার কাছে আসিনি সত্য। আমি শান্তি চাই জাহাঁপনা। আমি মানুষকে ভালবাসি। মানুষের জীবনের মূল্য আমার কাছে কম নয়। আপনাদের পিতা পুত্রের সামান্য বিরোধকে কেন্দ্র করে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তা আমি বন্ধ করতে চাই। কারণ যারা প্রাণ দেবে তা কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য নয়। এ অনাবশ্যক রক্তপাত আপনি বন্ধ করুন জাহাঁপনা।

সে বিদ্রোহী, অপরাধী। তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না।

সুলতানের কঠিন মুখখানার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়েছিলেন তিনি। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, জাহাঁপনা মেহেরবান, আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার শোভা পায় না। তবু একটি কথা না বলে পারছি না। যদি অপরাধ না নেন তাহলে বলি, শাহজাদা কী সত্যই অপরাধী? তিনি যে বিদ্রোহ করেছেন তা কি সত্য?

সুলতানকে এবার বিচলিত দেখাচ্ছিল। তিনি যেন অসহায় বোধ করছিলেন। বৃদ্ধ দুর্বল শরীরটা তাঁর এক মুহূর্তের জন্যে কেঁপে উঠেছিল। মুহূর্ত মাত্র। তার পর নিজেকে সংযত করেছিলেন। একটু যেন কঠিন হয়েছিলেন। দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, বিদ্রোহীর স্বপক্ষে কোন কথা কেউ আমার কাছে বলুক এটা আমি চাই না। তার সঙ্গে দেখা হলে জানিয়ে দিও, অপরাধের শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

মৃদু হেসেছিলেন তিনি। শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে হয়তো আমার আর সাক্ষাৎ হবে না। সাক্ষাৎ হয়েছিল। শুনেছিলাম সব। ছুটে এসেছিলাম এই জন্যে, আপনাদের পিতা পুত্রের বিরোধকে

কেন্দ্র করে যারা পরস্পরের বুকে ছুরি হানবে তারা সবাই আপনারই প্রজা। তাদের আজকের এই শক্তিক্ষয় ভবিষ্যতে মহৎ কোন কাজে লাগতে পারতো। কিন্তু···

সুলতানের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলেন তিনি। গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে সব শুনে বলেছিলেন, বন্ধু, আমি জানতাম আপনি সফল হবেন না।

তিনি চুপ করেছিলেন। চিন্তা করেছিলেন কদিন পরের কথা, যেদিন সুলতান সিকন্দর শাহ আর শাহজাদা গিয়াসুদ্দীনের সৈন্য দল যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াবে। একে অপরকে আঘাত হানবার জন্যে প্রস্তুত হবে।

মনে পড়েছিল অতীতকে। অতীতের মহাভারতের কথা। যেদিন পাণ্ডব আর কৌরব পক্ষে যুদ্ধ হয়েছিল। সে যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হয়োছলেন। একে অপরকে আঘাত হেনেছিলেন। যুদ্ধ শেষে যুধিষ্ঠির স্থাপন করেছিলেন ধর্মরাজ্য।

তবু যুদ্ধক্ষেত্রের স্বজনদের দেখে অর্জ্জুনের প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। স্বজন বধে অস্বীকৃত হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন ঃ

> ন চ স্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমা হবে।
> ন কাঙ্খে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজন সুখানি চ॥
> কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈ জীবিতেন বা।
> রাজ্যং নঃ কাঙ্খিতং যেষামর্থে ভোগাঃ সুখানি চ।
> ত ইমেঽ বস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাং স্ত্যক্ত্ব ধনানি চ॥
> আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্ত থৈব চ পিতামহাঃ।
> মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধি ন স্তথা॥
> এতান্ন হন্তমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
> অপি ত্রৈলোক্য রাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহাকৃতে॥

যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া মঙ্গল দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ, আমি জয়

চাই না, রাজ্যও চাই না, সুখও চাই না। হে গোবিন্দ, আমাদের রাজ্যেই বা কাজ কি, ভোগেই বা কাজ কি, জীবনেই বা কাজ কি। যাঁহাদের জন্যে আমাদের রাজ্য, ভোগ ও সুখ আকাঙ্খিত, এই তাঁহারাই জীবন ও ধন ছাড়িয়া যুদ্ধে অবস্থিত হইয়াছেন। হে মধুসূদন, পৃথিবীর জন্য ত দূরের কথা, ত্রিভুবনের রাজ্য পাইলেও এবং উহারা আমাদের বিনাশকারী হইলেও,—গুরু, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং কুটুম্বগণ, ইহাদিগকে আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি না।

কিন্তু আজ? দিনের পরিবর্তন হয়েছে। অতীত বিস্মৃতির গর্ভে। মানুষ একে অপরের অলক্ষ্যে ছুরি শানায়। ক্ষুদ্র স্বার্থ, ব্যক্তিগত সুখের জন্য অন্যের বুকে ছুরিকাঘাত করতে দ্বিধা করে না। কেন? চিন্তা করেছেন তিনি। কেন এই পরিবর্তন? মানুষ কী সব কিছু বিভেদ বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে একে অন্যকে বুকে টেনে নিতে পারে না? পারে না কী সৎ হয়ে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে। একে অন্যের আনন্দ বেদনার অংশীদার হতে?

হয়তো তা পারে না। একই দেশ, ফলে জলে পুষ্ট দেহ, তবু একে অন্যের চেয়ে ভিন্ন। ভিন্ন চিন্তাধারা। সামাজিক আচার আচরণ। হিন্দু মুসলমান। হিন্দুর মাঝেও অসংখ্য জাতি—উচ্চনীচ। বর্ণ-ভেদের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা জীবন-যাত্রা। উপায় নেই মিলে মিশে এক হয়ে যেতে। অসংখ্য নদী একসঙ্গে মেশে, সৃষ্টি হয় সমুদ্র। হিন্দু মুসলমান এক হয়ে গর্জে উঠে বলতে পারে না আমরা বাঙ্গালী। ভাই হয়ে ভাইয়ের লাঞ্ছনা আমরা সইবো না। আমরা বাংলা মায়ের সন্তান, আমরা বাঙ্গালী।

কিন্তু সেদিন? সেদিন তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। ব্যথীত হয়েছিলেন। শাহজাদা কিংবা সুলতান তাঁর কেউ নন। তাঁরা মুসলমান, ভিন্ন দেশবাসী। তবু তাঁদের বিরোধ তার মনে ব্যথা দিয়েছিল। তিনি শান্তি এবং সৌহার্দ্র কামনা করেছিলেন। তাঁদের

উভয়ের জন্য মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত সেই অসংখ্য মানুষের জন্যে তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল। কোন স্বার্থ নেই তাদের। জয় পরাজয়ে লাভবান তারা হবে না। শুধুমাত্র দুটো ক্ষুধার অন্নের জন্যে কেন তারা প্রাণ দেবে, অকালে শেষ হয়ে যাবে?

স্বার্থের লড়াই। ক্ষমতাবানের লড়াই। মরে হতভাগার দল। নিঃসম্বল কিছু মানুষ। বাঁচার জন্যেই তাদের মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা। শুধু মাত্র দুটি ক্ষুদার অন্ন। ভুলে যায় সব কিছু। পিতা, পুত্র, আত্মীয়, বন্ধু সবার কথা। নিজেকে বাঁচতে হবে। অন্যে মরুক ক্ষতি নেই, আমি বাঁচতে চাই।

কিন্তু তা তারা পারে না। বাঁচা সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। স্বার্থের দ্বন্দ্বে তারাই মরে, ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সেই ক্ষতি, অসংখ্য মানুষের মৃত্যু তাঁর প্রাণে ব্যথা জাগায়। অনাবশ্যক রক্তপাত, জীবনহানী তিনি বন্ধ করতে চান। সেইজন্যেই নিজের বিপদ তুচ্ছ করে ছুটে গিয়েছিলেন পাণ্ডুয়ায়। সুলতান সিকন্দর শাহকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে। কিন্তু সম্ভব হয়নি তা। বৃদ্ধ সুলতানের সাধ্য ছিল না যুদ্ধ বন্ধের। অন্যের ইচ্ছাশক্তি তখন তাঁকে পরিচালিত করছিল। তিনি তখন বেগমের হাতের খেলার পুতুল। গিয়াসুদ্দীন তাঁর পুত্র হলেও বেগমের কেউ নন। পথের কাঁটা, মসনদের দাবীদারকে তিনি খতম করতে চেয়েছিলেন। অথচ শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন তা চাননি। মসনদ তাঁর কাম্য ছিল না। তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন শুধু।

শুরু হয়েছিল বাঁচার লড়াই। সুলতানী সৈন্যদলের মুখোমুখি হয়েছিল শাহজাদা গিয়াসুদ্দীনের সৈন্যদল। ১৩৯১ খ্রীষ্টাব্দের একটি সকাল। শরৎকাল। আকাশে সোনালী মেঘের ভেলায় নিরুদ্দেশ যাত্রা। ভরা নদীর কূলে কূলে শ্বেতশুভ্র কাশের দোলা। শিউলী ঝরার গন্ধে বাতাস আমোদিত। প্রজাপতির পাখায় পাখায় রামধনু রঙের আলপনা। এমন দিনে মানুষ চায় সুখ, কামনা

করে শান্তি। মন চায় ভালবাসতে—ভালবাসা পেতে। যারা অস্ত্র হাতে একে অপরের সম্মুখীন হয়েছিল, তারা কেউবা কারো ভাই বন্ধু আত্মীয়। তবু তারা সেদিন নিতান্ত বাধ্য হয়ে শুধু মাত্র পেটের জন্যে ভুলে গিয়েছিল সব কথা। কে কার ভাই বন্ধু আত্মীয়। স্বার্থের যুদ্ধে অসহায় তারা, এগিয়ে এসোছল একে অপরকে আঘাত হানতে। হাতীর পিঠে স্থলতান সিকন্দর শাহ নিজেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন যুদ্ধ পরিচালনার। গিয়াসুদ্দীন কিন্তু এগিয়ে যাননি। দূরে ছিলেন তিনি, চাননি পিতার সম্মুখীন হতে।

একডালা দুর্গের পার্শ্ববর্তী শূন্য প্রান্তরে সৈন্যরা বাজিয়েছিল রণ দামামা। শুরু হয়েছিল যুদ্ধ। মৃতের শেষ আর্তনাদ, আহতের চিৎকার, রক্তের নেশায় মাতাল সৈন্যের রণহুঙ্কার সব কিছু মিলে যেন নারকীয়তার প্রকাশ ঘটেছিল। সকাল থেকে দুপুর। উভয় পক্ষই সমানে লড়াই করেছিল। হত্যা করেছিল একে অপরকে। তারপর ঘনিয়েছিল বিকালের ছায়া, ম্লান হয়েছিল দিনের সূর্য। আর ঠিক এমনি সময় ঘটেছিল সর্বনাশ। অখ্যাত এক সৈনিকের নির্ভুল লক্ষ্যে তীর বিদ্ধ হয়েছিল স্থলতান সিকন্দর শাহের বুকে। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠেছিলেন তিনি। গড়িয়ে পড়েছিলেন হস্তীপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে। মৃত্যু হয়েছিল তাঁর।

স্থলতান সিকন্দর শাহ পরাজিত, মৃত। বিজয়ী হয়েছিলেন গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। কিন্তু এমন জয় তিনি চাননি। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শিশুর মত দুরন্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন তিনি।

স্থলতান হলেন গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। আমীর ওমরাহের দল তাঁর হাত ধরে মসনদে বসালেন। নতুন স্থলতানের নামে খুতবা পাঠ হ'ল। তিনি হলেন বাংলার দণ্ডমুণ্ডের মালেক।

তারপর?

আবার তিনি চমকে উঠলেন। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলেন। কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। সে কষ্ট জানাবার জন্যে ওদের যেন ডাকতে গেলেন তিনি। পারলেন না। ব্রজ একটু আগে তাঁর আশে পাশে ছিল, তাকেও দেখতে পেলেন না। একটু দূরে ওরা যেখানে নদীর চরে মশাল জ্বেলেছিল সেদিকে তাকালেন। মশালের আলো জ্বলছে। ওদের দেখতে পেলেন। গোল হয়ে বসেছে ওরা। হয়তো আহার করছে।

না, ওদের তাঁর প্রয়োজন নেই। সকালে পাণ্ডুয়া থেকে যাত্রা করেছেন। বৈশাখের খর রোদে সমস্ত দিন একভাবে দাঁড় বেয়েছে। এতটুকু বিশ্রাম ছিল না। সারাদিনে আজ আহারও জোটেনি। না, না, ওরা আহার করুক। মানুষ মাত্রই বিশ্রামের প্রয়োজন হয়।

তিনি আকাশের দিকে চাইলেন। কালো আকাশ। মেঘের ভারে থমথম করছে। কিন্তু এবার বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই। বৈশাখের রুদ্রমূর্তির একদিনও প্রকাশ ঘটেনি। এমন হয় না। এমন বড় একটা দেখা যায় না। এবার কী যেন হয়েছে। কাল-বৈশাখীর দেখা নেই এবার। শূন্য ধূ-ধূ প্রান্তর। দুপুরের রৌদ্রে ধুলো ওড়ে। চাতকের দল পিপাসায় কেঁদে সারা হয়। অফুরন্ত খাদ্যশস্য, তাই অভাব নেই মানুষের। কিন্তু মানুষ চিন্তিত।

চিন্তিত তিনি নিজেও। চিন্তার সমুদ্র আজ তাঁকে দিশাহারা করে তুলেছে। ভাবতে পারছেন না কী করবেন। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। মানব দরদী সুলতান। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁর কাছে সমান। সমান অধিকারে অধিকারী।

বেগমের ষড়যন্ত্রে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন বিদ্রোহ করতে। যুদ্ধে জয়লাভের পর সেই বেগমের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা

করেছিলেন! বেগম তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন কী না জানেন না। তিনি কিন্তু একটি দিনের জন্যেও অন্যায় ব্যবহার করেননি। সতের জন ভাইয়ের কাউকেই মসনদের জন্যে দূরে সরিয়ে দেননি।

ছুটে গিয়েছিলেন পিতা নির্মিত আদিনা মসজিদে। সিকন্দর শাহের বড় সাধের মসজিদ (১৩৬৯ খ্রীঃ নির্মিত) ছিল এটি। এখানে তিনি প্রতিদিন এসে নামাজ পড়তেন। গিয়াসুদ্দীনও আদিনা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়েছিলেন। খোদাকে ডেকেছিলেন। তাঁর অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, জিন্দেগীটায় গুণাহ আমিও কম করিনি। শাহজাদা গিয়াসুদ্দীনের অনেক কসুর। যে অন্যায় শাহজাদারা সকলকে জানিয়ে করে, আমি তা করতাম চুপেচুপে। কেউ ভাবতে পারতো না, আমি কোন অন্যায় করতে পারি। লেকিন, আমি তা করতাম। সরাব খেতাম, হারেমের বাঁদীগুলোকে নিয়ে ফুর্তি করতাম। কেউ ধরতে পারতো না আমাকে। লেকিন, আমি একদিন ধরা পড়ে গেলাম। বিহার থেকে দরবেশ মুজাফফর শামন্ বাল্‌খি এসেছেন আব্বাজানের কাছে। আব্বাজান তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা তাঁকে সালাম জানালাম। সকলের সঙ্গেই তিনি হাসিমুখে আলাপ করলেন। কেবল আমার দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে হাসতে লাগলেন তিনি। প্রথমটায় আমার কিছু মনে হয়নি, কিন্তু কী যেন হল আমার। সন্দেহ ঘনালো মনে, আমি চিন্তিত হলাম। রাত্রে শয্যায় শুয়ে কেবলই ছটফট করলাম! ঘুম এল না। এক চিন্তা, কেন তিনি আমাকে দেখে হাসছিলেন? কোন্ উদ্দেশ্যে? চমকে উঠলাম। তবে কী আমি ধরা পড়ে গেছি? না না, তাইবা কেমন করে সম্ভব? নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে। লেকিন, কী কারণ?

পরদিন ভোর হতেই তাঁর কাছে ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম, সত্যি আমি ধরা পড়ে গেছি। তিনি আমাকে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন,

বেটা, সাচ্চা হবার চেষ্টা কর। সেই চেষ্টাই আমি করেছি তারপর থেকে। আমি ভাল হবার চেষ্টা করেছি।

সত্যই তাই করেছেন তিনি। এতদিন মানুষের মন্দ চিন্তা করেননি। মানুষ কী করে সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে সেই কথা ভেবেছেন। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মকেই তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। হিন্দুর মন্দির নির্মাণে বাধা দেননি, মুসলমানদের জন্যে মসজিদ তৈরী করে দিয়েছেন। মক্কা ও মদিনায় দুটি মাদ্রাসা তৈরী করে দিয়েছেন। তিনি নিজে হানাফী। কিন্তু হাসাফী, শায়েফী, মালেফী, আর হানবলা—মুসলিম সম্প্রদায়ের এই চারটি মথাহফের জন্মেই বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি উদার, ধর্ম নিরপেক্ষ। তিনি...

না-না, মিথ্যা ভুল!

আবার চমকে উঠলেন তিনি। চারিপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কেউ নেই। মাথার ওপরে অমাবস্যার অন্ধকার আকাশ। নীচে মহানন্দার খরস্রোত। তীরে নিস্তব্ধ বনানী। একটু দূরে নদীর চরে সঙ্গীরা আহারে ব্যস্ত। তবে?

কে বললে, কে বললে ও কথা? তিনি নিজে? না, তা তো নয়। যে কণ্ঠস্বর তিনি শুনেছেন, তা তাঁর নিজের নয়। তবে কে বললে ও কথা—কে?

অনেকক্ষণ নীরব নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হল তাঁর। সত্যের মুখোমুখী হলেন তিনি।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। মানব দরদী সুলতান নামে খ্যাত। কিন্তু আজ? আজ তিনি একি করছেন? এ তাঁর কী পরিচয়?

অসমবয়েসী তাঁরা, তবু একদিন বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলেন। সুলতানকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। শ্রদ্ধা করেন এই জন্যে, তিনি মহৎ, মানব দরদী, হিন্দু মুসলমান উভয়েই তাঁর কাছে সমান।

কিন্তু আজ যে তা কত মিথ্যা, ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি জানতে পেরেছেন,তাঁর হীন জঘন্য মনোবৃত্তির কথা। আজ হিন্দুরা তাঁর কাছে কাফের। মোল্লার দল হিন্দু সমাজের বুকে আঘাত হানছে। তিনি দেখেও নীরব। প্রতিবাদ জানিয়েও আজ তাঁর কাছে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর একমাত্র বক্তব্য, এ নিছক রটনা, সত্য নয়!

কিন্তু তা যে কত মর্মান্তিক সত্য তা তিনি জানেন। জানিয়েছেন সুলতানকে। প্রতিকার কামনা করেছেন। কিন্তু কে করবে প্রতিকার? সুলতান যে আজ অন্ধ সেজেছেন। কিছু দেখেও দেখছেন না। হিন্দুর বুক ফাটা আর্তনাদ তাঁর কানে পেঁাচাচ্ছে না। বধির হয়েছেন তিনি আজ।

বলেছিলেন, এ সত্য নয় দোস্ত। নিশ্চয়ই আপনাকে কেউ ভুল শুনিয়েছে।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি জাহাঁপনা। বলেছিলেন তিনি।

আপনি দেখেছেন! চিন্তিত হয়েছেন তিনি। অভিনয় করেছেন তাঁর সঙ্গে। যেন ভোলাতে চেয়েছেন। ডেকে পাঠিয়েছেন দরবেশদের নেতা নূরকুৎব্ আলমকে। বলেছেন, একি শুনছি আপনাদের বিরুদ্ধে। আপনারা নাকি হিন্দুদের ধরে কলমা পড়াচ্ছেন।

আমরা! যেন আকাশ থেকে পড়েছিলেন বৃদ্ধ দরবেশ। বলেছিলেন, তোবা, তোবা! এ আপনি কী বলছেন জাহাঁপনা? কে বলেছে আপনাকে এ কথা?

সুলতান যেন পাকা অভিনেতা। নিখুঁত অভিনয় করেছেন তিনি। বলেছেন, কথাটা কিছুদিন ধরেই কানে আসছে আমার। অনেকেই আমার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে।

অভিযোগটা সুলতানের কাছে কে জানিয়েছেন, সেটুকু বুঝতে দেরি হয়নি নূরকুৎব্ আলমের। তীর্যক দৃষ্টিতে একবার

তিনি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছেন। সুলতানকে বলেছেন, এ সত্যি নয় জাহাঁপনা।

মিথ্যা বলছেন ?

হ্যাঁ জাহাঁপনা। এ কোন নিন্দুকের রটনা।

লেকিন, যাঁরা আমার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, আমি জানি তাঁরা অতি সৎ ব্যক্তি। চিন্তা করেছেন সুলতান। বলেছেন, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে, না হলে তাঁরা আমার কাছে আপনাদের বিরুদ্ধে কখনই অভিযোগ জানাতেন না। আমার এতদিনের রাজত্ব কালে এমন অভিযোগ আগে তো কখনো জানায় নি তারা ?

আমার বদনসিব! করুণ হয়েছে বৃদ্ধ দরবেশের কণ্ঠস্বর। চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে তাঁর। বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি মেহেরবান খোদার কাছে কোন অপরাধ করেছি। সেই গুণাহেই আমার এই বদনাম। লেকিন, আপনি বিশ্বাস করুন জাহাঁপনা, কোন হিন্দুকে জোর করে আমরা কখনো কলমা পড়াই নি। কারণ আমি জানি, বিশ্বাস করি, খোদাতালার এই দুনিয়াতে আমরা সকল মানুষই সমান। এই বিশ্বাসের অমর্যাদার চেয়ে মৃত্যু আমার কাছে অনেক আনন্দের। তবে কোন হিন্দু যদি স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হতে চায়, ইসলামের প্রতি তার বিশ্বাসেও বাধা দিই নি। এই বাধা না দেওয়া যদি আপনার কাছে গুণাহের হয়, আপনি আমাকে শাস্তি দিন। আপনি সুলতান, যে শাস্তি আপনি আমাকে দেবেন তাই আমি মাথা পেতে নেব, এতটুকু প্রতিবাদ জানাবো না।

ফকিরকে বিদায় দিয়েছিলেন গিয়াসুদ্দীন। তারপর তাঁর দিকে চেয়ে বলেছিলেন, এবার বলুন দোস্ত, আমি কী করবো ? আপনি যদি দরবেশকে অপরাধী মনে করে শাস্তি দিতে বলেন, তাহলে আমি তাই করবো।

কী বলবেন তিনি ? কিছুই বলেন নি, চুপ করে ছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, এ গভীর ষড়যন্ত্র। মোল্লার দল সুলতানের

ইচ্ছানুসারেই জঘন্য কাজ করে যাচ্ছে। নিজেকে তার ছোট মনে হয়েছিল। নিজের কাছে ছোট হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ছিঃ, ছিঃ, একি করেছেন? মুখোসের অন্তরালে একজন স্বার্থপর পরধর্ম বিদ্বেষী পশুকে তিনি এতদিন শ্রদ্ধা করেছেন, ভালবেসেছেন। সারা জীবনটাকে কাটিয়েছেন মঙ্গল চিন্তায়। অন্তরটা তাঁর ব্যথায় ভরে গেছে। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের এই পরিবর্তন তিনি মেনে নিতে পারেন নি। কারণ সুলতানকে নিয়ে যে তার অনেক আশা, স্বপ্ন! সেই স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মনের কোণে তখনও তার ক্ষীণ একটু আশা জেগেছিল। হাফেজ-বন্ধু মানব-দরদী সুলতানকে তিনি মানব রূপেই দেখতে চেয়েছিলেন। বন্ধু সমব্যথী।

ভুল হয়েছে। কোথাও নিশ্চয়ই একটা ভুল আছে। সেই ভুলের সংশোধন চেয়েছিলেন তিনি। আরো সতর্ক হয়েছিলেন। মোল্লার দলের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। ধরতে হবে। সুলতানকে বিশ্বাস করাতে হবে তিনি সত্য বলেছেন। অসৎ পথের পথিক হয়েছে মোল্লা আর দরবেশের দল।

খুব বেশি দেরি হয়নি। ওরাও সতর্ক হয়েছে। তিনি সতর্ক হয়েছেন আরো। ধরা পড়েছে একদিন। ওদের তিনি হাতেনাতে ধরেছেন। জোর করে কলমা পড়িয়েছেন এক হিন্দু ব্রাহ্মণ যুবককে। সকলকে ধরে দরবারে হাজির করেছেন তিনি।

কিন্তু ফল কী হল? হিন্দু যুবক আজ কারাগারে। মহানুভব সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বিচার করে কারাদণ্ড দিয়েছেন যুবককে। মোল্লার দল হাসতে হাসতে ফিরে গেছে মসজিদে। যুবকের অপরাধ, সে এক মুসলমান যুবকের সুন্দরী বিবির প্রতি আসক্ত হয়। গোপনে মেলামেশা সুরু হয় তাদের। এমনি ভাবেই চলছিল। কিন্তু একদিন ধরা পড়লো তারা। ধরলে সেই মুসলমান যুবক। বিবিকে ফেরাতে চেয়েছিল যুবক, তার সব

অপরাধ ভুলে ক্ষমা করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজি হয়নি বিবি। ফলে তালাক দিতে বাধ্য হয়েছিল। এধারে ব্রাহ্মণ যুবক সেই অন্যায়ের পর সরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তা হবে কেন, মেয়েটি ছাড়বে কেন তাকে ? যে তার ঘর ভেঙ্গেছে তাকে সে কোনমতেই ছাড়বে না। সেইজন্যেই ধর্মান্তরিত করার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু হিন্দুর দল বাধা দিল সে অনুষ্ঠানে। জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল যুবককে। একবারও ভাবলে না মেয়েটির কথা। বিচার করলে না অপরাধী কে ?

বিচার করলেন মহানুভব সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। বিচারকের আসনে বসে ন্যায়দণ্ড উচ্চারণ করলেন তিনি। যুবক অপরাধী। আজীবন কারাদণ্ড ভোগ করবে সে।

মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণপ্রায়। বৈশাখের আকাশে প্রভাতের সোনালী সূর্য রুদ্ররূপ ধারণ করেছে। তৃণহীন ধূ-ধূ মাঠে সঞ্চয়ী চড়ুয়ের আনাগোনা। নদীর ধারে ধারে বকের দল আহার সংগ্রহে ব্যস্ত। কোথাওবা দুরন্ত বালকের দল নগ্ন গায়ে খেলায় মেতেছে নদীর ঘাটে। বউ-ঝিয়ের দল যারা কথপোকথনে মগ্ন তাদের বিরক্ত করছে বার বার। তাঁদের শাসন উপেক্ষা করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে।

দু চোখ ভরে দেখছিলেন তিনি। দেখতে বড় ভাল লাগছিল তাঁর। যত দেখছিলেন আশ মিটছিল না যেন। মনে পড়ছিল অতীতকে। হারানো অতীত। যে অতীত ফিরে আসবে না আর কোন দিন। শুধুমাত্র স্মৃতিটুকুই আজ সম্বল। তাই আজও মাঝে মাঝে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় অতীত। অতীতের কত শত মধুর স্মৃতি ভেসে ওঠে মানসপটে। বড় ভাল লাগে তাঁর। ভাললাগার স্বপ্নে বিভোর হয় মন। বিস্মৃত হন সব কিছু। মুছে যায় বর্তমান।

আজও হয়তো তাই হয়েছিল। অতীতের স্মৃতি ভুলিয়েছিল মন। সব ভুলে হারিয়ে গিয়েছিলেন কোথায় যেন। তাই কখন

প্রাসাদের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়েছে জানতে পারেন নি তিনি। ব্রজর ডাকও তাঁর কানে পৌছায় নি।

বিস্মিত ব্রজ তাই আবার ডাকল তাঁকে, বড় মশায়।

এবার ব্রজর ডাক তাঁর কানে পৌছাল। স্বপ্ন ভেঙ্গে জেগে উঠলেন যেন তিনি। ওর মুখের দিকে অবাক চোখ দুটি মেলে চাইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে ডাকলি ব্রজ?

হ্যাঁ, বড় মশায়। আমরা পৌছে গেছি।

পৌছে গেছি! তিনি দেখলেন। ঘাটে ওরা কখন নৌকা বেঁধেছে তিনি জানতে পারেন নি। এমনই তন্ময় ছিলেন অতীত চিন্তায়।

ব্রজ বলল, আমি কী সঙ্গে যাব?

না, তুই বাড়ি যা। বললেন তিনি, সন্ধ্যায় আসিস একবার। আর শোন, যাবার আগে একবার দেওয়ান মশায়কে সংবাদ দিয়ে যাস। তিনি যেন বিকালে একবার আমার সঙ্গে দেখা করেন।

কথা কটা বলে নৌকা থেকে নামলেন তিনি। নদীর ঘাট থেকে সোপানশ্রেণী উঠে গেছে উপরে। শেষ হয়েছে প্রাসাদ দ্বারে। তিনি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে উপরে উঠলেন। দ্বার বন্ধ। এধারটা অন্দরমহলের দিক। সেইজন্য সব সময় দ্বার বন্ধ থাকে। তিনি দ্বারে করাঘাত করলেন।

একটু পরে দ্বার মুক্ত করে দিল দাসী। প্রণাম করল তাঁকে।

ভাল আছিস তো রাধার মা? হাসি মুখে জানতে চাইলেন তিনি।

রাধার মা বললে, হ্যাঁ বাবা।

মা কেমন আছে রে?

ঠাকুরাণী ভাল আছেন।

রাধার মায়ের মুখে মায়ের শুভ সংবাদ শুনে একটু আশ্বস্থ হল তাঁর মনটা। বললেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি রাধার মা। তোর

মাকে গিয়ে বলগে খাবার ব্যবস্থা করেন যেন। বড় খিদে পেয়েছে।

কথাক'টা বলে মার কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। দুপুরে সমস্ত প্রাসাদটা শান্ত বললেই চলে। কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করে দক্ষিণের শেষ প্রান্তে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ কানে এল তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বর। রাজেশ্বরীর কক্ষ থেকেই নির্গত হচ্ছে ধ্বনী। কে যেন মহাভারত পাঠ করছে। কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন তিনি। এ তাঁরই পুত্রবধূর কণ্ঠ। কিন্তু তিনি বিস্মিত হলেন এই ভেবে, পুত্রবধূ যে এত সুন্দর মহাভারত পাঠ করতে পারে, এ সংবাদ তিনি জানতেন না।

মৃণ্ময়ী তখন পড়ছিল:

অর্জুন-কর্ণতে যুদ্ধ লোকেতে ভীষণ।
করিলেন যুদ্ধ যেন শ্রীরাম-রাবণ॥
নানা অস্ত্র দুইজন দোঁহারে মারয়।
দূরে রহি রাজগণ দণ্ডাইয়া চায়॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর অতুল প্রতাপ।
এক বাণে সৃজিলেন শতশত সাপ॥
মহাশব্দে আসে সর্প যুড়িয়া আকাশ।
দেখিয়া…

হঠাৎ মৃণ্ময়ীর কণ্ঠটা নিশ্চুপ হয়ে গেল। রাজেশ্বরী শয্যায় শুয়েছিলেন। মৃণ্ময়ী হঠাৎ চুপ করে যেতে চোখ না মেলেই বললেন, কী হল রে, চুপ করলি কেন? তারপর কী হল বল দিদিভাই?

তাঁকে দেখেই যে মৃণ্ময়ী চুপ করেছে বুঝতে পারলেন তিনি। হাসতে হাসতে পুত্রবধূর অসমাপ্ত পদটা পূরণ করলেন। বললেন, দেখিয়া নৃপতিগণে লাগিল তরাস॥ তাই না মা? ঠিক বলেছি তো?

মৃণ্ময়ী কী বলবে, তার আগে শয্যায় উঠে বসেছেন রাজেশ্বরী। আনন্দে যেন চিৎকার করে উঠলেন, খোকা!

মা! দু বাহু বাড়িয়ে মায়ের কাছে এগিয়ে গেলেন। পদধূলি তুলে নিলেন মাথায়। রাজেশ্বরী অনেকদিন পরে পুত্রকে কাছে পেয়ে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

মাতাপুত্রের এই মিলন কিশোরী মৃণ্ময়ী অবাক বিস্ময়ে দুচোখ ভরে দেখল। মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল তার ওষ্ঠে। হাসি মুখেই কাছে এসে পদধূলি মাথায় নিল তাঁর।

পুত্রবধূর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন তিনি। রাজেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর একটি কোথায় গেল মা?

আর একটি বলতে যদু নারায়ণের বধূ। নাম চিণ্ময়ী। সপ্তগ্রামের নারায়ণ তর্করত্নের প্রথমা কন্যা চিণ্ময়ীর সঙ্গে বছর পাঁচেক পূর্বে যদু নারায়ণের বিবাহ হয়। মৃণ্ময়ী তখন নিতান্ত বালিকা। গুরুদেব পদ্মনাভ সম্বন্ধ এনেছিলেন যদুর। নারায়ণ তর্করত্ন তাঁর বন্ধু ছিলেন। অতীতে একই টোলে বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন তাঁরা। তারপর অনেকদিন বন্ধুর সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ বহুদিন পরে বাল্যবন্ধুর আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তিনি। দেখেছিলেন চিণ্ময়ীকে। অমন সুলক্ষণা কন্যা তিনি খুব কমই দেখেছেন। সে কথা কথায়-কথায় একদিন জানিয়ে ছিলেন রাজেশ্বরীকে। আগ্রহী হয়েছিলেন রাজেশ্বরী। তাঁরই উৎসাহে সম্পন্ন হয়েছিল বিবাহ কার্য।

যদুর বিবাহের বছরখানেক পরে মৃণ্ময়ীকে দেখলেন রাজেশ্বরী। দিদির শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে এসেছিল সে। তাঁকে বললেন, মহেশের বিয়ের আমি ঠিক করেছি খোকা। বেয়াই মশাইকে তুই জানিয়ে দিস কথাটা।

জানিয়েছিলেন তিনি। গরীব ব্রাহ্মণ নারায়ণ তর্করত্ন হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছিলেন। এ তাঁর পরম সৌভাগ্য। একটি নয়, দুটি কন্যাই তিনি সৌভাগ্যবানের গৃহে অর্পণ করতে পারলেন। পূর্বজন্মের সুকৃতি ছাড়া এমন তো সম্ভব নয়। গণেশ নারায়ণ

শুধুমাত্র ভূ-স্বামী নন। লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র তিনি। গৃহ তাঁর আনন্দের হাট। তাঁর প্রজারা দুঃখ যে কি জানে না। তিনি কারু মনে দুঃখ দেন না। ভাগ নেন অন্যের বেদনার। বলেন, আমার প্রজারা আমার ভাই, বন্ধু, আত্মীয়। তাদের দুঃখ বেদনা আনন্দের সমান অংশীদার আমিও। তাদের ঘরে যদি আলো না জ্বলে, আমি চেষ্টা করবো অন্ধকার গৃহে আলো জ্বালাতে। যদি ব্যর্থ হই, আমিও নিস্প্রদীপ করে রাখবো আমার গৃহ। সবার গৃহ আলোকিত হলেই আমার গৃহে আলো জ্বলবে।

দিন্দেশ প্রসিদ্ধ উদয়ণ আচার্যের বংশধর, একথা তাঁর মুখেই শোভা পায়। এমন কথা তিনি ভিন্ন আর কে বলতে পারে ? কেউ পারে না।

নারায়ণ তর্করত্ন তাঁর হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, আপনি মহৎ।

রাজেশ্বরী জানতে চাইলেন, কী ভাবছিস খোকা ?

সচেতন হলেন তিনি। মনে পড়লো একটু আগে কী জানতে চেয়েছিলেন যেন। হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার দিদি ভাইয়ের আর একজন কোথায় মা ?

একটু আগে মার কাছে গেছে দিদি। মৃদু কণ্ঠে বললে মৃণ্ময়ী।

তুমিও একবার যাও মা। মাকে গিয়ে বলবে, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। কথাটা পুত্রবধূকে বললেন তিনি।

যাচ্ছি বাবা। কথাটা বলেই কক্ষের বাইরে গেল মৃণ্ময়ী। মাতা পুত্র দুজনেই বুঝতে পারলেন, বধূটি বাইরে গিয়েই ছুটতে সুরু করেছে।

হেসে ফেললেন তিনি। রাজেশ্বরী বললেন, হাসছিস কেন খোকা ?

তোমার দিদিভাইটি চোখের আড়ালে গিয়েই ছুটতে সুরু করেছে মা। হাসতে হাসতেই কথাটা বললেন তিনি।

রাজেশ্বরীও হাসলেন। বললেন, ওর দোষ কী বল? তুই যে ভাবে খিদের কথাটা বললি, ও ভাবলে সত্যিই তোর ভীষণ খিদে পেয়েছে।

সত্যিই খিদে পেয়েছে মা।

না খোকা। মাথা নাড়লেন রাজেশ্বরী। সত্যিই তোর ভীষণ খিদে পায় নি। তা যদি পেত, তাহলে এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতিস না। এতক্ষণ বাড়ি মাথায় করে তুলতিস। সত্যি করে বলতো, দিদিভাইকে এখান থেকে সরিয়ে দিলি কেন?

রাজেশ্বরীর সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, তুমি এখন কেমন আছ মা?

আছি ভাল। কিন্তু ওকে সরিয়ে দিলি কেন?

রাজেশ্বরীর শয্যাপার্শ্বে বসলেন তিনি। বললেন, তোমার কাছে একটু বসব বলে।

হেসে ফেললেন রাজেশ্বরী। বললেন, তুই এখনো ঠিক তেমনি আছিস গনেশ।

তোমার কাছে এখনো যে আমি সেই খোকাটিই আছি মা। কথাটা বলে দুই হাতে মাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল রাজেশ্বরীর। পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ রে খোকা, পথে তোর সঙ্গে দাদু ভায়ের দেখা হয়নি?

যদুর সঙ্গে! সে কোথায়?

আজ সকালেই তো তোর কাছে গেল ও। তুই কোন্ পথ দিয়ে এসেছিস?

আমি নৌকায় এসেছি মা। কিন্তু যদু আবার আমার কাছে গেল কেন?

রাজেশ্বরী বললেন, তোর ব্রজ গোপাল তো একটি ভূত। পরশু ও যাবার পর ভাবলুম, আমার শরীর খারাপ হয়েছে দেখে গিয়ে তোকে কা বলতে না কী বলবে। হয়তো তুই কাজের ঝামেলায়

আছিস, হয়তো সব ফেলে ছুটে আসবি। হতভাগাকে তবু বার বার করে বলে দিয়েছিলুম এসব যেন না বলে। যা না বলেছি হতভাগা তাই বলে বসে আছে। আমিও দাদুভাইকে এতটা পথ মিথ্যে পাঠালুম।

সত্যিই তো তোমার শরীর খারাপ করেছিল মা? মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন তিনি।

রাজেশ্বরী যেন ধমকে উঠলেন পুত্রকে। বললেন, একটু শরীর খারাপ করলো কী না করলো শুনেই ছুটে আসতে হবে তোকে। বুড়ো হয়েছি, এখন কি রোজই সুস্থ থাকবো? মাঝে মধ্যে একটু শরীর খারাপও করতে পারবে না?

তা নয় মা। একটু হাসলেন তিনি, বললেন, কদিন ধরেই তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করছিল। তোমার কথা বার বার মনে পড়ছিল আমার।

তাঁর কথার সুরে রাজেশ্বরীর অন্তরটা এক মুহূর্তে কেঁপে উঠল। পুত্রের মুখের দিকে ক্ষীণ দৃষ্টিটা যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে চাইলেন তিনি। সন্দেহ ঘনাল। ওকে কেমন যেন বিচলিত মনে হল তাঁর। প্রমাদ গণলেন তিনি। বললেন, কী হয়েছে রে খোকা?

কী হয়েছে? মায়ের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। দেখতে পেলেন, মা তাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। দ্বিধা জাগলো মনে। নিজেকে সংযত করলেন তিনি। স্থির করলেন, কথাটা প্রকাশ করা উচিত হবে না তাঁর। তাই নীরব রইলেন।

রাজেশ্বরী ডাকলেন, খোকা!

মা! বিচলিত কণ্ঠে সাড়া দিলেন তিনি।

কী হয়েছে খোকা, আমাকে বল।

না, বলা উচিত হবে না তাঁর। জননী বৃদ্ধা হয়েছেন। সুস্থা নন তিনি। এ সময় তাঁর মিথ্যা চিন্তার কারণ হওয়া উচিত হবে না তাঁর পক্ষে। বললেন, কদিন কেবলই তোমার কথা মনে হচ্ছিল মা।

কেন খোকা? উৎসুক নেত্রে রাজেশ্বরী পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা হচ্ছিল আমার। মিথ্যা বললেন তিনি। বলতে বাধ্য হলেন। এ তাঁর নিজের সমস্যা। হয়তো তা নয়। কারণ, সমস্যাটা তাঁর একারই। এ অন্যায়ের প্রতিকারের কথা আর কেউ ভাবছে না। হয়তো বা ভাবছেন। প্রকাশ করতে সাহসী হচ্ছেন না। তিনিই অগ্রণী হয়েছেনও। সুলতানের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কামনা করেছেন ন্যায় বিচার। কিন্তু কার কাছে বিচার প্রার্থনা করেছেন? সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের কাছে? যিনি আজ দীর্ঘ বিশ বছরের রাজ্যশাসনে দেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তি, শৃঙ্খলা। প্রজারা তাঁর সুশাসনে সুখী। সেই তিনি আজ অন্যায়ের পক্ষালম্বন, অন্যায়কারীদের সমর্থন করছেন। একি সম্ভব! না সম্ভব নয়। কেউ বিশ্বাস করবে না একথা। উল্টে তাঁকেই স্বার্থপর বলবে সবাই। বলবে, নিজের স্বার্থের জন্য তিনি এই মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন। সুলতান মহৎ, উদার তাঁর ধর্মনীতি। এমন অন্যায় তাঁর পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু সত্যই তা হয়েছে। যা ছিল অকল্পনীয়, অসম্ভব, মানব ধর্মের পরিপন্থী তাই আজ নিষ্ঠুর সত্য রূপে দেখা দিয়েছে। কেউ না জানলেও তিনি জানেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। আর...

খোকা! রাজেশ্বরী ডাকলেন তাকে।

তিনি তাঁর মুখের দিকে নীরবে চাইলেন।

রাজেশ্বরী মৃদু কণ্ঠে বললেন, আমি সব জানি খোকা।

মা! কেঁপে উঠলেন তিনি।

সুলতানের সঙ্গে তোর বিরোধ বেধেছে?

আশ্চর্য হলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, এ কথা তোমায় কে বললে মা?

রাজেশ্বরীও সত্য প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন, আমি শুনেছি খোকা!

ব্রজ নিশ্চয়ই বলেছে তোমায়?

রাজেশ্বরী চুপ করে রইলেন। সত্যই তাই। ব্রজই বলেছে তাঁকে। কদিন আগে সে যখন এসেছিল, তিনি সব কথা জেনেছিলেন তার কাছে। বর্তমান স্থলতানের সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক যে আর পূর্বের মত মধুর নেই, সে কথা সেই প্রকাশ করেছিল। বিরোধের কিছু কিছু কারণও জানিয়েছিল। দুঃখিত হয়েছিলেন তিনি। ব্যথা পেয়েছিলেন, পুত্রের সঙ্গে স্থলতানের বিরোধের জন্যে নয়, হিন্দুর প্রতি গিয়াস্থদ্দীনের এই বিরূপ মনোভাবের কথাটা শুনে। অবশ্য পুত্রের জন্যে চিন্তিত যে হননি তা নয়, তবে আনন্দিতও হয়েছিলেন। পুত্র তাঁর উচিত কর্মই করেছে। হিন্দুর প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে হিন্দু যদি এগিয়ে না আসে, প্রতিকার যদি না করে, তাহলে চলবে কেন! সেই সঙ্গে এ কথাও চিন্তা করেছিলেন, অনেকের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ, প্রতিকার কী একা তাঁর পুত্রের পক্ষে সম্ভব?

আর ভেবেছিলেন সেদিনের কথা। অতীত! যেদিন বিপদে বন্ধুর সহায় বন্ধুকেই হতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, বিপদের দিনে যে বন্ধু বন্ধুকে ত্যাগ না করে, সেইতো প্রকৃত বন্ধু! কারণ, সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল,—পুত্রের মুখে গিয়াস্থদ্দীনের সব কথা শোনার পর তাঁকে মানুষ বলে মনে হয়েছিল তাঁর। মানুষের প্রকৃত পরিচয় ধর্মের গোঁড়ামিতে বাঁধা পড়ে না, হিন্দু মুসলমানের ভেদ জানায় না, মানুষকে ভাই, বন্ধু, আত্মীয় বলে বুকে টেনে নেয়। মানব ধর্মের একমাত্র পথ যে প্রেমে। প্রেম মানুষকে ভোলায়। উচ্চ নীচের ভেদ ঘুচিয়ে দেয়। প্রেমের আর এক নাম যে মানবতা।

সেই মানবতার মহামন্ত্র থেকে দূরে সরে গেছেন গিয়াস্থদ্দীন আজম শাহ। ভুলে গেছেন অতীত। বিচ্যুত হয়েছেন মানব ধর্ম

থেকে। গোঁড়ামী, অন্ধত্ব আজ গ্রাস করেছে তাঁকে। হিংসায় পরিপূর্ণ হয়েছে অন্তর। কিন্তু কেন, কেন এমন হল? কেন তিনি এ ভুল করলেন? মানুষের অন্তর থেকে দূরে সরে গেলেন?

মা!

পুত্রের আহ্বানে রাজেশ্বরী তার মুখের দিকে চাইলেন।

আমি কি ভুল করেছি মা? অন্যায়···

পুত্রের গায়ে একখানি হাত রাখলেন রাজেশ্বরী। কী যেন বলতেও যাচ্ছিলেন। কিন্তু বলা হল না। দ্রুত পদশব্দ শুনলেন। কক্ষে এসে প্রবেশ করল মৃণ্ময়ী।

দিদিভাই কী ছুটে এলি? রাজেশ্বরী জানতে চাইলেন কথাটা।

লজ্জা পেল মৃণ্ময়ী। ধরা পড়ে কী যেন বলতে গেল। বলতে না পেরে মাথাটা নীচু করে নিল।

হাসলেন রাজেশ্বরী। বললেন, একটু ছুটে দেখা না ভাই। পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আমার কথাটা বিশ্বাস করছিস না গণেশ। নিজের চোখে দেখে নে, কত সুন্দর ছুটতে পারে তোর বউমা। তোর আরবী ঘোড়াও অত জোরে ছুটতে পারে না।

মায়ের কথার ধরণে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন তিনি। লজ্জা পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল মৃণ্ময়ী। কিন্তু সামান্য পরেই ফিরে এল আবার। এসে দাঁড়াল মাথা নীচু করে।

পুত্রবধূর মুখের দিকে চাইলেন তিনি। কিশোরী নয়, ওকে এখনো বালিকা বলাই চলে। সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমের মতই নির্মল। একটু চঞ্চল প্রকৃতি। চিণ্ময়ীর ঠিক বিপরীত। একজন ধীর, স্থির, নম্র—আর একজন সদাই আনন্দে উচ্ছল। যেন দুই নদীর দুটি ধারা। একে অন্যের পরিপূরক।

তিনি ওকে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, লজ্জা কী মা। আমি কিছু মনে করিনি।

কথাটা শুনেই আনন্দে হেসে উঠল মৃণ্ময়ীর দুই চোখের তারা। বললে, সত্যি!

সত্যি। তিনিও হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, তোমার ইচ্ছামত তুমি সারা দিন রাত্রি এ গৃহে আনন্দে নেচে বেড়াও। তারপর বধূর কানের কাছে মুখটা নামিয়ে এনে বললেন, কিন্তু নাচতে বলছি বলে দিদার হাত ধরে কোনদিন নাচিও না যেন। আমার মা গুরুজন হন। তখন কিন্তু রাগ করবো আমি।

শ্বশুর মশাই যে নিতান্ত ঠাট্টা করছেন তার সঙ্গে, বুঝতে পারল না মৃণ্ময়ী। বিশ্বাসে মাথা নেড়ে বললে, আচ্ছা বাবা।

পরম স্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। বড় সরলা বলে মনে হল তাঁর। একবারও চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করল না যে এ ঠাট্টা! আর এই তাঁর প্রকৃতি। তিনি আনন্দময় পুরুষ। যতক্ষণ গৃহে থাকেন আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তিনি নীরবে মুখ বুজে থাকতে পারেন না।

রাজেশ্বরী এতক্ষণ দুজনকে দেখছিলেন, ওদের কথা শুনছিলেন। এবার পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁরে খোকা, এ তুই কী সব বলছিস?

কী বলেছি মা? মায়ের দিকে চেয়ে তিনিও হাসি মুখে জানতে চাইলেন।

কী বলছিস ভেবে দেখ না কথাটা। না না, এ তোর অন্যায়। পুত্রকে যেন মৃদু তিরস্কার করলেন তিনি। স্নেহের শাসন। বললেন, ঘরের বউকে নেচে বেড়াতে বলছিস কী রে? ঘরের বউ যদি নেচে বেড়ায়, তাহলে চলবে কেন?

তাহলে কী করবে মা?

কী করবে কী? পুত্রের কথায় বেশ বিরক্ত হলেন রাজেশ্বরী। বললেন, হিন্দুর ঘরের বউরা যা করে, শ্বাশুড়ী ননদের কথায় উঠবে বসবে। ভোর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সংসারের নানান কাজে ব্যস্ত

থাকবে। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে কিছু থাকবে না। অর্ধাহারে, কোন কোন দিন অনাহারেও দিন কাটাবে। সকলকে খাইয়ে যদি কিছু থাকে তবেই খাবে, নচেৎ নয়। আর এত করার পরেও যদি স্বামী কিংবা শ্বাশুড়ী ননদিনীর দল তিরস্কার, এমন কী মার ধোর করেও, বিনা প্রতিবাদে সেটুকু সহ্য করবে। ভাগ্য বলে মেনে নেবে সব কিছু।

আর ?

আর কী ? পুত্রের কথায় তার মুখের দিকে চাইলেন রাজেশ্বরী।

হাসলেন তিনি। ম্লান দুঃখের হাসি। বললেন, উত্তরকালে সেই নির্যাতীতা বধূর দল যখন শ্বাশুড়ী হবে, তখন পূর্বস্মৃতি স্মরণ করে, তাদের অতীতের অকথ্য নির্যাতনের জ্বালার উপশম করবে তার বধূদের ওপর।

রাজেশ্বরী বললেন, তাইতো।

চমৎকার মা। তিনি যেন ব্যঙ্গ করে উঠলেন। বললেন, হিন্দুর সংসারের এই চিত্রটুকু তুলনাহীন। আমি তাই মাঝে মাঝে ভাবি…

রাধার মা এসে বাধা দিল কথায়। বলল, বাবা মশায়, তুমি এসো। তোমার খাবারের আয়োজন হয়েছে।

মৃণ্ময়ী কথাটা শুনেই যেন লাফিয়ে উঠল। সেই তো শ্বশুর মশায়কে ডাকতে এসেছিল। ছিঃ ছিঃ, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা করল তার! অপরাধী কণ্ঠে বলল, আমি আপনাকে ডাকতে এসেছিলাম বাবা। একেবারে ভুলে গেছি।

একেবারে ভুলে গেছ ? বধূর মুখের দিকে চেয়ে ওর ভঙ্গি নকল করে তিনিও বললেন কথাটা।

মৃণ্ময়ী মাথা নাড়ল। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে রাধার মাকে বললেন, তুই চল রাধার মা, আমি যাচ্ছি। মায়ের মুখের দিকে ফিরে বললেন, হ্যাঁ মা, আমি যত ভাবি, বড় খারাপ লাগে

আমার। হিন্দুর ঘরে এই বধূ পীড়নের কাল আর কতদিন চলবে? হতভাগিনীর দল আর কতদিন এই নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করবে?

তুই তাহলে বউগুলোকে তোর বউমার মত নেচে বেড়াতে বলছিস?

না মা। হাসলেন তিনি। বললেন, আমি শুধু তোমার কথা ভাবি। তুমি তো কোনদিন তোমার বধূকে পীড়ন কর নি?

আমার শ্বাশুড়ী ঠাকরুণও বড় ভাল ছিলেন যে। আর সব শ্বাশুড়ী-ই বধূদের পীড়ন করে না খোকা।

যারা করে তাদের সংখ্যাও বড় কম নয় মা। একটু চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, পিতামাতার চিন্তা, কামনা বাসনাই পুত্রের মাঝে প্রতিফলিত হয়। মাতার কামনাই পুত্রের মাঝে সঞ্চারিত হয় অনেকাংশে। সন্তানবতী নির্যাতীতা ভীতা বধূর দল সুষ্ঠু চিন্তা করবে কি করে? হিন্দু সমাজে আজকের এই যে ভীরুতা, কাপুরুষতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পারার ব্যর্থতা, এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী সংসারের শ্বাশুড়ী ননদিনীর দল। শিশু তার মাকে দিনের পর দিন কাঁদতে দেখছে, দেখছে মায়ের নির্যাতন। শিশুমনে ভয়ের ছায়া নামছে তার। উত্তরকালে সেই ভয়ই প্রতিফলিত হচ্ছে তার মনে।

রাজেশ্বরী পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। কী বলবেন তিনি? এমনভাবে কোন দিন তো তিনি চিন্তা করেন নি! ভাবতে পারেন নি এমন কথা। একদিন বালিকা অবস্থায় তিনি যখন পিতৃ-গৃহে ছিলেন, সেখানে মায়ের লাঞ্ছনা কিছু কিছু দেখেছেন। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের কন্যা তিনি। পাড়ায় অনেক গৃহেই ছিল যাতায়াত। সে সব গৃহে বধূদের লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না। ব্যতিক্রমও অবশ্য ছিল। সেই ব্যতিক্রমটুকু দেখে ভাবতেন, চিন্তা করতেন, মায়ের ওই লাঞ্ছনা টুকু না হলে সংসারের কী এমন ক্ষতি হ'ত! দিবারাত্র পরিশ্রমের পরেও মাকে কেন মাঝে মাঝে ঠাকুরমার তিরস্কার

সহ্য করতে হয়? তারপর একদিন বিবাহ হল তাঁর। মনের মাঝে আতঙ্ক নিয়ে স্বামীর ঘরে এলেন তিনি। সব সময় ভয়ে ভয়ে কাটতো তাঁর। তাঁর সেই ভয়ের ছায়াটুকু সকলের চোখেই ধরা পড়লো। কারণ জানতে চাইলেন সকলেই। স্বামী অনেক দিন অনেকবার জানতে চেয়েছেন। কিন্তু লজ্জায় সে কথা কোন দিন প্রকাশ করতে পারেন নি। একদিন ভয়টা কেটে ছিল মনের। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। সব গৃহ সমান নয়। বধূ সংসারের লক্ষ্মী। তাই পুত্রবধূর উপরও কোনদিন তিনি এতটুকু অন্যায় করেন নি। সত্যবতী হয়তো কোনদিন ভুল করে লজ্জিত হয়েছে, ভয়ও পেয়েছে। তিনি ওর মনের ভয়টুকু কাটিয়ে দিয়েছেন। হাসি মুখে সংশোধন করে নিতে বলেছেন ভুল। বুঝিয়েছেন। কর্তব্য বলেই মনে হয়েছে তাঁর। সংসারের সবার মাঝে সে দিন কাটাবে এতো ঠিক নয়। কিন্তু এমনভাবে কোনদিন চিন্তা করেন নি। পুত্রের সব কথা শুনে তিনি তার মুখের দিকে বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। ভাবলেন, একি বলছে তাঁর পুত্র। এ সত্য ও কেমন করে উপলব্ধি করলো?

মৃণ্ময়ীও চেয়ে আছে তাঁর দিকে। কিশোরী মেয়েটার দুচোখ ভরা বিস্ময়। সে বোঝেনি সব কথা। সব বোঝার মত বয়েসও তার হয়নি। তবু তার মনে হল সে যেন স্বপ্ন দেখছে।

মা, বধূর মুখের দিকে চাইলেন তিনি। হাসিমুখে বললেন, মা, বধূ তো শুধু বধূ নয়, কন্যা। আমার কন্যা নেই, কিন্তু যাদের আছে তাদের বধূর সঙ্গে ব্যবহারের পূর্ব মুহূর্তে চিন্তা করতে হবে আপন কন্যার কথা। কন্যার স্থান স্বামীগৃহ। নিজের কন্যাকে স্বামী গৃহে পাঠিয়ে অন্যের কন্যাকে বধূরূপে ঘরে এনেছি সেটুকু ভুলে গেলে তো চলবে না।

কিন্তু তাই বলে রাত্রি দিন নেচে বেড়াবে এ কেমন কথা খোকা?

হাসলেন তিনি। বললেন, এ সময়টা তো নেচে বেড়াবারই সময় মা?

তাই বলে ঘরের কাজ···

বাধা দিয়ে তিনি বললেন, সে সময় তো যথেষ্ট পাবে। কিন্তু আজকের এই কচি মনটুকু তো আর ফিরে পাবে না কোনদিন।

না, না, খোকা! মাথা নাড়লেন রাজেশ্বরী। ওকে তুই ওসব কথা বলিস নি। তুই চলে যাবি, আর ও সারা বাড়িতে নেচে বেড়াবে। একবার ডাকলেও আর কাছে পাব না। তার চেয়ে ও আমার কাছে থাক। একটা থুথুড়ে বুড়ির কাছে থাকতে থাকতে দুদিনেই কেমন বুড়ি হয়ে যাবে। হ্যাঁ রে দিদিভাই, দেখবি অল্পদিনেই কেমন সুন্দরভাবে তোর ওই কালো চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে যাবে।

মৃণ্ময়ী যেন বিশ্বাস করল কথাটা। রাজেশ্বরীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, সত্যি দিদা?

কথাটা শুনেই হেসে উঠলেন তিনি। অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ল কক্ষটি। মৃণ্ময়ী এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করল ব্যাপারটা। লজ্জা পেয়ে দুই হাতে রাজেশ্বরীর গলা জড়িয়ে ধরলো।

হঠাৎ পায়ে কার স্পর্শ অনুভব করলেন তিনি। দেখলেন চিণ্ময়ী। কখন চুপি চুপি এসে পায়ে হাত দিয়েছে। ওকে দুহাত তুলে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন তিনি। জানতে চাইলেন, কেমন আছ মা?

ভাল আছি বাবা। আপনি?

হাসলেন তিনি। বললেন, আমাকে দেখলে কী খারাপ মনে হয় মা?

সত্যিই তাই। দেখার মত স্বাস্থ্য বটে তাঁর। দীর্ঘ পুরুষ। উন্নত নাসা, বিস্তৃত কপাল, আয়ত চক্ষুদ্বয়। ওষ্ঠদ্বয় সব সময় দৃঢ় বদ্ধ। শালপ্রাংশুর মত আজানুলম্বিত বাহু দুটি শক্তির পরিচয়

দেয়। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় প্রায় উপনীত, কিন্তু দেখলে মনে হয়, এই বুঝি মধ্য যৌবন অতিক্রম করেছেন। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্ত মূর্তিখানি দেখে মানুষ ভাবে তাঁর মনটাও বুঝি কঠিন, কঠোর। কিন্তু সত্যিই তা নয়। দূর থেকে দেখলে তাঁকে কঠিন বলেই মনে হয়। কাছে এলে ভুল ভাঙ্গে। বুঝতে পারেন, কত মিথ্যা চিন্তাই না করেছেন তাঁরা। বড় কোমল তার মনটা। শিশুর মতই সরল। কিন্তু সময়ে ওই কোমল সরল মনটাই বজ্রকঠিন হয়ে ওঠে। আয়ত আঁখিদ্বয় থেকে আগুন ঝরে যেন! অন্যায়ের প্রতিবাদে গর্জে ওঠে কণ্ঠ! নির্ভুল লক্ষ্যে শত্রুর বুকে আঘাত হানে বাহু।

তাঁর প্রশ্নে চিণ্ময়ী যেন একটু দ্বিধায় পড়ল। সে বুঝতে পারল না, কোন্ অর্থে শ্বশুর মশায় তাঁকে এ প্রশ্ন করলেন? তবু সে শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, তা নয় বাবা।

কী নয় মা? তিনি যেন ওকে পরীক্ষা করতে চাইলেন।

মৃদু কণ্ঠে বলল চিণ্ময়ী, আপনি তো কিছুই বলেন না আমাদের।

এ যেন চিণ্ময়ীর অভিযোগ। বললেন, কী বলি না মা?

আপনার কোন কথাই। সত্যই অভিযোগ জানাল চিণ্ময়ী।

সচকিত হলেন তিনি। মনে পড়ল কিছুকাল পূর্বের কথা। সেবার পাণ্ডুয়াতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু কোন কথাই প্রকাশ করেননি। ব্রজ বলে দিয়েছিল। ধরা পড়ে হেসে ছিলেন তিনি। সেই কথাই আজ তুলেছে চিণ্ময়ী। মনে মনে ওর বুদ্ধির প্রশংসা করলেন তিনি। সত্যই মেয়েটি বুদ্ধিমতী। বড় তীক্ষ্ণদৃষ্টি ওর। যত্নর উপযুক্তা সহধর্মিণী। হেসে বললেন, এবার সত্যিই আমি ভাল আছি।

চিণ্ময়ীর ওষ্ঠে একটু মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল। শ্বশুর মশায়ের এই পরাজয় যেন উপভোগ করল সে। তারপর বোনের দিকে চেয়ে বলল, মা তোকে কী বলে দিয়েছিলেন মৃণ্ময়ী?

রাজেশ্বরীর পালঙ্ক থেকে কথাটা শোনার পরই লাফিয়ে নামল মৃণ্ময়ী। বলল, বারে, আমি তো কখন থেকে বাবাকে যেতে বলছি। উনি তো···

বোনের কথার ধরণে তার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চাইল চিণ্ময়ী। নিস্তব্ধ হয়ে গেল মৃণ্ময়ী। মনে হল, এমন ভাবে কথা বলা তার মোটেই উচিত হয়নি।

লক্ষ্য করলেন তিনি। চিণ্ময়ী আজ বয়ঃপ্রাপ্তা, মৃণ্ময়ী কিশোরী। একজন যা বোঝে, অন্যজন তা বোঝে না। মৃণ্ময়ীর পক্ষাবলম্বন করে চিণ্ময়ীকে তিনি বললেন, ওর দোষ নেই মা। রাধার মাও আমাকে ডেকে গেছে। চল, আমি যাচ্ছি। মাকে বললেন, আমি আসছি মা?

আয় বাবা। বললেন রাজেশ্বরী।

তিনি কক্ষ থেকে বাইরে এলেন। মৃণ্ময়ী হয়তো সঙ্গে আসছিল। চিণ্ময়ীর ডাক শুনলেন তিনি। বোনের নাম ধরে ডাকল যেন সে। মাও কী যেন বললেন।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে দ্বিতলে উঠলেন তিনি। আপন কক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন, সত্যবতী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে।

তিনি কক্ষে প্রবেশ করতে ধীর পদক্ষেপে কাছে এল সত্যবতী। গলায় আঁচল দিয়ে নত হয়ে প্রণাম জানালেন স্বামীর পায়ে। প্রণাম সেরে ওঠার পর দুই বাহুর বন্ধনে স্ত্রীকে বুকে টেনে নিলেন তিনি।

স্বামীর এই ব্যবহারে একটু যেন চকিত হলেন সত্যবতী। মুক্ত দ্বারপথে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, এ কি করছো, ছাড়!

সত্যবতীকে ছাড়লেন না কিন্তু তিনি। স্ত্রীর এই ভয়টুকু বরং উপভোগ করলেন। বললেন, কেন, কী হয়েছে?

দোহাই তোমার, ছেলেমানুষী কোর না। ওরা এসে পড়বে।

ভয়ের সঙ্গে অনুযোগ ঝরে পড়ল তাঁর কণ্ঠে। অবুঝ স্বামীকে যেন বোঝাতে চাইলেন তিনি।

স্ত্রীকে এবার সত্য সত্যই ছেড়ে দিলেন তিনি। হাসতে হাসতে বললেন, এত ভয় ?

কপট ক্রোধে স্ফুরিত হল সত্যবতীর অধর। অতীতের সেই ব্রীড়া নম্রা বধূটি যেন জেগে উঠল ক্ষণেকের জন্যে। স্বামীর প্রতি গভীর কটাক্ষ হেনে বললেন, নিজের কথাটা চিন্তা করে দেখ না একবার।

চিন্তা! সত্যবতী হয় তো এখনো ভাবে সে সব কথা। কত শত মধুর স্মৃতি! যৌবনের রঙ্গিন স্বপ্নের দিনগুলো তাঁরও মনে পড়ে। অতীত তো শেষ হয়ে যায় না। হারিয়ে গেলেও চিহ্ন রেখে যায়। তিনি কিন্তু ভাবতে চাইলেন না। বললেন, তুমি কিন্তু এখনো ঠিক তেমনি আছ।

কী? গলাটা কেঁপে উঠল তাঁর। অধরের ছোঁয়া লাগল মুখে।

বড় ভাল লাগে···

না না। যেন ভয় পেলেন সত্যবতী। প্রতিবাদ জানালেন।

হেসে উঠলেন তিনি।

কক্ষের বাইরে রাধার মায়ের গলা শোনা গেল। সে বললে, বউদিমণি, বাবা মশায়ের খাবার আয়োজন হয়ে গেছে।

দুই

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ যেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ। চিন্তাচ্ছন্ন তাঁর মুখমণ্ডল। অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। কখনো ক্ষণিকের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। আবার সুরু করেছেন পদচারণা।

অদূরে দণ্ডায়মান দরবেশ নূরকুৎব্ আলম অনেকক্ষণ নীরবে লক্ষ্য করছিলেন। এবার যেন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো তাঁর। অস্থির হলেন তিনি। গিয়াসুদ্দীনের প্রতি মনটা তাঁর ক্রমশই বিরূপ হয়ে উঠছিল। তিনি বিশ্বাস হারাচ্ছিলেন। দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছিল তাঁর মনে।

সামান্য ব্যাপার। এমনি তুচ্ছ যা নিয়ে কোন চিন্তা করাই উচিত নয়। যে কোন মুসলমান এই সামান্য ব্যাপারটা চোখ বুজেই সমাধা করতো। কিন্তু সুলতান যেন অন্য ধাতুতে গড়া। সেই জন্যেই তাঁর সুলতানের প্রতি কেমন যেন সন্দেহ হয়। হিন্দুরা যদি তাঁর এতই প্রিয়, যদি তাদের জন্যে প্রাণ কাঁদে, তাহলে মিথ্যা অভিনয় কেন ইসলামের সঙ্গে। নিজেকে তিনি একজন ইসলামের সেবক বলে পরিচয় দেন। ইসলামই তাঁর ধ্যান জ্ঞান। অথচ কাফের হিন্দুদের জন্যে সব সময় চিন্তা।

অসহ্য বোধ হয় নূরকুৎব্ আলমের। সুলতানের এই ভণ্ডামী টুকু সহ্য করতে পারেন না। তবু মুখ বুজে থাকতে বাধ্য হন। বাধ্য হন এইজন্যে, সুলতান দেশের অধীশ্বর। আর সামান্য একজন দরবেশ তিনি। সুলতান যদি সাহায্য না করেন, ইসলামের প্রচার তাঁর পক্ষে সাধ্য কী? সেইজন্যই গিয়াসুদ্দীনের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হয় তাঁকে।

অনেকটা কৃতকার্যও হয়েছেন। সুলতানের নীরব সমর্থণেই কাফেরগুলোকে মুসলমান বানাতে পারছেন। কিন্তু এত বিলম্ব তাঁর অসহ্য। তিনি চান শুধুমাত্র একটা দিন, কিংবা তারও কিছু কম সময়, হিন্দুর অস্তিত্বটুকু মুছে দিতে চান। হিন্দু নয়, মুসলমান। সুলতানের দুনিয়ায় হিন্দু থাকবে না। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সম্ভব হচ্ছে না সুলতানের জন্যই। হিন্দুর প্রতি যেন তাঁর বড় দুর্বলতা, বড় মমতা তাঁর প্রাণে।

গনেশ নারায়ণ। সুলতানের দোস্ত, নূরকুৎব্ আলমের দুষ্মন। ইসলামকে সে ঘৃণা করে, বাধা দেয় ইসলামের প্রচারে। গিয়াসুদ্দীন মেনে নেন তা। দোস্তের প্রতি বড় বিশ্বাস তাঁর। একদিন স্পষ্টই বলেছিলেন, আপনাকে আমার অনুরোধ ফকির সাহেব, দোস্তের বিরুদ্ধে আমাকে কিছু বলতে আসবেন না। খোদার চেয়েও তিনি মেহেরবান। তিনি আমার অনেক করেছেন। দোস্তের বুকে বেইমানের ছুরি চালাতে আমি পারবো না।

কথাটা মনে পড়তেই নূরকুৎব্ আলমের সর্বশরীর রাগে কেঁপে উঠল। বেইমান, কুত্তা। সুলতানের সে পেয়ারের দোস্ত হতে পারে, কিন্তু তাঁর দুষ্মন। দুষ্মনী করেছে সে মুসলমানের সঙ্গে। হিন্দুদের ভরসা হয়েছে। বাধা দিচ্ছে পদে পদে।

সব জেনে শুনেও সুলতান নীরব। যদিও আজ তাঁকে অনেকটা টলাতে পেরেছেন নূরকুৎব্ আলম। কাফেরগুলোকে মুসলমান বানালেও চুপ করে থাকেন। তবুও কোথায় যেন বাধা তাঁর। সেই বাধাটুকুই আজ অপসারিত করতে চান তিনি। যোগাযোগ করেছিলেন মুজাফফর শামন বাল্খির সঙ্গে। অনুরোধ জানিয়েছিলেন, এই দুর্দিনে তিনি যদি সাহায্য না করেন, ইসলাম বিপন্ন হবে। প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন দরবারের হিন্দু আমির ওমরাহদের অপসারিত করা। একমাত্র তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। সুলতান একমাত্র তাঁর কথাই শুনতে পারেন।

প্রসন্ন চিত্তে নূরকুৎব্ আলমের অনুরোধটুকু রক্ষা করেছেন বাল্খি। জানিয়েছেন, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ সুলতান হয়ে মসনদে বসবার ক'বছর পরেই ৮০০ হিজরায় (১৩৯৭খ্রীঃ) তিনি একখানি পত্র দিয়েছিলেন তাঁকে। জানিয়েছিলেন, কোন মুসলিম রাজ্যে বিধর্মী হিন্দুদের রাজ্যের কোন উচ্চপদে নিয়োগ করা উচিত নয়। কিন্তু সে উপদেশ তিনি সে সময় গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এমন যে হবে, তিনি সেদিনই অনুমান করতে পেরেছিলেন।

এবারও বাল্খির পত্র পেয়েছেন গিয়াসুদ্দীন। এবারও তিনি সেই একই অনুরোধ করেছেন সুলতানকে। মুসলিম রাজ্যে হিন্দুর কোন অধিকার নেই। দরবারে তাদের উচ্চপদ দেওয়া গুণাহের। সুলতান যদি তা না করে থাকেন, এখনই যেন অপসারিত করেন হিন্দুদের।

গিয়াসুদ্দীন তাই চিন্তিত। দরবেশ মুজাফফর শামন বাল্খিকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। সৌম্য শান্ত দরবেশের মুখের দিকে চাইলেই শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপনি নত হয়ে আসে মাথা। তিনিও যথেষ্ট স্নেহ করেন তাঁকে। তাঁর মঙ্গল কামনা করেন। তাঁর উপদেশে আজ তাই তিনি বিচলিত। সেই সঙ্গে কেমন যেন একটু সন্দেহ জেগেছে মনে। সন্দেহটা নূরকুৎব আলম সম্পর্কেই। হিন্দুদের প্রতি আজ তাঁর মনটা আর আগের মত প্রসন্ন নয়। হিন্দুরা আজ যেন অনেকখানি দূরে সরে গেছে তাঁর কাছ থেকে।

শুধু হিন্দু নয়, মুসলমানও। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিই আজ যেন তাঁর কোনরকম মোহ নেই। হিন্দুকে কলমা পড়াচ্ছে মোল্লার দল। কাঁদছে হিন্দু। চোরের মত আবার কেউ কেউ প্রতিবাদও জানাচ্ছেন। তিনি শুনছেন, কিন্তু প্রতিকার করছেন না। কী হবে প্রতিকার করে? কোন লাভ নেই। হিন্দু মুসলমান হ'ক, মুসলমান হিন্দু হ'ক, তাঁর তাতে কিছু যাবে আসবে না। তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকবেন।

না-না, তা নয়! কী যেন হয়েছে তাঁর। কী চেয়েছিলেন? কিছুই পেলেন না। সীমাহীন শূন্যতা—ওই আসমানের মত। তবু ওখানে সূর্য চাঁদ তারা আছে। কত শত গ্রহ নক্ষত্র। তাঁর কিছুই নেই। মনটা শূন্য ধূ-ধূ, যেন রিক্ত নিঃস্ব মরুভূমি। মিথ্যা যেন মাঝে মাঝে চেপে ধরে কণ্ঠনালী। কষ্ট বোধ হয় তাঁর। যন্ত্রণায় ছটফট করেন। অথচ সেই যন্ত্রণাটুকু একান্ত নিজের। বাইরে প্রকাশ পায় না, কেউ বুঝতেও পারে না।

একটা মিথ্যা অন্যায়ের বোঝা তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন। অন্যায় তাঁর অতীত। সেদিন বুঝতে পারেন নি, আজ সবকিছুই স্পষ্ট। অন্যায় করেছেন তিনি। দাসত্ব করেছেন শয়তানের। সকলে তাঁকে সাধু ভাবে। কোন গুণাহ্ নেই জিন্দেগীটায়। কিন্তু লোভ তাঁকে পাগল করেছিল। সুলতান সিকন্দর শাহকে খতম করেছেন তিনি। আব্বাজানের বুকে ছুরি চালিয়েছিলেন। অথচ ধোকা দিয়েছিলেন, বাধ্য হয়েছেন বিদ্রোহী হতে।

ভুল, সব ভুল, মিথ্যা। কিছুই সত্য নয়। শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন সেদিন লোভী হয়ে উঠেছিল মসনদটার জন্যে। মসনদ পেয়ে সব হারাল।

নূরকুৎব্ আলম মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, জাহাঁপনা!

গিয়াসুদ্দীন তাঁর মুখের দিকে চাইলেন। তাঁকে দেখলেন। তিনিই ওঁকে একলা পাঠিয়ে ডেকে এনেছেন। কেন ডেকেছিলেন? উনি আসবার পর তাই বিস্মিত হয়েছিলেন। অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। বসতেও বলেন নি।

এখন বললেন, আপনি বসুন ফকির সাহেব।

লেকিন, জাহাঁপনা, আমার নামাজের সময় হয়ে গেছে।

নামাজ! চিন্তা করলেন তিনি। সত্যই তাই। বিকালের আলো অনেকক্ষণ আগে শেষ হয়েছে। সন্ধ্যা নামছে। আকাশের

বুকে একটি ছুটি করে ফুটে উঠছে তারাগুলো। মগরিবের নামাজ এবার সুরু হবে।

তিনি বললেন, লেকিন, আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

খুব জরুরী ?

হ্যাঁ, ফকির সাহেব।

তাহলে বলুন ?

গিয়াসুদ্দীন বললেন, আসুন না, এক কাজ করি আমরা। মেহেরবান খোদার কাছে আমরা আমাদের প্রার্থনা জানিয়ে তারপর কথা বলি ?

রাজি হলেন নূরকুৎব্ আলম। একটু পরেই তাঁরা খোদাতালার কাছে তাঁদের প্রার্থনা জানালেন। একজন ফকির, আর একজন সুলতান, নামাজ পড়লেন এক সঙ্গে।

গিয়াসুদ্দীন আবার কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। নূর কুৎব্ আলমের কথা যেন ভুলে গেলেন তিনি। অন্ধকার আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

সুলতানের এই ভাবান্তরটুকু লক্ষ্য করলেন নূরকুৎব্ আলম। ভাল লাগল না তাঁর। এক সময় মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, জাহাঁপনা ?

গিয়াসুদ্দীন ফিরলেন তাঁর দিকে। একটু যেন হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। সামনে আসন গ্রহণ করে বললেন, আমি আপনার কথাই চিন্তা করছিলাম ফকির সাহেব !

আমার কথা ? আশ্চর্য হলেন তিনি।

হ্যাঁ। হাসলেন গিয়াসুদ্দীন। বললেন, আপনাদের ইচ্ছামতই আমি এবার চলবো। লেকিন…

কী ?

সেই সঙ্গে আরো একটা কথা চিন্তা করতে হচ্ছে আমাকে। একটু চুপ করলেন তিনি। কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর তাঁর

মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্ট ভাবে জানতে চাইলেন, পরিণতির কথাটা কী চিন্তা করেছেন?

পরিণতি?

হ্যাঁ, ফকির সাহেব। আদি অন্ত, সুরু শেষ এতো মিথ্যা নয়। এর শেষ পরিণতি যে কী হবে, আমি তা চিন্তা করতে পারছি না। আমি ভাবছি···

তিনি চুপ করে গেলেন। চোখ বুজলেন। কেমন যেন ক্লান্ত মনে হল তাঁকে। সেটুকু লক্ষ্য করে নূরকুৎব্ আলম বললেন, আপনার দোস্তের অন্যায় তো কিছু কম নয় জাহাঁপনা?

গুণাহ?

হ্যাঁ, জাহাঁপনা। দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন তিনি। বললেন, মুসলিম রাজ্যে হিন্দুদের সে সঙ্ঘবদ্ধ করতে চায়। হয়তো···

না-না। যেন বাধা দিলেন গিয়াসুদ্দীন।

এতক্ষণে হাসি ফুটলো নূরকুৎব্ আলমের মুখে। বললেন, বখ্‌তিয়ার খিলজীর পর দুশো বছর পার হয়েছে। কোন হিন্দুর এতখানি সাহস হয়নি, মুসলমানের কোন কাজে বাধা দেয়। আপনার প্রশ্রয় পেয়েই তারা আজ এমন দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। তারা ··

জান নয় ফকির সাহেব, মান যে তাদের অনেক বড়।

লেকিন···

ভুলে যাচ্ছেন কেন দেশটা হিন্দুর। ধর্মের জন্যে দেশটায় অনেক রক্তপাত হয়েছে।

সেটুকু বন্ধ করতে পারেন একমাত্র আপনিই।

কেমন করে?

সব ক্ষমতাই তো আপনার হাতে! আপনি ইচ্ছা করলে কী না পারেন?

হয়তো অনেক কিছুই পারি না।

লেকিন, আমরা চেয়ে আছি আপনার দিকে। আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। পারলে একমাত্র আপনিই পারেন।

তামাম বাংলার মানুষগুলোকে মুসলমান বানাতে···

আপনিই পারেন।

যদি কেউ ধর্ম ত্যাগ করতে না চায়? যদি ধর্ম ত্যাগ করার ভয়ে মরে? তখন কী হবে ফকির সাহেব?

ক'জন মরবে জাহাঁপনা? হাসলেন নূরকুৎব্ আলম। বললেন, কিছু যদি মরে, ক্ষতি কী? যারা বাঁচবে, তাদের সংখ্যাও তো কম নয়।

লেকিন, আমি যে চাই একজনও মরবে না। গিয়াসুদ্দীনের কণ্ঠটা কেমন যেন অসহায় শোনাল। আমি যে জীবন কামনা করি। মৃত্যুকে আমার বড় ভয়। আমি যেমন নিজে বাঁচতে চাই, তেমনি অন্যের দীর্ঘ জীবনও কামনা করি।

আদমী তো অমর নয়?

তা নয়। খুব সত্যি কথা। নিজের মাথা নাড়লেন তিনি। হঠাৎ কী যেন তাঁর মনে পড়ে গেল। বললেন, লেকিন, ফকির সাহেব, আপনারা হিন্দুদের ধরে ধরে কলমা পড়াবার সময় যদি তারা আঘাত হানে? যদি তারা মেরে মরতে চায়?

নূরকুৎব্ আলম সুলতানের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। গিয়াসুদ্দীনকে কেমন যেন তাঁর অস্বাভাবিক বলে বোধ হল। শুধু গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ নন, সিকন্দর শাহকেও তিনি দেখেছেন। শুনেছেন শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের কথা। ইলিয়াস শাহ বংশের এই তিন সুলতান। এই তিন জন সুলতানই হিন্দুদের প্রতি কেমন যেন পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তার আগে সুলতান ছিলেন ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ, তারও আগে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ। যাঁর নামানুসারে পাণ্ডুয়ার নতুন নামকরণ হয়েছিল ফিরোজাবাদ। আরো অনেক মুসলমান সুলতান বাংলাদেশ শাসন করেছেন।

হিন্দুর উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক কর হিসাবে আদায় করেছেন ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ। কেড়ে নিয়েছেন হিন্দুর অধিকার। হিন্দু জিম্মি, হিন্দু কাফের। কাফের কখনো একজন অতি দীন দরিদ্র মুসলমানেরও সমান অধিকার পেতে পারে না। মুসলিম রাজ্যে হিন্দু থাকবে মাথা নত করে। কিন্তু ইলিয়াস শাহী বংশের তিন সুলতান হিন্দুর নত মাথাকে তুলে ধরেছেন। হিন্দুকে দিয়েছেন সমান অধিকার। তাই হিন্দু আজ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পেরেছে। হিন্দুর উঁচু মাথাকে নত করে দিতে আজ ভয় পাচ্ছেন তাই গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। হিন্দু যদি মাথা তোলে, আঘাত হানে?

আঘাত হানতে না পারেন সেই ব্যবস্থাই করতে চান নূরকুৎব্ আলম। তিনি চান হিন্দুত্বের শেষ। মুসলিম রাজ্যে একমাত্র অধিকার মুসলমানের। হিন্দুর কোন অধিকার নেই। হিন্দু শেষ হয়ে যাক। তিনি শেষ করতে চান গণেশকে। হিন্দুর বড় বেশী ভরসা সে। বাধা দেয় মুসলমানের কাজে। চোখ রাঙায় মুসলমানদের।

অসহ্য! নূরকুৎব্ আলমের অসহ্য বোধ হয়। কাফের হিন্দুটার ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। বাধ্য হন শুধুমাত্র সুলতানের জন্যে। দোস্ত—উপকারী বন্ধু। সুলতান তাই দুর্বল। সহ্য করেন বেয়াদপি।

গিয়াসুদ্দীন ডাকলেন, ফকির সাহেব!

নূরকুৎব্ আলম সুলতানের মুখের দিকে চাইলেন।

গিয়াসুদ্দীন বললেন, হিন্দুদের আমিও খতম করতে চাই ফকির সাহেব।

জাহাঁপনা!

লেকিন, ওরা যদি শেষ না হয়?

হবে জাহাঁপনা।

পারবেন?

আমাকে পারতেই হবে।

বেশ। একটু চুপ করে রইলেন গিয়াসুদ্দীন। বললেন, আপনি এখন আসুন।

বিদায় নিলেন নূরকুৎব্ আলম। গিয়াসুদ্দিন এখন একা। নীরবে বসে রইলেন তিনি। বসে বসে চিন্তা করলেন। দীর্ঘ কুড়ি বছরের রাজত্বকালে এই যেন তাঁর চিন্তার সুরু। চিন্তার সমুদ্রে ডুবছিলেন তিনি।

আর নূরকুৎব্ আলম?

শাহজাদা সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি। যদিও তিনি জানতেন, এ সময় হয়তো শাহজাদাকে তিনি পাবেন না। যদিও বা পান, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় পাবেন না নিশ্চয়ই। কারণ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাবার সঙ্গে সঙ্গে সরাবের নেশায় মাতাল হয়ে ওঠেন সৈফুদ্দীন। তাকে তখন মানুষ বলে মনে হয় না।

সত্যই তাই। সৈফুদ্দীনের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। কিন্তু তখন সে নেশায় অচেতন। তবু সেই অবস্থাতেই তাঁকে ডেকে পাঠালে সে। বললে, আসুন, ফকির সাহেব। বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্যে।

শাহজাদার কথাটা শোনামাত্র ঘৃণায় রি-রি করে উঠল তার সর্বশরীর। কক্ষের চতুর্দিকে চেয়ে যা দেখলেন, তাতে তাঁর এক মুহূর্তও সেখানে থাকতে ইচ্ছা করল না। তিনি চলে আসতেও পারলেন না।

বাঁদীকে ডাকল সৈফুদ্দীন। বলল, সরবৎ লেয়াও।

সরবৎ কী হবে শাহজাদা? এতক্ষণে কথা বললেন তিনি।

আপনি খাবেন। বাঁদীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাড়া দিল শাহজাদা, এ্যাই, তুম খাড়া কিঁউ। আর শুনো, মিঠাই ভি লে আনা।

না-না। বাধা দিতে চাইলেন তিনি।

আদেশ পেয়ে বাঁদী তখন চলে গেছে। হাসল সৈফুদ্দীন। বলল, তা কি হয় ফকির সাহেব। মেহেরবানী করে এই প্রথম এলেন আপনি। আপনাকে কী এমনি ছেড়ে দিতে পারি? যদি সরাব খেতেন তো বহুৎ আচ্ছা, আর···

কী যেন ইসারা করল সে। একটু পরেই অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। তিন চারটি অর্দ্ধনগ্ন নারী মূর্তি। নিঃসঙ্কোচে শাহজাদার গা ঘেঁসে বসে পড়ল তারা। ওদের একহাতে জড়িয়ে ধরল সৈফুদ্দীন। বলল, এরা সব আমার পেয়ারের বুলবুল। আমার জান।

নূরকুৎব্ আলমের দুই চোখ বিস্ফারিত হলো। নারীর এ নগ্ন মূর্তি দেখতে অভ্যস্থ নন তিনি। ঘৃণায় তাঁর মনটা ভরে গেল। আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, আমি চলি শাহজাদা।

সে কি! টলতে টলতে উঠে এসে হাত ধরলো সৈফুদ্দীন। বলল, এই এলেন, এখুনি চলে যাবেন, তা কি হয়? বসুন, আরাম করুন। কেন এলেন বলুন—তবে তো যাবেন?

শাহজাদার হাত থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিলেন নূরকুৎব্ আলম। বললেন, আমি চলি।

যাবেন?

হ্যাঁ শাহজাদা।

সরাব না খান, না খেলেন, একটু সরবৎ তো খেতে পারেন?

না। এবার যেন ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গলো তাঁর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, আপনার এখানে কিছু খাওয়ার মত প্রবৃত্তি আমার নেই, কোন দিন হবেও না।

বটে!

আমি চলি। এগিয়ে গেলেন তিনি।

শাহজাদা সৈফুদ্দীনের কণ্ঠে যেন এবার ভিন্ন স্বর। ডাকলেন, শুনুন, ফকির সাহেব।

নূরকুৎব্ আলম দাঁড়িয়ে পড়লেন। চাইলেন সৈফুদ্দীনের মুখের দিকে।

সৈফুদ্দীন বলল, আপনি বড় ভুল করছেন ফকির সাহেব। আপনি হয়তো জানেন না, এখানে যত সহজে প্রবেশ করা যায়, ঠিক ততো সহজে বেরুনো যায় না।

শাহজাদা!

ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন। আমি হয়তো মিথ্যা বলবো, লেকিন, ওরা বলবে না। কথাটা বলে শাহজাদা সৈফুদ্দীন টলতে টলতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নূরকুৎব্ আলম। এক মুহূর্তে তাঁর সব কিছু আশা ভরসা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কী করবেন, কিছুই স্থির করে উঠতে পারলেন না তিনি।

অদূরে দাঁড়িয়ে আছে কটি অর্দ্ধনগ্ন নারী দেহ। যাদের নিয়ে কিছুক্ষণ আগে হয়তো শাহজাদা সৈফুদ্দীন নারকীয় মত্ততায় মেতে উঠেছিল। সুরা আর যৌবন। এ ছাড়া আর হয়ত কিছু জানে না মানুষটা। তিনি শুনেছেন, দিন রাতের অনেকটা সময় নেশায় নিজেকে অচেতন করে রাখে শাহজাদা।

সৈফুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করতে এলে খোজা-বান্দাটা জানিয়ে ছিল, মালিক এখন ব্যস্ত আছেন জনাব।

লেকিন, তাঁর সঙ্গে আমার জরুরী প্রয়োজন। বলেছিলেন তিনি। গিয়ে বল, ফকির সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। বহুৎ জরুরী বাৎ হ্যায়।

সত্যই জরুরী কথা ছিল তাঁর। সুলতানের ওপর ভরসা হারিয়েছেন তিনি। তাঁকে বিশ্বাস করা মোটেই উচিত নয় আর। নতুন শক্তির প্রয়োজন। শাহজাদা সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের কথাটা

তাই মনে পড়েছিল। একটা উচ্ছৃঙ্খল মানুষ। সরাব আর জানানা। আর কিছু চায় না, জানেও না।

পথ দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। আলো। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে আর প্রয়োজন নেই। দরকার সৈফুদ্দীন হম্জা শাহকে। ইসলামকে রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারবে ওই সরাবী মানুষটাই। কিন্তু এমন যে হবে, তিনি তা কল্পনাও করতে পারেন নি।

অর্ধনগ্ন নারী মূর্তি কটির দিকে তাকালেন তিনি। ওদের সঙ্গে কথাও বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কারা?

ওরা চুপ করে রইলো। কী বলবে? ওরা যে নিজেরা কী, তা ওরা জানে না। জানবার প্রয়োজনও কোন দিন বোধ করে নি। যেদিন প্রথম ভাই বন্ধু, মা বাপ, আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে হারেমের এই নরককুণ্ডে এসে পড়েছে, সেদিন থেকে সব ভুলে গেছে। ভোলার চেষ্টা করেছে। না ভুলতে পারাটাই তো যন্ত্রণার। সেই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি চেয়েছে ওরা, কিন্তু এই নরককুণ্ড থেকে বাইরে যাওয়ার কথা একটি দিনও চিন্তা করে নি। যাবে কোথায়? এই জীবন থেকে মুক্তির পর কোথাও কী একটু জায়গা মিলবে? মিলবে না। খোদাতালার ছুনিয়ায় ওদের জন্যে এতটুকু স্থান নেই। কারণ, সর্বশক্তিমান হয়েও এক জায়গায় তিনি বড় অসহায়। তার নাম সমাজ। হিন্দু মুসলমানের সমাজে কোন ফারাক নেই। হতভাগিনীদের আবার ঘরে ফিরিয়ে নেবে এমন সাহস কার আছে? কেউ নেই। ওদের জন্যে কেউ নেই। ওরা তাই এই জীবনটাকে মেনে নিয়েছে। মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। দিনের পর দিন, জীবন যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েও সুলতান, শাহজাদা, আমির, ওমরাহদের শয্যাসঙ্গিনী, তাঁদের বিকৃত কামনাকে চরিতার্থ করতে এতটুকু আপত্তি করেনি। দোষ দেয়নি কারো। কারণ ওরা জানে, কারো প্রতি দোষারোপ করলে কোন ফায়দা হবে না। এক সুলতান

যাবেন। মসনদ যেমন তাঁর অধিকারে যাবে, ওরাও তেমনি। ওদের জীবনের পরিবর্তন নেই। নেই মুক্তি। তাই ওরা মিথ্যা মুক্তি কামনা করে না। ওরা জানে, এখানে একবার প্রবেশ করলে জিন্দেগীর শেষ দিনটা না আসা পর্যন্ত বাইরে যেতে পারবে না।

নূরকুৎব্ আলম ওদের দেখছেন। ওরাও দেখছে তাঁকে। তিনি ভাবছেন নিজের মুক্তির কথা, সেই সঙ্গে হারেমের কথাও। এতদিন অনেক কথাই শুনেছেন। আজ দেখলেন তা কত সত্যি। ওরা ভাবছে, এই বুড়ো ফকিরটা আবার এখানে কেন?

ঠিক এমনি সময় সেই খোজা-বান্দাটা এগিয়ে এল। বলল, আইয়ে ফকির সাহেব।

নূরকুৎব্ আলম তার মুখের দিকে চাইলেন একবার।

সে বলল, আসুন।

তিনি জানতে চাইলেন, কোথায়?

হাসল সে। বলল, আইয়ে না।

তিনি তাঁর সঙ্গে চললেন। যদিও বুকটা কাঁপছিল তাঁর। ভয় পাচ্ছিলেন। চিন্তা করে উঠতে পারছিলেন না কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁকে। কোন্ অন্ধকার কক্ষে? যেখান থেকে জীবনে আর কোন দিন মুক্তি পাবেন না? তাঁর অপরাধের বিচার কী স্বরু হল। খোদা কী···

ভাবতে পারলেন না তিনি। সর্বশরীর তার শিউরে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। ভয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

খোজাটা জিজ্ঞাসা করল, কী হল ফকির সাহেব? দাঁড়ালেন কেন?

নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। বললেন, চল।

খোদা আমি তো তোমার কাছে কোন অপরাধ করিনি। আমি তো জিন্দেগী ভর তোমার সেবা করেছি। আমি তোমার একজন অতি দীন খিদ্‌মদ্‌গার। আমি চেয়েছি তোমার প্রচার। আদমী

যাতে তোমাকে চিনতে পারে, তোমার মেহেরবানী থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই চেষ্টা আমি করছি। কিন্তু আজ এ তুমি কি করলে খোদা, এ কি কঠিন পরীক্ষায় তুমি আমাকে ফেললে? তোমার মেহেরবানী থেকে বঞ্চিত করতে চাও আমাকে? মেহেরবান খোদা, তুমি আমাকে দোয়া কর, দোয়া কর খোদা।

খোজাটা বলল, আমরা এসে গেছি ফকির সাহাব।

এসে গেছি! চমকে উঠলেন নূরকুৎব্ আলম। এতো অন্ধকার কোন কক্ষ নয়? ঐ তো শাহজাদা সৈফুদ্দীন বসে রয়েছে। তবে?

নূরকুৎব্ আলমকে দেখে হাসি মুখে উঠে এল সৈফুদ্দীন। তাঁর হাত ধরলো। অপরাধী কণ্ঠে বলল, আমার গোস্তাগী ক্ষমা করবেন ফকির সাহাব।

তিনি কী জেগে আছেন, না স্বপ্ন দেখছেন?

শাহজাদা বলল, আমি সরাব খাই ফকির সাহাব। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাবার পর আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। দিনের আলোয় 'আমি'র পরিবর্তন ঘটে তখন। একটা মানুষ সমস্ত দিন ছটফট করে। কামনার আগুনে দগ্ধে মরে। রাতের জন্যে অপেক্ষা করে সে। সে সময়…

বাধা দিলেন তিনি। বললেন, আমি জানতাম না শাহজাদা।

জানতেন না বলেই আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইনি। বান্দাটা কিছু বলেনি আপনাকে?

বলেছিল।

তবু আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন?

হ্যাঁ। কারণ…

আমি জানি।

কী? ভীষণ ভাবে চমকে উঠলেন তিনি। শাহজাদার মুখের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাইলেন।

হাসল সৈফুদ্দীন। বলল, আমি সরাব খেয়েছি সত্যি ফকির

সাহাব, লেকিন, মাতাল হইনি। আমি জানি, কেন আপনি আমার কাছে এসেছেন। বলুন, কী চান?

কী চাই? আবার চমকে উঠলেন তিনি।

কথাগুলো যেন নিজের মনেই বলল সৈফুদ্দীন। বলল, সুলতানের, আমার আব্বাজান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের হিন্দু মুসলমান উভয়ের প্রতি উদার নীতি আমিও সমর্থন করি না। আমি জানি, হিন্দু-হিন্দু, মুসলমান-মুসলমান। মুসলিম রাজ্যে হিন্দু মুসলমান সমান অধিকারে অধিকারী হতে পারে না। স্বার্থের জন্যে, প্রয়োজনে, হিন্দুকে ভাই বলে বুকে টানবো। লেকিন, প্রয়োজন ফুরোলে দুষমন বলে বুকে ছুরি চালাতে দ্বিধা করবো না। তাইতো ফকির সাহাব?

নূরকুৎব্ আলম কী বলবেন! তিনি তো এই চান।

সৈফুদ্দীন বলল, মামুদ শাহ দেশটা লুঠতে এসেছিল, কিন্তু বখ্‌তিয়ার খিলজি শুধু লুঠতে আসেনি। শুধু লুঠলে এ দেশটার সম্পদ কোনদিনই শেষ হবে না। দেশটাকে নিজেদের করে নিতে হবে, আর সে দায়িত্ব আপনাদের। হিন্দুগুলোকে মুসলমান বানানো মোল্লা, ফকিরদের কাজ।

আমি তো তাই চাই শাহজাদা।

লেকিন, পারছেন না। হাসল সৈফুদ্দীন, বলল, সুলতান যদি সাহায্য না করেন, তাহলে কোনদিন তা সম্ভবও নয়।

হ্যাঁ শাহজাদা।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ হয়তো তাঁর দরবার থেকে হিন্দুগুলোকে আপনাদের কথামতো হটিয়ে দেবেন, লেকিন, হিন্দুদের ধরে ধরে মুসলমান বানাবার অধিকার তিনি আপনাদের দেবেন না। কারণ, তিনি এখনো বিশ্বাস করেন, দেশটার সুলতান মুসলমান হলেও, দেশটা হিন্দুদের। একদিন ছিল, আজও আছে।

নূরকুৎব আলম এবার আর কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন তিনি।

হাসল সৈফুদ্দীন। বলল, কী হল ফকির সাহাব, চুপ করে রইলেন কেন ?

এঁ্যা! তিনি চমকে উঠলেন যেন। ভেবে পেলেন না কী উত্তর দেবেন। কী বলা উচিত তাঁর। কী বললে শাহজাদা খুশি হবেন। কারণ শাহজাদা সম্পর্কে কিছুক্ষণ আগের ধারণাটার তাঁর পরিবর্তন হয়নি। মানুষটাকে এখনও তিনি নেশাগ্রস্থ ভাবছেন। মনে হচ্ছে, এ তার প্রলাপ।

সৈফুদ্দীন অনেকক্ষণ নীরবে লক্ষ্য করল তাঁকে। হাসল। বলল, কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয় ফকির সাহাব।

কী ? চমকে উঠলেন নূরকুৎব্ আলম।

সেটুকু লক্ষ্য করল সৈফুদ্দীন। বলল, আব্বাজানের চিন্তাটা…

আপনি…। কী যেন বলতে গেলেন তিনি।

কথাটা শেষ করতে পারলেন না। বাধা দিল সৈফুদ্দীন। বলল, আমিও তা বিশ্বাস করি। সত্যিই দেশটা হিন্দুদের। একদিন ছিল, আজও আছে।

কিন্তু…

অস্বীকার করতে গেলেও পারবেন না। কারণ আজ দুশো বছর মুসলমান সুলতান দেশটা শাসন করছেন। লেকিন, এখনো মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা বহুগুণে বেশি। আপনি যা চান তা হয়তো সম্ভব নয় কোনদিন। লেকিন, আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

হ্যাঁ, শাহজাদা! কোন রকমে কথাটা উচ্চারণ করলেন তিনি।

লেকিন, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

কেন নয় ?

আমি শাহজাদা। কতটুকু ক্ষমতা আমার ? একটুও না। আমি

শুধু দিনরাত সরাব খেতে পারি, জেনানা নিয়ে ইচ্ছামত ফুর্তি করতে পারি। তার বেশি কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

যদি সম্ভব হয়?

কী করে?

হাসলেন নূরকুৎব্ আলম। বললেন, মেহেরবান খোদার দুনিয়ায় কিছুই অসম্ভব নয় শাহজাদা।

মেহেরবান খোদা! হাসল সৈফুদ্দীন। বলল, আমি একটা সরাবী মানুষ ফকির সাহাব। জিন্দেগীটায় গুণাহের শেষ নেই আমার। আপনি দরবেশ। খোদার পীর আপনি। গোস্তাগী নেবেন না। একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমি পাপী হয়েও জানি, বিশ্বাস করি, খোদা সত্যই মেহেরবান। তাঁর দোয়ার শেষ নেই। লেকিন, আপনাকে অনুরোধ, তাঁকে আপনি যেখানে সেখানে নামিয়ে আনবেন না।

শাহজাদা! নূরকুৎব্ আলমের কণ্ঠটা কেঁপে উঠল।

সৈফুদ্দীন বলল, খোদা সত্যই মেহেরবান ফকির সাহাব।

তিন

রাজেশ্বরীর কক্ষে তখন অদ্ভুত এক বিচার সভা বসেছে। বাদি প্রতিবাদি দু'পক্ষই উপস্থিত। দুজনেরই সমান অভিযোগ। রাজেশ্বরী তাই চিন্তিতা। তিনি যে কার পক্ষে রায় দেবেন, স্থির করে উঠতে পারছেন না।

অবশ্য এমন সমস্যার সম্মুখীন তাঁকে মধ্যে মধ্যেই হতে হয়। বিচারকের আসনে বসে বিচার করতে তাঁর খারাপ লাগে না। এইটুকু নিয়েই তিনি শেষ জীবনটায় একরকম ভুলে আছেন। বিচার করেন, রায় দেন। তবে প্রতিবারেই তাঁকে অনেক চিন্তার পর দোষী-নির্দোষীর মুক্তি বা শাস্তির কথা ঘোষণা করেন, এবং এমন ভাবে তা করেন, যাতে উভয় পক্ষই খুশি হয়। তারা মেনে নেয় তাঁর বিচার।

কিন্তু আজ তা সম্ভব নয়। তিনিও বুঝতে পারলেন সে কথা। আজকের অভিযোগ গুরুতর। এমন কী রক্তপাত পর্যন্ত ঘটেছে। মৃণ্ময়ীর কপাল কেটে ফালা। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফুলিয়ে ফেলেছে বেচারী।

অথচ কারণটা সামান্য। কাঁচা আম নিয়ে আজকে ঘটনার সূত্রপাত। সেই থেকে রক্তপাত পর্যন্ত ঘটেছে। অতএব তিনি বুঝতে পারলেন আজ অনেক সাবধানে তাঁকে এগুতে হবে।

আহার শেষ করে সবেমাত্র শয্যা গ্রহণ করেছেন তিনি। দুপুরে একটু না শুলে তাঁর চলে না। পাশে বসেছিল চিণ্ময়ী। ওকে বলেছিলেন, তুই এখন যা ভাই। গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নে।

না দিদা, আমি আপনার কাছে একটু বসি। বলেছিল চিণ্ময়ী।

প্রজারা ছিল তাঁর প্রাণ। তাদের জন্যে কি না করেছেন তিনি। তবু···

দীর্ঘশ্বাস পড়তো রাজেশ্বরীর। অতীত তাঁকে ব্যথা দিত। বলতেন, অবশ্য পরে সেটুকু বুঝেছিল তারা।

রাজেশ্বরীর হঠাৎ যেন খেয়াল হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, হ্যাঁ দিদি ভাই, সেই দস্যি মেয়েটা কোথায় বলতো ?

সত্যিই জানতো না চিণ্ময়ী। বলেছিল, জানি না তো ?

জানিস না কী রে ? রাজেশ্বরী যেন তীরস্কার করেছিলেন তাকে। বলেছিলেন, দুপুরের রোদে মেয়েটা কোথায় গেল দেখবি তো ?

আমার কথা শুনলে তো ? বলেছিল চিণ্ময়ী।

সত্যই মৃণ্ময়ী কথা শোনে না। কিছুতেই বুঝতে চায় না, এ গৃহ তার পিতৃগৃহ নয়। মৃদু তর্কও করে। অনেকবার ওকে বুঝিয়েছে চিণ্ময়ী, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। তাছাড়া ওর এই দুরন্তপনাও যেন সমর্থন করেন সকলে। হাসেন। বড় লজ্জা করে তার। কিন্তু অবুঝ মেয়েটা কিছুতেই বোঝে না।

রাজেশ্বরী বলেছিলেন, তোর কিছু বলা মানে তো শাসন করা ?

চিণ্ময়ী বলেছিল, ও যে বড় অবাধ্য হয়ে উঠেছে। দেখুন গিয়ে, এই দুপুর রোদ্দুরে বাগানে আম গাছে কী পেয়ারা গাছে উঠে বসে আছে হয়তো।

এঁ্যা! চমকে উঠেছিলেন রাজেশ্বরী। কৃত্রিম বিস্ময়ে বলেছিলেন, তুই বলিস কী ভাই, তোর বোনটির এত গুণ। বউ মানুষ, সত্যি সত্যিই গাছে চড়ে নাকি ?

চিণ্ময়ী চুপ করেছিল। কথাটা তার বলার ইচ্ছা ছিল না। নেহাৎ ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছে। প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বাইরের কোন মানুষের দৃষ্টি পড়ে না এখানে।

কিন্তু স্বামী একদিন এসে বলেছিল, আজ একটা জিনিষ দেখলাম চিন্ময়ী!

কী জিনিষ গো? গভীর আগ্রহ নিয়ে জানতে চেয়েছিল সে।

স্বামী হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বউমার গাছে চড়া।

ছিঃ ছিঃ, লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছিল তার। অনেক দিন যাবৎ এমন একটা কিছু ঘটবে আশঙ্কা করেছিল সে। লজ্জায় মাথা তুলতে পারে নি।

স্বামী কিন্তু রাগ করেন নি। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, এভাবে দুরন্তপনা করতে নিষেধ কোর। কোন্ দিন হয়তো অঘটন ঘটিয়ে বসবে।

সেদিনই কথাটা বোনকে বলেছিল চিন্ময়ী। বলেছিল, এ তুই কী করছিস বলতো মৃণ্ময়ী। আজ উনি তোকে গাছে চড়তে দেখেছেন।

ইস্। লজ্জায় জিভ কেটে ছিল মৃণ্ময়ী। তাড়াতাড়ি অনভ্যস্ত হাতে মাথায় কাপড় তুলে দিয়েছিল। তারপর একটু চিন্তা করে বলেছিল, উনি তো আমার ভগ্নিপতি হন। দেখুন গে।

এই মেয়ে। ওকে নিয়ে লজ্জার এক শেষ। কী যে করবে মাঝে মাঝে স্থির করে উঠতে পারে না চিন্ময়ী। কাঁদতে ইচ্ছা করে তাঁর।

রাজেশ্বরী হেসে ছিলেন। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন, তোর লজ্জা পাবার কিছু নেই দিদিভাই। আমরা সবাই জানি, ও কী করে না করে।

মা?

বউমাও জানে। হেসেছিলেন রাজেশ্বরী। তোদের শাশুড়ী ঠাকরুণও তো কিছু কম করে নি। আমার খারাপ লাগতো। তিনি বলতেন, বধূকে শুধুমাত্র বধূরূপে দেখলে চলবে না রাজেশ্বরী। ও আমাদের কন্যা স্থানীয়া। জ্ঞান বুদ্ধি হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর যায়ও।

চিণ্ময়ী চুপ করে ছিল।

রাজেশ্বরী বলেছিলেন, তোর দেবর রত্নটি কোথায় দিদিভাই ?

কী জানি।

দুটোকেই পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে ? মনে মনে কী যেন আশঙ্কা করেছিলেন তিনি। আর তিনি যা আশঙ্কা করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হতে খুব বেশি বিলম্ব হল না। খানিক পরেই রক্তাক্ত কপাল নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হল মৃণ্ময়ী।

ব্যস্ত হয়েছিলেন রাজেশ্বরী। ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী হল দিদি, কপাল কাটলি কী করে ? কোথায় পড়ে গেলি ভাই ?

মৃণ্ময়ীর চাপা কান্নাটা রাজেশ্বরীর সমবেদনার সুরে বেড়ে গিয়েছিল। কাঁদতে কাঁদতেই জানিয়েছিল, মহেন্দ্র তাকে ফেলে দিয়েছে।

ফেলে দিয়েছে ? চোখ কপালে তুলেছিলেন রাজেশ্বরী। ঘরের বউকে ফেলে দিয়ে কপাল কেটে দিয়েছে ? গেল কোথায় সে ? আজ আসুক একবার। চিণ্ময়ীকে বলেছিলেন, তুই দাঁড়িয়ে দেখছিস কী পোড়ারমুখী ? মেয়েটার মাথাটা ফেটে যে চৌচির হয়ে গেছে। দেখছিস না, রক্তের সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে। কপালটা বেঁধে দে কিছু দিয়ে।

চিণ্ময়ীর হাসিও পাচ্ছিল, রাগও হচ্ছিল। রাগ হচ্ছিল বোনের নিত্য দিনের একটা না একটা অঘটন ঘটাবার জন্যে। তারও বিয়ে হয়েছিল মৃণ্ময়ীর মত বয়সেই, কিন্তু এমন কাণ্ড কোনদিনই ঘটায় নি। মৃণ্ময়ী যা করে তার কোনটাই চিন্তা করতে পারে নি কোনদিন। বরং সব সময় তাঁর এক রকম ভয়ে ভয়ে কেটেছে। প্রতিটি কাজই সাবধানে করেছে।

কিন্তু মৃণ্ময়ী তার ঠিক উল্টো। কিছু বলারও উপায় নেই বোনকে। তাহলেই শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী পর্যন্ত বলবেন, আহা,

ওকে কিছু বোল না। রাজেশ্বরীর তো কথাই নেই। ওর সব কাজে তাঁর সমর্থন। সেইজন্যেই হাসি পাচ্ছিল। যত জ্বালা যেন তার।

বোনের কপালটা ধুয়ে ঔষধ লাগিয়ে দিয়েছিল চিণ্ময়ী। ততোক্ষণে রাধার মাকে ডেকে মহেন্দ্রকে ডাকতে পাঠিয়েছেন রাজেশ্বরী। এবার তাঁর বিচার সভা সুরু হবে। দোষী নির্দোষীর বিচার করবেন তিনি। জানে সবাই। চিণ্ময়ী তাই চলে আসছিল।

রাজেশ্বরী বলেছিলেন, চললি কোথায় দিদিভাই ?

চিণ্ময়ী বলেছিল, মায়ের কাছে যাচ্ছি।

একটু থাক না কেন ? বলেছিলেন রাজেশ্বরী।

চিণ্ময়ী স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিল, থেকে লাভ কী দিদা ? আপনি তো অন্যায় পক্ষ সমর্থন করবেন। আপনার কাছে যে কাঁদতে পারবে সেই জিতে যাবে।

কথাটা বলে আর দাঁড়ায় নি চিণ্ময়ী, চলে গিয়েছিল। কথাটা সে মিথ্যা বলেনি। প্রতিবারেই তিনি মৃণ্ময়ীর পক্ষ নেন। তাঁর একমাত্র যুক্তি, ঘরের বউয়ের দোষ ধরলে কী চলে ?

মৃণ্ময়ীর বক্তব্য শুনলেন তিনি। অভিযোগ গুরুতর। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর চুপি চুপি মহেন্দ্রকে ডেকেছিল সে। ডেকেছিল বাধ্য হয়েই। যদি এমন হবে জানতে পারতো তাহলে কখনোই সে তাকে ডাকতো না। অমন আম নাই বা খেত। নেহাৎ সকালে ব্রজদাদা অতদূর মগডালে উঠতে অস্বীকার করায় তাকে ডেকেছিল।

থলো-থলো আম ঝুলছিল। ও গাছটার আম বড় ভাল। সবে মাত্র রঙ ধরেছে। কাঁচা আমের আচার বড় ভাল হয়। টক্-টক্, মিষ্টি-মিষ্টি। আরো তো অনেক গাছ আছে। উঠে নিজেও পেড়ে নেয় কখনো সখনো। নেহাৎ ও গাছটায় উঠতে পারে না বলেই বলা। অত উঁচুতে উঠতে ভয় করে।

মহেন্দ্র উঠে আম কটা পেড়েছিল। প্রায় আট দশটা হবে। ভাগ নিয়ে বাধলো গণ্ডগোল। ও চায় আধাআধি বখরা। কিন্তু আম পাড়ার আগে ভাগের কথা মোটেই হয়নি। প্রথমে একটা দিয়েছিল। পরে দুটো। ও চায় অর্দ্ধেক। আচ্ছা অর্দ্ধেক দিলে কতটুকু আচার হবে? আর একদিনে সব খেয়ে নেওয়াও তো ঠিক নয়। এবারে আমের ফলন বড় কম। কালকের কথাটাও তো চিন্তা করতে হবে?

রাজেশ্বরী ওকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ও তোর থেকে কেড়ে নিতে গেল, এই তো?

হ্যাঁ।

বড় অন্যায়! সমর্থন জানালেন তিনি। মৃণ্ময়ীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু মহেন্দ্রর অভিযোগটা কম নয়। তার বুকখানা আঁচড়ে দিয়েছে মৃণ্ময়ী। ফরসা ধপ্‌ধপে বুকখানায় নখের আঁচড়ে রক্ত জমে গেছে।

রাজেশ্বরী বুঝতে পারলেন সব। সমস্যায় পড়লেন। দুজনের অভিযোগই সমান। দুজনেই সমান অপরাধে অপরাধী।

ওদের দিকে চাইলেন তিনি। একটি কিশোর, একটি কিশোরী। সংসার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আর এই অনভিজ্ঞতাটুকুও ওদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মাঝেও হাতাহাতি ঘটিয়েছে।

মহেন্দ্র বলল, আগে আমাকে আঁচড়ে দিয়েছে, তবে আমি ঠেলে ফেলে দিয়েছি।

মৃণ্ময়ী বলল, মিথ্যে কথা। আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে আগে।

বটে! গম্ভীর হলেন রাজেশ্বরী। ওদের দিকে দেখলেন। দুজনেই শত্রু ভাবাপন্ন, বিচার প্রার্থী। বুঝলেন, খুব সাবধানে এগুতে হবে তাঁকে। কেউ যেন মনে না করে তাঁর বিচার একতরফা হল। তাহলে যে দুঃখ ওরা পাবে তা সহজে ভুলতে পারবে না।

হয়তো বিচারের জন্যে আর কোনদিন তাঁর কাছে আসবে না। আর ওরা যদি না আসে? যদি নিত্য দিন ওদের ঘিরে এই বৈচিত্র্যটুকু না থাকে, তাহলে কেমন করে দিন কাটবে তাঁর? জীবনের শেষ কটা দিন তাঁর যে এমন আনন্দের মাঝে কাটবে, এ তিনি কোনদিন কল্পনা করতে পারেন নি। ওদের ওই কচি মনের স্পর্শে তিনি সব ভুলে যান। নিজের অতীতটাকে মনে পড়ে। তিনিও তো ওদের মতই ছিলেন একদিন। তাঁরও দিনগুলো কত আনন্দে কেটেছে। তাঁদের ঘিরে সেদিন কেউ আনন্দ পেয়েছেন কিনা জানেন না। কিন্তু আজ ওদের নিয়েই আনন্দে দিন কাটে তাঁর। মা ভুলে যান সব কিছু।

বললেন, তোদের কে যে দোষী, আর কে নির্দোষী, আমি বুঝতে পারছি না। এখন ঠিক করে আর একবার বলতো ঠিক ঠিক কী হয়েছিল?

বললে ওরা। দুজনের বক্তব্য প্রায় একই। কেবল কে যে আগে কাকে আঁচড়ে দিয়েছে বা ঠেলে ফেলে দিয়েছে, সেইটুকুতেই গণ্ডগোল। দুজনেই দুজনকে বলে, ও আগে আঁচড়ে দিয়েছে। বুঝতে পারলেন তিনি সবই। বললেন, দাদুভাই, সত্যি সত্যিই তুই দিদিভাইকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিস তো?

মহেন্দ্র বলল, বলছি তো দিয়েছি, কিন্তু আমাকে···

বাধা দিলেন তিনি। হাসি মুখে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা। তারপর মৃণ্ময়ীর দিকে চেয়ে বললেন, দিদিভাই, দাদুভাই তোকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার পরই তুই কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে ছুটে এসেছিস, এই তো?

তা কেন! বলল মৃণ্ময়ী, পড়ে যাবার পর ইটে লেগে আমার মাথা ফেটে গেল।

তাতো গেলই। গম্ভীর হলেন রাজেশ্বরী। বললেন, মাথা ফাটার পরই আমার কাছে চলে এসেছিস, এই তো?

হ্যাঁ। স্বীকার করল সে।

তাহলে? হাসলেন রাজেশ্বরী। ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার বলতো ভাই, কখন তুই দাহ্ভাইয়ের বুকখানা আঁচড়ে দিয়েছিলি? মনে করে দেখ ভাই, নিশ্চয়ই দাহ্ভাই তোকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার আগেই। তাইতো?

মৃণ্ময়ীকে কেমন যেন অসহায় দেখাল। তবু সে বলল, আমাকে আগে ঠেলে দিয়েছে।

বটেই তো।

মহেন্দ্র প্রতিবাদ জানাল, মিথ্যে কথা।

মৃণ্ময়ীও ছাড়বার পাত্রী নয়। বলল, তুমি মিথ্যেবাদী।

মহেন্দ্র বলল, তুমি।

তুমি।

রাজেশ্বরী ওদের থামিয়ে দিলেন। বললেন, দাহ্ভাই, দিদিভাই তোমাকে প্রথম আঁচড়ে দিয়েছে সত্যি, কিন্তু ঘরের বউকে ওভাবে ঠেলে ফেলে দেওয়া তোমারও উচিত হয়নি। ঘরের বউকে ওভাবে ঠেলে দেয় নাকি? তাছাড়া বয়সে ও তোমার থেকে ছোট না? আর শোন, এবার যদি দিদিভাই তোমাকে আম পেড়ে দিতে বলে, দেবে। ভাগ নিয়ে যদি গণ্ডগোল হয়, আমার কাছে আসবে। কিন্তু মারামারি কোর না আর।

মহেন্দ্র মেনে নিল রাজেশ্বরীর কথা। জয়ের আনন্দ নিয়ে চলে গেল সে। তিনি মৃণ্ময়ীর দিকে চাইলেন। মুখখানা গম্ভীর, থমথমে।

রাজেশ্বরা জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল দিদিভাই, কথা বলছিস না কেন?

মৃণ্ময়ী কথা বলল না। দু ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল চোখ বেয়ে।

দ্বারের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন গণেশ। দেখতে পেলেন, রাজেশ্বরীর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মৃণ্ময়ী।

সচকিত হলেন রাজেশ্বরী। দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান পুত্রকে দেখতে পেলেন তিনি। বললেন, আয় খোকা, ভেতরে আয়।

রাজেশ্বরীর আহ্বানে কক্ষে প্রবেশ করলেন তিনি। শ্বশুরের কণ্ঠস্বর শুনে তাড়াতাড়ি চোখ মুছছিল মৃণ্ময়ী। পুত্রবধূর কপালের ক্ষতস্থানটায় লক্ষ্য পড়ল তাঁর। আশ্চর্য হলেন তিনি। কারণ মধ্যাহ্নে আহারের সময় ওকে তিনি দেখেছেন। স্মরণ করে দেখলেন, তখন ক্ষতের কোন চিহ্নই ছিল না। বললেন, হ্যাঁ মা, তোমার কপাল কাটলো কী করে?

কপাল! বিব্রত হল মৃণ্ময়ী। কী বলবে যেন ভেবে পেল না প্রথমটায়। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, পড়ে গেছি বাবা।

পড়ে গেছ কখন, কোথায়?

মৃণ্ময়ী চুপ করে রইল। এবার আর উত্তর যোগাল না তার মুখে। অসহায় চোখে রাজেশ্বরীর মুখের দিকে চাইল সে।

বুঝতে পারলেন রাজেশ্বরী। মনে মনে না হেসে পারলেন না তিনি। পুত্রের দিকে চেয়ে বললেন, আমার ঘরে ঢুকতে গিয়ে আজ হোঁচট খেয়েছে দিদিভাই। তারপর ওকে বললেন, যা ভাই, বিকেল হয়ে এল, চুল বেঁধে নে।

রাজেশ্বরী যেন তাকে বাঁচালেন। আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। পালিয়ে বাঁচল যেন মৃণ্ময়ী।

তিনি সবই বুঝতে পারলেন। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। মাকে বললেন, কিন্তু আমার বোধগম্য হল না মা। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।

কী আবার হবে? প্রথমে বললেন বটে রাজেশ্বরী, পরক্ষণেই হেসে ফেললেন। প্রকাশ করলেন সমস্ত ঘটনা। মার মুখে সব শুনে হেসে উঠলেন তিনিও। মাকে বললেন, মা, আজই আমি পাণ্ডুয়া যাত্রা করবো।

আশ্চর্য হলেন রাজেশ্বরী। পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আজই ?

হ্যাঁ মা।

রাজেশ্বরী বুঝলেন, নিশ্চয়ই এমন কোন ঘটনা ঘটেছে, যাতে পুত্র তাঁর আজই পাণ্ডুয়া যাত্রা করতে চায়। বাধা তিনি দিতে চান না। ওর কোন কাজেই তিনি কোনদিন বাধা সৃষ্টি করেন নি। তবু মায়ের মন। সারা রাত্রি পুত্র পথ চলবে আর তিনি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাবেন, এ কখনো হয় ? হয় না। রাজেশ্বরী তা পারেন না। কাছে না থাকলে অনেকদিন রাত্রে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। শয্যায় শুয়ে শুয়ে বিনিদ্র চোখে রাতের আকাশটার দিকে চেয়ে থাকেন। পুত্রের কথা মনে পড়ে তাঁর। ওতো আজই তাঁর কাছ ছাড়া নয়। সেই কবে, ওর কৈশোর কাল থেকেই ওকে ছেড়ে থাকতে হয়েছে। স্বামীর ইচ্ছা হয়েছিল পুত্র ফারসী শিখুক। তিনিও আপত্তি জানান নি তাঁর সে ইচ্ছায়। সেদিন থেকেই ওকে ছেড়ে থাকতে হয়েছিল। সেদিন চিন্তা ছিল মনে, আজ দুর্ভাবনা। কারণ কিছুই তাঁর অজানা নয়। সব কথাই তিনি জানেন। সেইজন্যেই ভয়। বুকের মধ্যেটা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে বার বার। মা চণ্ডিকে ডাকেন। কুলদেবী তিনি। তিনিই তো শত বিপদে রক্ষা করছেন। তবু....

মা!

পুত্রের আহ্বানে ফিরে চাইলেন রাজেশ্বরী। পুত্রকে দেখলেন। বললেন, আগামীকাল প্রভাতে যাত্রা করলে হয় না খোকা ?

তা হয়তো চলে মা। কিন্তু···

কী খোকা ?

আমি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে চাই না। কারণ···। চুপ করলেন তিনি। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। রাজেশ্বরীও কথা বললেন না।

সত্যই ভাবতে পারেন নি তিনি। এ তাঁর ধারণার অতীত ছিল।

আশঙ্কা জেগেছিল অন্য কারণে। কটা নিঃসহায় ক্ষুধার্ত প্রাণী। তাদের একমাত্র অবলম্বন সেই যুবকটি। মোল্লার চক্রান্তে, মহানুভব সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের বিচারে এখন সে কারাগারে।

যুবকের কাছে সব শুনেছিলেন তিনি। জেনে ছিলেন তাঁর সব কথা। সে যে কোন অপরাধেই অপরাধী নয়, তাও বিশ্বাস করেছিলেন। ষড়যন্ত্র। তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল মোল্লার দল। তারা জানতো, তাকে যদি ধর্মান্তরীত করা যায়, বাধ্য হবে তার পরিবারের মানুষগুলোও। বাধা সৃষ্টি করলেন তিনি। কিন্তু সেই বাধার ফল যে এমন বিষময় হবে, তিনি তা চিন্তা করতে পারেন নি।

সনাতন ধর্ম, হিন্দু সমাজ। যে সমাজ তার সংকীর্ণতার দুরারোগ্য ব্যাধীতে দিন দিন নিমজ্জিত হচ্ছে। কঠিন অনুশাসনে সমাজপতির দল মানুষগুলোকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে না, মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেন না। সামান্য বিচ্যুতিতে ক্ষমা নেই। অপরাধী যদি দোষ স্বীকার করে, অনুতপ্ত হৃদয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে সমাজপতিদের পায়ে, তবুও পাষাণ গলে না। ক্ষমার বাণী উচ্চারিত হয় না সমাজপতিদের কণ্ঠে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশি চরিতার্থ করেন তাঁরা। ফলে ভাঙ্গন সুরু হয়েছে হিন্দু সমাজে। গরীব অসহায় মানুষগুলো দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। শাসক মুসলমান। ধর্মের ধ্বজাধারী মোল্লার দল ছলে বলে কৌশলে ধর্মান্তরীত করছে হিন্দুদের। ফিরে আসবার উপায় নেই। পথ রুদ্ধ। সমাজপতির দল কঠিন পাষাণ। যারা যাচ্ছে যাক, আমরা ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়ে অধর্ম করবো। আমরা সমাজপতি। সমাজ আমাদের জন্য। শত সহস্র হিন্দু যদি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, তাতেও আমাদের ক্ষতি নেই।

ক্ষতি নেই? হয়তো তাই। ক্ষুদ্র স্বার্থ বৃহত্তর স্বার্থের দিকে ফিরে চায় না। মোহ, দম্ভ! সমাজপতির দল তাঁদের আপন আপন স্বার্থ রক্ষায় এমনই মত্ত যে দূরদৃষ্টি হারিয়েছেন তাঁরা।

ভবিষ্যতের দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজনটুকু অনুভব করতে ভুলে গেছেন। যদি তা তাকাতেন, তাহলে এমন দম্ভোক্তি কখনই তাঁরা উচ্চারণ করতে পারতেন না। সেইখানেই তাঁর আক্ষেপ। সংকীর্ণমনা সমাজপতিদের নয়, গোটা সমাজটার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ। যে সমাজ দুর্বলকে রক্ষা করতে পারে না, অসহায়কে আশ্রয় দেয় না, সেই সমাজকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে ইচ্ছা করে তাঁর। ইচ্ছা হয় নতুন সমাজ গঠন করেন। মানুষের সমাজ। মানুষ হবে এক এবং অভিন্ন। উচ্চনীচ, জাতি ধর্মের বেড়াজালে বাধা পড়বে না। স্থান পাবে না স্বার্থের। অন্যায় আর অসত্যের বিরুদ্ধে জানাবে প্রতিবাদ। অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে ধন, প্রাণ, মান।

তাই তিনি বাধা দিয়েছেন মোল্লার দলকে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জাগাতে চেয়েছেন মানুষকে। কিন্তু মানুষ জাগে নি। যদি জাগতো তাহলে বিনা অপরাধে বন্দী যুবকের পরিবারের মানুষগুলো ধর্মান্তরীত হয়ে বাঁচার পথ খুঁজতো না। সমাজপতির দল একটি মাত্র মানুষের জন্যে গোটা পরিবার টাকে একঘরে করতেন না। তাঁদের বিচারে যুবক বিধর্মী হয়েছে, সংসারের অসহায় মানুষগুলোও সমাজের চোখে তাই হেয়। সমাজের কোন প্রয়োজন নেই তাদের। নেই স্থান।

রাজেশ্বরী ডাকলেন, খোকা।

মা'র ডাক শুনতে পেলেন তিনি। তাঁর মুখের দিকে চাইলেন। কথা বললেন না।

রাজেশ্বরী দেখলেন পুত্রকে। মাতৃহৃদয় তাঁর ফুলে উঠল। পুত্রকে বড় অসহায় বলে মনে হল তাঁর। ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে খোকা?

কী হয়েছে? কী বলবেন তিনি? কিছুই হয়নি। ব্যর্থ হয়েছেন? ভুল, ভুল করেছেন তিনি। সত্যই তাঁর জন্যই এমনটা

হল। যদি তিনি আর একটু সতর্ক হতেন, যদি নায়েব মশায়কে না পাঠিয়ে নিজেই ছুটে যেতেন, তাহলে হয়তো যুবকের পরিবারের অসহায় মানুষগুলোকে বাঁচালেও বাঁচাতে পারতেন। হয়তো পারতেন না। তিনি একা। সাধ্য কী তাঁর গোটা হিন্দু সমাজের অসহায় মানুষগুলোকে বাঁচান! কিন্তু সত্যই কী তারা অসহায়? না। অসহায়, দুর্বল তারা নয়। ঘুমিয়ে আছে আধমরা হয়ে। তাদের ঘুম ভাঙ্গাতে হবে। ভাঙ্গতে হবে মিথ্যা সংস্কার। তাদের বোঝাতে হবে, বিশ্বাস করাতে হবে, সমাজের চেয়েও মানুষ বড়। সমাজের জন্যে মানুষ নয়, সমাজ সৃষ্টি করে নি মানুষ। মানুষই সৃষ্টি করেছে সমাজ। একদিন হয়তো এই সমাজ সৃষ্টির মূলে স্বার্থ ছিল না। সমাজের কঠিন বন্ধন, কতকগুলো সংস্কারের গণ্ডি বদ্ধতার হয়তো প্রয়োজন ছিল। হয়তো সেদিন সমাজের মানুষের মঙ্গলের জন্যেই হাজার বিধিনিষেধ, উচ্চনীচের বর্ণভেদ, মানুষকে করেছিল পৃথক। সেই পৃথকীকরণ যে কালে এমন ধ্বংসের রূপ নেবে, মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থান্বেষীর স্বার্থে ভাগ্য নির্দ্ধারিত হবে শত সহস্র মানুষের, তা নিশ্চয় কল্পনা করা হয় নি। সেদিনের মঙ্গল চিন্তা আজ এনেছে ধ্বংশের অভিশাপ। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষমা নেই আজ সমাজপতিদের কাছে। প্রতিকার চিন্তা তাঁরা করেন না, করতে পারেন না। বিচারকের আসনে বসে শুধুমাত্র বিচার করেন, শাস্তি দেন। সে বিচার তাঁদের সুষ্ঠু হল কী না তাও দেখেন না। ফলে হিন্দুধর্ম হচ্ছে লাঞ্ছিত, মানুষ হারাচ্ছে তাদের পথ। বিধর্মীর দল সেই দুর্বলতার সুযোগে ছিনিয়ে নিচ্ছে মানুষগুলোকে। ছ'শো বছরের মুসলমান শাসন, সমাজপতিদের নাগপাশ, অসহায় দুর্বল মানুষগুলোকে বাধ্য করছে ধর্মত্যাগ করতে। বিধর্মীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেউ যে প্রতিবাদ জানাবে, প্রতিকার করবে, এমন মানুষ আজ নেই।

তিনি! গণেশ নারায়ণ···

না-না। তিনি কী করবেন? কী করতে পারেন? তাঁর একার সাধ্য কতটুকু?

তবু প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অনুরোধ করেছেন সুলতানকে। জানিয়েছেন ফকির দরবেশ মোল্লাদের কুকীর্তির কথা। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করছে। যার ধর্ম তার কাছে। হিন্দু তার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করছে। মুসলমানও। মুসলমানের কোন অনুষ্ঠানে হিন্দু তো বাধা সৃষ্টি করে না, বিঘ্ন ঘটায় না উৎসবে? তবে মুসলমান হিন্দুর অনুষ্ঠানে বাধা দেবে, তাদের ঘরের ইজ্জৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে কেন, কোন্ অধিকারে?

কথাটা শুনেছিলেন সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। চিন্তা করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ঠিক কথা দোস্ত। এ অন্যায়।

সে অন্যায়ের প্রতিকার তিনি করেছিলেন। কঠিন আদেশ জারি করেছিলেন তাঁর। অন্যায়, এ অন্যায়। অন্যায়ের কোন ক্ষমা নেই। যে অন্যায় করবে, শাস্তি তাকে পেতেই হবে। যদিও সে শাস্তি কেউ পায়নি, অন্যায় করতে সাহসী হয়নি কেউ-ই। দেশটায় শান্তি এসেছিল। দূর হয়েছিল ভয়। নির্ভয়ে হেসেছিল মানুষ।

সেই হাসি বন্ধ হয়ে গেল। কালো মেঘ ঘনিয়ে এল আকাশে। গ্রাম বাংলার মানুষের আর্তনাদ সুরু হল দিকে দিকে। একা তিনি। কতটুকু সাধ্য তাঁর। তবু তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কামনা করেছেন প্রতিকারের। কিন্তু এবার আর কোন প্রতিকার বুঝি সম্ভব নয়। কে করবে প্রতিকার? অত্যাচারীর কাছে প্রতিকার প্রার্থনা তো অরণ্যে রোদন।

তবে?

না-না, তা কী করে সম্ভব? সম্ভব নয়। তিনি পারেন না। সে সাধ্য তার নেই। প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তোলা তো মৃত্যুর নামান্তর। কিছুই করতে পারেন না তিনি।

তবে কী এই অন্যায় অসত্যকে মেনে নেবেন? নীরবে সহ্য করবেন সব কিছু? হিন্দু হয়ে হিন্দুর প্রতি বিধর্মীর লাঞ্ছনা শুধু দেখে যাবেন?

না, কখনো নয়!

কিন্তু কী করবেন তিনি? কী করতে পারেন? তাঁর মত একজন ভূ-স্বামীর পক্ষে কিছু করা সম্ভব কী? তিনি কী পারবেন?

রাজেশ্বরী ডাকলেন, খোকা।

মা।

আমার কাছে আয়।

মায়ের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। পাশে বসলেন। পুত্রের গায়ে মাথায় মাতৃস্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন রাজেশ্বরী। বললেন, অত উতলা হলে চলে না খোকা।

মা।

দুঃখের দিনে ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। সুখ দুঃখ সবই তো তাঁরই দান। আলো-আঁধার ভরা জীবনের মাঝে সূর্যের সাধনাই যে সত্য। লক্ষ্য যদি স্থির হয়, সফলতা আসবেই। অন্ধকার তো মানব জীবনের পরীক্ষাকাল। সেটুকু হাসি মুখেই গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বাস হারালে কী চলে?

মা।

হাসলেন রাজেশ্বরী। বললেন, খোকা, আজ যা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, হয়তো তা, কঠিন কিন্তু ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলে কিংবা চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে। স্থির রাখতে হবে লক্ষ্য। প্রতীজ্ঞা কঠোর মন নিয়ে অতিক্রম করতে হবে পথ।

পারবো?

কেন পারবি না বাবা। যদি ধর্মপথে যাত্রা হয়, তাহলে দেখবি,

আজ যা কঠিন বলে মনে হচ্ছে, যা দেখে এগিয়ে যেতে সাহসী হচ্ছে না মন, তা কত তুচ্ছ হয়ে গেছে। বাধাকে আর বাধা বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু···

কী মা?

রাজেশ্বরী পুত্রের মুখের দিকে চাইলেন। কী যেন চিন্তা করলেন ক্ষণিক। বললেন, ধর্মের জয় হবেই। অধর্মকে কোনদিন গ্রহণ করিস নি। মিথ্যা যদি মনে বাসা বাঁধে, বিচ্যুত হবি সত্য থেকে। লোভ অনর্থ ঘটায় বাবা।

সে কথা জানি মা।

তবে?

আমি যে একা।

একা?

হ্যাঁ মা।

কে বললে তুই একা।

সত্যিই আমি একা।

না খোকা। হাসলেন তিনি। পুত্রের মাথায় জননীর স্নেহ স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন আবার। বললেন, আমরা কেউ একা নই। মনে হয় আমি একা, আমি ভিন্ন আর কেউ নেই। কিন্তু তিনি আছেন। তিনি আছেন বলেই তো আমরা আছি। বিপদের দিনে তিনিই তো বন্ধুভাবে এসে হাত ধরেন। ক্ষুধার্তের মুখে তুলে দেন অন্ন। রোগীর শয্যা পার্শে বসে করেন সেবা। বন্ধুর পথে বন্ধু হয়ে তিনিই তো পথ দেখান। সবই তিনি করেন বাবা। তিনিই করান, আমরা করি মাত্র। আর তিনি আছেন তাই···

বাধা দিলেন তিনি। ডাকলেন, মা!

রাজেশ্বরী পুত্রের মুখের দিকে চাইলেন। দেখলেন, বড় অসহায় সে মুখখানি। বললেন, কী হয়েছে বাবা?

আমি কী করবো?

কী করবি? জানতে চাইলেন রাজেশ্বরী।

এক মুহূর্ত মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। বললেন, ঈশ্বর যে করুণাময় তা আমি অবিশ্বাস করি না মা। তিনি ভিন্ন জীবের গতি নেই। কিন্তু আমার মনের সেই অটুট বিশ্বাসটুকুর মাঝেও আজ আমি নিজেকে বড় অসহায় বোধ করছি। আমি ভেবে পাচ্ছি না কী করবো, কী করা উচিত আমার। আমি কী চুপ করে থাকবো? হিন্দুর প্রতি সুলতানের আজকের এই অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ জানাবো না? করবো না কোন প্রতিকার?

নিশ্চয়ই করবি বাবা।

কিন্তু কেমন করে মা? আমার একার পক্ষে তা কি সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়?

না মা, সত্যই তা সম্ভব নয়। কেন যে নয়, তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। হিন্দু শুধু মার খাচ্ছে, আর অসহায়ের মত কাঁদছে। সমাজপতির দল দূরে দাঁড়িয়ে শাস্ত্রের বিধান দিচ্ছেন। তাঁদের বিচার বড় নির্মম, কঠিন। সমাজচ্যুত হচ্ছে যে মানুষগুলো তাদের জন্যে এতটুকু করুণা বোধ করছেন না তাঁরা। বিধর্মী মুসলমানের দল ছলে বলে কৌশলে সমাজের বুকে আঘাত হানছে, দেখেও হায় হায় করছেন না তাঁরা। একবারও বলছেন না, জীবন দাও, তবু ধর্ম ত্যাগ করো না।

চুপ করলেন তিনি। উত্তেজনায় তাঁর সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছে। মায়ের মুখের দিকে একবার তাকালেন। বললেন, হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অত্যাচার নয়, মানুষের প্রতি মানুষের এই অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারছি না। স্বাধীনতার সূর্য আজ অস্তাচলে। হিন্দুর গৌরবের দিন আজ থেকে দুশো বছর আগে শেষ হয়ে গেছে। আজ বাংলা দেশের সুলতান মুসলমান। ভাগ্য তাঁদের বাংলার শাসকের আসনে বসিয়েছে। কিন্তু মানুষের ধর্ম

নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন কেন তাঁরা? কে দিয়েছে তাঁদের সে অধিকার। মানুষের অধিকার হরণের অত্যাচারকে কেন নীরবে মেনে নেব আমরা?

আবার চুপ করলেন তিনি। মুক্ত বাতায়ন পথে দৃষ্টিটাকে বাইরে ছড়িয়ে দিলেন। দিনের সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সোনা রঙে আবিরের আলপনা। আকাশপথে পাখীর দল ফিরে চলেছে কুলায়। নীড়ের স্বপ্ন তাদের কাকলী ধ্বনীতে।

অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলেন তিনি। অতি পরিচিত ছবি। তবু আজ তার দেখতে ভাল লাগলো। মুক্ত বিহঙ্গদলের কাকলী ধ্বনীতে মুক্তির সুর শুনলেন যেন। তারপর একসময় মায়ের দিকে ফিরে মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, মা!

রাজেশ্বরী কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। সে ডাক তাঁর কানে পৌঁছাল না। পুত্রের কথাই চিন্তা করছিলেন তিনি। মিথ্যা নয়, কিছুই মিথ্যা বলেনি তাঁর পুত্র। তিনিও চান হিন্দুর প্রতি এই অন্যায়, অত্যাচার বন্ধ হ'ক। মানুষ হ'ক সমান অধিকারে অধিকারী। সমধর্মী হয়ে মানুষ মানুষকে ভালবাসুক, স্নেহ করুক, ভাই বলে বুকে টেনে নিক। কিন্তু···

গণেশ নারায়ণ আবার ডাকলেন, মা।

এবার সে ডাক রাজেশ্বরী শুনতে পেলেন। পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। প্রশ্ন করলেন, কিছু বলবি বাবা?

কী ভাবছো মা?

ভাবছি! একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো রাজেশ্বরীর। কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিলেন তিনি। পুত্রের মুখের দিকে একবার চাইলেন। চিন্তা করলেন এক মুহূর্ত। মৃদু কণ্ঠে বললেন, তোর চিন্তা, ভাবনার সঙ্গে আমিও একমত বাবা। হিন্দুর প্রতি মুসলমানের এই অন্যায় অত্যাচার আমারও অসহ্য বোধ হয়। আমিও অন্যায়ের প্রতিকার কামনা করি। আমি বিশ্বাস করি, দুশো বছরের মুসলমান শাসনে

বাংলার যুবশক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়েনি। তারা শুধুমাত্র ঘুমিয়ে আছে। সে ঘুম থেকে তাদের জাগিয়ে তোলে এমন কেউ নেই।

মা!

হ্যাঁ গণেশ! হাসলেন রাজেশ্বরী। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, এমন যদি কেউ তাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, ডাক দেয়, বলে—আর নয়, ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠো তোমরা। যদি বাঁচতে চাও, বাঁচাতে চাও ধন প্রাণ মান, তাহলে গর্জে ওঠো। তাহলে···

মা!

হ্যাঁ গণেশ। তাহলে নিশ্চয়ই তারা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ছুটে আসবে। বজ্রহুঙ্কারে গর্জে উঠবে। বিদেশী শাসকের অন্যায় অত্যাচারকে মাথা নত করে মেনে নেবে না।

সত্যি মা?

হ্যাঁ বাবা, সত্যি। একটু চুপ করলেন তিনি। কণ্ঠটা যেন ম্লান শোনাল তাঁর। বললেন, কিন্তু তেমন কেউ নেই। একজনও এগিয়ে এল না বাঙ্গালীর জাতি ধর্ম রক্ষায়। অত্যাচারীর দলকে কঠিন কণ্ঠে বলল না, বাঙ্গালীর জীবন, হিন্দুর ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ কর তোমরা। যদি কথা না শোন, হিন্দুর প্রতি যদি হাত বাড়াও, তাহলে তোমাদের হাতকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে দেব। প্রাণ দেব, তবু ধর্ম দেব না।

মা!

বল বাবা?

আমি তো তাই চাই মা।

তুই! রাজেশ্বরী যেন পুত্রের কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। এমন ভাবে চাইলেন যেন পুত্র তাঁকে কোন নতুন কথা শোনাল।

মায়ের বিস্মিত দৃষ্টিটা লক্ষ্য করলেন তিনি। বললেন, হ্যাঁ মা, আমি তাই চাই।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব বাবা ?

কেন নয় মা ?

কেন ? রাজেশ্বরীর ওষ্ঠে আবার একটু মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন, সত্যই তা সম্ভব নয় গণেশ।

কেন নয় মা ?

কেন ? আবার চুপ করে রইলেন রাজেশ্বরী।

মায়ের এই নীরবতায় অসহ্য বোধ করলেন তিনি। নিজেকে কেমন যেন অসহায় বোধ হল তাঁর। বললেন, আমাকে তুমি ক্ষমা কর মা। আমি বুঝতে পারছি না তোমার আপত্তির কারণ। তুমি কী মনে কর না, হিন্দুর প্রতি মুসলমানের এই অত্যাচারের প্রতিকার কামনা আন্তরিক নয় ?

তা নয় বাবা।

তবে ?

রাজেশ্বরী নীরব রইলেন।

ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি ডাকলেন, মা!

রাজেশ্বরী পুত্রের মুখের দিক চাইলেন। সে দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ। বললেন, সুলতান হয়তো অত্যাচারী নন, কিন্তু পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া মোল্লার দল কেমন করে সাহসী হয় হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরীত করতে ? নিশ্চয়ই সম্ভব নয় এটা ? আর···

মুহূর্তে দূর হল অসচ্ছতাটুকু। লজ্জিত হলেন তিনি। অপরাধী কণ্ঠে বললেন, আমাকে ক্ষমা করো মা। আমি বুঝতে পেরেছি।

পারবি ?

নিশ্চয়ই পারবো মা। আমার ভুল ভেঙ্গেছে। তুচ্ছ আমিরের পদ এই মুহূর্তেই ত্যাগ করলাম।

কিন্তু···

স্বার্থের চেয়ে ধর্ম বড় মা। মৃদু কণ্ঠে বললেন, এতদিন আমি অন্ধকারে ছিলাম। মানুষের অসহায় কান্নায় আমি দুঃখ পেয়েছি,

উতলা হয়েছি, প্রতিকারের প্রত্যাশায় সুলতানের কাছে বার বার মাথা কুটেছি। কিন্তু আপন স্বার্থটুকু ত্যাগ করে গর্জে উঠতে পারি নি। তা যদি পারতাম, তাহলে প্রহসনে পরিণত হত না নিরপরাধী যুবকের বিচার। অসহায় মানুষগুলো বাঁচার জন্যে ধর্মান্তরীতও হত না। এ আমার ভুল মা। শুধু ভুল নয়, এ আমার অন্যায়। আমার প্রায়শ্চিত্ত আমি নিশ্চয়ই করবো।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। প্রণাম করলেন জননীকে। বললেন, আসি মা।

এসো বাবা। মৃদুকণ্ঠে বললেন রাজেশ্বরী।

অন্তরালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করছিল মৃণ্ময়ী। দুরু দুরু বুকে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে স্মরণ করছিল সে। শ্বশুর মশায় কক্ষ থেকে বাইরে বেরুতেই সন্তর্পনে দ্বারের কাছে গিয়ে উঁকি দিল সে।

রাজেশ্বরী পালঙ্কে বসে আছেন। হাতে তুলে নিয়েছেন জপের মালাগাছাটি। দিন রাত্রির সঙ্গী তাঁর। বৃদ্ধার এইটুকুই বুঝি জীবনের শেষ সম্বল। প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছেন। কারো বিনা সাহায্যে চলতে ফিরতেও কষ্ট হয় তাঁর। সে চেষ্টাও তিনি করেন না। কারণ প্রয়োজনীয় সব কিছুই তিনি হাতের কাছে পান। দিনের বেশির ভাগ সময় কেউ না কেউ কাছে থাকে। রাতের বেলাতেও সত্যবতী থাকতে চায়। কিন্তু রাজি হন না তিনি। বলেন, না বউমা, সারা দিন পরিশ্রম করে রাত জাগতে হবে না মা তোমাকে।

হাসে সত্যবতী। বলেন, রাত জাগবো কেন মা? আপনার পায়ের তলায় শুয়ে ঠিক ঘুমবো দেখবেন?

তিনিও হাসেন। বলেন, তুমি যে কত ঘুমবে তা আমার জানা

আছে মা। কাজ নেই তোমার থেকে। রাতটুকু আমি একলাই কাটিয়ে দেব।

আর আপত্তি করে নি। রাধার মা দ্বারের বাইরে শুয়ে থাকে। তবু রাতের মধ্যে ক'বার উঠে আসে সত্যবতী। রাধার মাকে জাগায়। চুপি চুপি বলে, একটু জেগে ঘুমাস রাধার মা।

ওমা, সে কী কথা! অবাক হয় রাধার মা। বলে, জেগে কেমন করে ঘুমবো মা? জেগে ঘুমনো যায় না কী গো?

মৃদু তিরস্কার করে সত্যবতী। বলে, মাঝে মাঝে একটু উঠে দেখবি তো? কিছু দরকার কী না জিজ্ঞাসা করবি তো?

রাধার মা বলে, সে আমি ঠিক জেনে নেব।

বলে বটে কিন্তু একটা দিনও রাধার মায়ের জেনে নেওয়া আর হয় না। একবার শুলে সারারাতে সত্যবতী না ডাকলে ঘুম ভাঙ্গে না রাধার মায়ের।

কথাগুলো রাজেশ্বরীই বলেন। তিনি যে সব কিছুই শুনতে পান। বলেন, দিদিভাই, এখন আর ঘুম আসে না। কেমন যেন তন্দ্রার ঘোরে পড়ে থাকি। কত কথা ভাবি। কত কথা মনে পড়ে। শুয়ে থাকতে ভালও লাগে না। উঠে বসে মালাগাছাটি তুলে নিই। ইষ্ট নাম জপ করি। সব ভুলে যাই। জগৎ সংসার সব কিছু।

মৃণ্ময়ী অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। রাজেশ্বরী একমনে মালা জপছেন। মনে পড়লো তাঁর কথাগুলো, দিদিভাই সব ভুলে যাই, জগৎ সংসার সব কিছু।

সর্বনাশ! মনে মনে অধৈর্য হল মৃণ্ময়ী। দিদাকে যে তার বড় প্রয়োজন।

বাইরে সন্ধ্যা নামছে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। মৃদু ভাবে ম্লানের ছোঁয়া লাগছে আকাশে। নারকেলের সবুজ পাতায় পাতায় তখন রৌদ্রের ঝিকিমিকি।

রাজেশ্বরী দেখছেন সন্ধ্যার শান্ত রূপ। ম্লান বিষণ্ণ। নতমুখী দুঃখিনী কন্যা যেন বুকের কান্না রোধ করছে আপ্রাণ চেষ্টায়। শুনতে পেলেন কার পদশব্দ। কে যেন প্রবেশ করল কক্ষে। পদশব্দে চিনতে পারলেন তিনি। এ গৃহের প্রতিটি মানুষের পদশব্দই তাঁর অতি পরিচিত। দীর্ঘদিন শুনে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, এতটুকু চিন্তা না করেই বলে দিতে পারেন, কে আসছে কিংবা কে গেল। কিন্তু সব বুঝেও তিনি চুপ করে রইলেন। ফিরে চাইলেন না।

অনেকক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করল মৃণ্ময়ী। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এল কাছে। মৃদুকণ্ঠে ডাকল, দিদা!

রাজেশ্বরী ফিরলেন। মেয়েটার দিকে চাইলেন। দেখলেন ওর মুখখানা কেমন যেন ম্লান। বুঝতে পারলেন না কারণ।

মৃণ্ময়ী আবার ডাকল, দিদা!

কী দিদিভাই?

আমি···আমি···। কথাটা শেষ করতে পারল না সে।

তুই কী? রাজেশ্বরী জানতে চাইলেন কথাটা।

আপনি বাবা মশায়কে বলেন নি তো?

কী? রাজেশ্বরী অবাক হলেন। বুঝতে পারলেন না, ও কী বলতে চায়।

একটু যেন লজ্জিত হল মৃণ্ময়ী। একটু ইতঃস্তত করল। বলল, ওই যে আমার মাথা ফাটা! আমি মিথ্যে বললাম বাবা মশায়কে। সত্যিই তো আমি পড়ে যাই নি।

ওঃ, তাই বল! বুঝতে পারলেন রাজেশ্বরী। হাসলেন, তোকে তো মহেন্দ্র ঠেলে ফেলে দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে?

আপনি বলেছেন নাকি ওঁকে? চমকে উঠল মৃণ্ময়ী! দুর্ভাবনা দেখা দিল তার চোখে মুখে।

আমি? চিন্তা করলেন রাজেশ্বরী। বললেন, বলেছি কী না ঠিক মনে করতে পারছি না দিদিভাই। মনে হচ্ছে যেন···

দিদা! যেন ককিয়ে উঠল মেয়েটা।

হাসলেন তিনি। ওকে কাছে টেনে নিলেন। চুপিচুপি বললেন, তাই কী বলতে পারি ভাই! যে মেরেছে, সে তো তোরই স্বামী?

মৃণ্ময়ী তার দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো রাজেশ্বরীকে। জপের মালাটা খসে পড়ল তাঁর হাত থেকে।

চার

দুজনে চেয়ে আছেন দুজনের মুখের দিকে। স্থির অপলক দৃষ্টি। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্ আর গণেশ নারায়ণ। একজন সুলতান, অন্যজন আমীর।

সুলতান বেশ কিছুটা বিমূঢ়। অসহায় ভাব তাঁর চোখে মুখে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে। তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। হয়তো বা তা নয়। তিনি যেন···না কিছুই চিন্তা করতে পারছিলেন না তিনি। তিনি যেন অতীতে ফিরে গেছেন। কাতরতা ফুটে উঠছে। একটা মানুষ, হারিয়ে যাওয়া একটা প্রাণ যেন জেগে উঠছে তাঁর মধ্যে। আজকের সুলতান নন, অনেকদিন আগের জীবন যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত এক শাহজাদা। অন্যায় আর অসত্যকে যিনি ঘৃণা করতেন। মুক্তি চাইতেন। ভালবাসা কামনা করতেন। মানুষের ভালবাসা। যে ভালবাসা তাঁকে জীবনের প্রতি মমতা জাগিয়েছিল। তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন। সামান্যের মধ্যেও তৃপ্তি খুঁজেছিলেন। শান্তি, আশ্বাস। তিনি বলেছিলেন, জীবনকে আমি ভালবাসি। আমি বাঁচতে চাই। হিংসা আর রক্তপাতকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি স্বার্থপরতাকে। সেই মানুষটা, অতীতের একটা প্রাণ যেন জেগে উঠছে। ধরতে চাইছে হাত। উপকারী বন্ধু তুমি আমার। তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না। এতো আমার প্রাণের কথা। এসো বন্ধু, কাছে এসো। আমার হাত ধরো। আমাকে তোমার কাছে টেনে নাও। তুমি আমরা বন্ধু। আমাদের সম্পর্ক ম্লান হতে দিও না। আমরা···

একটা অসহায় মানুষ। দুর্বল পঙ্গু। বাঁচতে চায়, তবু পারে না।

সংকীর্ণতা, ধর্মান্ধতা তাকে অন্ধ করেছে। জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে। তবু···

মিথ্যা, ভুল। অতীত মুছে গেছে। সত্য বর্তমান। বন্ধুত্ব নয়, কর্তব্য। মানুষের পরিচয়। মোহমুক্তি ঘটেছে। জেগে উঠেছে প্রাণ। এবার গর্জে উঠবে কণ্ঠ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। অত্যাচারীর ক্ষমা নেই। অতীত মুছে গেছে। আজকের পরিচয়ই সত্য। একজন শাসক, অন্যজন শোষিত। বন্ধুত্বের স্থান কোথায় এখানে? নেই—নেই। যা ছিল তা হারিয়ে গেছে, মুছে গেছে। শত চেষ্টাতেও আজ আর পুরাণো দিন ফিরবে না। ফেরা সম্ভব নয়। কারণ, একটা বিরাট মিথ্যা, ফাঁকির ওপর আমাদের বন্ধুত্বের ভিত গড়ে উঠেছিল। একের স্বার্থ অন্যকে আঘাত হেনেছে। শত সহস্র মানুষের ক্ষতি বন্ধুত্বও স্বীকার করবে না। কারণ আমাকে না হলেও আমার ভাইকে ঘৃণা কর তুমি। আমার ভাইয়েরই রক্তধারা বইছে আমার ধমনীতে। তুমি আমার বন্ধু, সে আমার আত্মার আত্মীয়। উপরন্তু যে নির্দোষী, সেও তো বাঁচতে চায়। আমাকে বন্ধুত্বের ছলনায় ভুলিয়ে তার চরম সর্বনাশ করবে, তাতো হতে পারে না!

তবু গিয়াসুদ্দীন তাঁর দিকে একখানা হাত এগিয়ে দিলেন। বললেন, এ আপনি কী বলছেন দোস্ত?

এই সত্য জাহাঁপনা। মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি।

আমাকে ত্যাগ করবেন?

আপনাকে ত্যাগ করা উচিত হয়ত নয়। একটু নীরব রইলেন তিনি : মৃদু কণ্ঠে বললেন, আপনার কথা মনে থাকবে আমার। কিন্তু আমির থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

কেন দোস্ত?

আমি যে হিন্দু জাহাঁপনা। হাসলেন তিনি, বললেন, দরবারের প্রতিটি উচ্চপদস্থ হিন্দুকে যখন বিনা অপরাধে বিতাড়িত

করেছেন, তখন আপনার প্রতি আমার এই করুণাটুকু গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দোস্ত! যেন শেষ চেষ্টা করলেন গিয়াসুদ্দান।

না জাহাঁপনা! তিনি বাধা দিলেন। কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি অপরাধ না নেন, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি সুলতান, বাংলার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। আপনার ন্যায়নীতি উদারতার জন্য হিন্দুরা আপনাকে তাদের দেবতার আসনে বসিয়েছিল। মানুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-হীন ব্যবহার আপনার মহত্ত্বেরই প্রকাশ। কিন্তু জাহাঁপনা, আজ জীবন-সায়াহ্নে এসে একি করছেন আপনি? মানুষের অন্তর থেকে কেন মুছে দিচ্ছেন আপনার সেই অতি পরিচিত মূর্তিখানি?

চুপ করলেন তিনি। সুলতানও নীরব। গিয়াসুদ্দীন যেন চিন্তা-সমুদ্রে ডুব দিয়েছেন। অতীত বর্তমানের দ্বন্দ্ব-দোলায় দুলছে তাঁর মন। একটা অসহায় অন্ধ মানুষের আর্তি ফুটে উঠছে চোখে-মুখে, সমস্ত অবয়বে। তিনি যেন কিছুটা বিস্মিত! সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই সমালোচনা করছে এক হিন্দু, বেতনভুক্ কর্মচারী। দোস্ত-বন্ধু, না না বন্ধু নয়, হিন্দু। একজন হিন্দু বিচার করছেন মুসলমানের, একজন সুলতানের!

নসিব। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের ভাগ্য। বদ্‌নসিব। এ তাঁর মন্দ ভাগ্য। নিন্দা, প্রশংসা। মোল্লার দল খুশি। এতদিনে তাঁরা তাঁদের মনোস্কামনা পূরণ করতে পেরেছেন। কাফেরদের প্রতি সুলতানের আন্তরিকতাটুকু মুছে দিতে পেরেছেন তারা। হিন্দু কাফের। কাফেরের দল মুসলমানের সমানাধিকার অর্জন করতে পারে না। মুসলিম রাজ্যে হিন্দুর কোন অধিকার নেই। তারা আশ্রিত, দয়ার পাত্র।

আর হিন্দুরা? আজ নিশ্চয়ই তারা সুলতানকে অভিশাপ দিচ্ছে। এতদিন অত্যাচারের প্রতিকার কামনা করে এসেছে, এবার যেন

প্রতিবাদ জানাচ্ছে। গণেশ নারায়ণের কণ্ঠে সেই সুর। তিনি ভুল শোনেন নি। গণেশ নারায়ণ তাঁর বিচার করছে। একজন হিন্দু করছে মুসলমান সুলতানের বিচার।

তবে কী বিচারের দিন সমাগত? না, না। চমকে উঠলেন তিনি। একটু যেন আতঙ্ক জাগলো মনে। পরক্ষণেই নিজেকে কঠিন করলেন তিনি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান ভূ-স্বামীর দিকে চাইলেন। তাঁর বন্ধু, দোস্ত। অতি পরিচিত মূর্তি। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত ললাট, আয়ত চক্ষুদ্বয়, তীক্ষ্ণ নাশা। প্রতীজ্ঞা-কঠিন ভঙ্গী। শত বিপদে, ঝড় ঝঞ্ঝায় এতটুকু পরিবর্তন দেখেননি। তাঁর হাত ধরেছেন। সাহায্য করেছেন। আজকের এই যে সুলতানী, এতো বন্ধুর সাহায্য বিনা সম্ভব হত না?

তবু! তবু তিনি সুলতান। বন্ধু হলেও তাঁর বিচারের অধিকার কারো নেই। বিচারের দিনে সাহায্য পেয়েছেন সত্য। প্রতিদানও কম দেন নি। সামান্য একজন ভূ-স্বামী আজ সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের দরবারের আমির। বন্ধু বলে নয়, উপকারের বিনিময়ে। উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীদের কর্মচ্যুত করেছেন, কিন্তু ওঁকে রেখে দিয়েছেন। কারণ উপকারী তিনি। একদিন অনেক উপকার করেছিলেন তাঁর। কিন্তু বিচারের অধিকার···

না, না, অসহ্য! তাঁর বিচারের অধিকার কারো নেই। মুজাফর শামন বাল্‌খির কথাই সত্য, মুসলিম রাজ্যে বিধর্মী হিন্দুর কোন অধিকার না থাকাই উচিত। তবু তিনি···। না, আর নয়, যথেষ্ট শিক্ষা তাঁর হয়েছে। তাঁর উচিত এখন, এই মুহূর্তেই স্পর্ধার শাস্তি দেওয়া। বুঝিয়ে দেওয়া, তিনি সুলতান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন···

কিন্তু সে ইচ্ছাটাকে অতিকষ্টে দমন করলেন তিনি। শ্লেষাত্মক কণ্ঠে জানতে চাইলেন, আর কিছু বলবেন?

সুলতানের মুখের দিকে চাইলেন গণেশ নারায়ণ। গিয়াসুদ্দীনকে যেন চিনতে পারলেন না। বুঝতে পারলেন, বৃথাই তিনি চেষ্টা

করেছেন স্থলতানের মনোভাব পরিবর্তনের। কারণ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন হিন্দুর প্রতি তাঁর আজকের এই ব্যবহার সত্য নয়। ইচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায় তিনি উচ্চপদস্থ হিন্দুদের কর্মচ্যুত করেছেন। করতে বাধ্য হয়েছেন। মহানুভব স্থলতান গিয়াস্‌দ্দীন আজম শাহের মনটা আগের মতই পবিত্র নির্মল আছে। কিন্তু তা যে কত মিথ্যা সেটুকু বুঝতে পারলেন তিনি। একদিন ভেবেছিলেন, হিন্দুদের প্রতি মোল্লাদের অত্যাচার, জোর করে ধর্মান্তরীত করা, তাও বুঝি তাঁর অনিচ্ছাতেই ঘটেছে। সেই নিরপরাধী যুবকের বিচারের নামে প্রহসন তাও কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে! সে ভুল তাঁর ভাঙ্গল। বিপদের দিনে বন্ধুই তো প্রকৃত বন্ধু, এও যেন চরম রসিকতা। দুঃখে হতাশায় মনটা ভেঙ্গে পড়ল তাঁর। তবু তিনি হাসলেন। কথা বললেন। নিজের কণ্ঠস্বরটা কানে পৌঁছাতে অবাক হলেন। বললেন, জাহাঁপনা আমি জানি, আপনাকে কিছু বলা কিংবা উপদেশ দেওয়া আমার মত নগণ্য এক ভূ-স্বামীর শোভা পায় না। কিন্তু আমার ধারণা বা বিশ্বাসের যে এমনভাবে অপমৃত্যু ঘটবে, এ আমি কোনদিন কল্পনা করতে পারি নি। সত্যই যদি কোন অন্যায় করে থাকি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

আর?

আর? হতাশায় ভেঙ্গে পড়া দেহটায় মুহূর্তে যেন বল সঞ্চার হল। মাথাটা উঁচু করে দাঁড়ালেন তিনি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্থলতানের মুখের দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন, আর কিছু কী সত্যই আপনি আশা করেন?

করি। গিয়াস্থদ্দীনের কণ্ঠটাও এবার তীক্ষ্ণ।

কী?

শত্রুতা।

না। যেন চিৎকার করে উঠলেন তিনি। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, শত্রুতা করা হিন্দুর ধর্ম নয়।

মিথ্যা কথা।

না। প্রতিবাদ জানালেন তিনি। বললেন, না জাহাঁপনা, হিন্দু যদি মনে প্রাণে সত্য সত্যই শত্রুতা সাধনে ব্রতী হ'ত, তাহলে বাংলার মাটিতে ইসলামের জয়পতাকা এভাবে ওড়া সম্ভব হ'ত না। কারণ হিন্দুধর্ম চিরকাল নিজ ধর্মের প্রতি আস্থাশীল। অন্যের ধর্মে সে হস্তক্ষেপ করে না। কারণ সে বিশ্বাস করে মানুষকে। ধর্ম তার প্রাণের সম্পদ।

আপনি যান।

যাচ্ছি জাহাঁপনা। কারণ আজ আমি জানি, আপনার কাছে আমার—আমার কাছে আপনার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। একটা বিরাট মিথ্যা কিংবা ফাঁকির ওপর আমরা দাঁড়িয়ে ছিলুম। আমার ভুল ভেঙ্গেছে। এতদিন আপনার পক্ষালম্বন করে যে পাপ করেছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

সুলতানকে সেলাম জানালেন তিনি। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে স্থানত্যাগ করে চলে গেলেন।

দাঁড়িয়ে রইলেন সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। গণেশ নারায়ণের চলে যাওয়া পথের দিকে অনেকক্ষণ স্থির অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তাঁর যেন মনে হল, কী যেন ভুল করলেন তিনি। যে ভুলের সংশোধন নেই।

তাই বা কেন ? পরক্ষণেই মনে হল তাঁর। তিনি ঠিক করলেন। উপকারী বন্ধু বলেই অন্যান্য হিন্দুদের পদচ্যুত করতে চক্ষু লজ্জায় বেধেছিল। এ ভাল হল। এবার···

চমকে উঠলেন তিনি। সম্ভাবনাটা মিথ্যা নাও হতে পারে। হিন্দুতে-হিন্দুতে বিরোধের অন্ত নেই সত্য। ভূ-স্বামীর দল একে অন্যের চেয়েও ক্ষমতাবান ভাবেন। ছলে বলে কৌশলে সর্বনাশের পথ খোঁজেন। কিন্তু গণেশ নারায়ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। উত্তর বাংলার এই ভূ-স্বামীটি সত্যই ক্ষমতাবান। ন্যায়নীতি উদারতায়

তিনি জয় করেছেন সাধারণ মানুষের মন। অসহায়ের বন্ধু তিনি। তাঁর দয়া দাক্ষিণ্যের শেষ নেই। নির্লোভ, সচ্চরিত্র তিনি। জেনেও এত বড় ভুলটা করলেন, করতে বাধ্য হলেন। কারণ এছাড়া তাঁর অন্য কোন পথ নেই। তিনি বাঁচতে চান। দুনিয়ার আলো হাওয়া বাতাসের মাঝে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করেন। সেই জন্যেই তাঁকে নিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করেছে, সেই ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে আত্মসমর্পন করেছেন। আর···। না, না, সত্যই তিনি তাঁর আগের মনটাকে হারিয়ে ফেলেছেন। হিন্দু যেন আজ সত্যই তাঁর চোখে কাফের। তিনি সুলতান। এ দেশ, মাটি, মসনদটা তাঁর অধিকারে। মালেক তিনি। মেহেরবান খোদার দুনিয়ায় একজন ভাগ্যবান।

তিনি গবাক্ষের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিলেন শূন্যে। দিন শেষের আকাশ। সন্ধ্যার ছায়া ঘনাচ্ছে। অন্ধকারের ওড়নাটা ধীরে ধীরে গ্রাস করছে প্রকৃতি। অন্যদিন এসময় প্রাসাদে ফিরে যান তিনি। সন্ধ্যার নামাজ শেষ করে কোন দিন কুরাণ শরিফ পাঠ করেন, কোনদিনবা বেগমের সঙ্গে পাশা খেলেন। আজ কিন্তু কিছুই ভাল লাগলো না। চিন্তা, কী এক অশ্বস্তি যেন গ্রাস করেছে তাঁকে। তিনি হারিয়ে ফেলেছেন জীবনের চলার পথের ছন্দ। ভুল, মিথ্যা, আজন্মের বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটেছে যেন আজ, এই কিছুক্ষণ আগে। নিজের হাতে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছেন মানব ধর্মকে।

মনে পড়লো একখানা মুখ। সৌম্য শান্ত একটা মানুষের ছবি। দরবেশ নূরকুৎব্ আলম। সংসার ত্যাগী ফকির। কিন্তু···না, না, একি ভাবছেন তিনি। ইসলামের রক্ষককে নিয়ে একি তাঁর মন্দ চিন্তা। খোদার মর্জিই হয়তো এই। খোদা যা চান তাই তো করে আদমী। তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন কিছু করবার সাধ্য কোথায়?

খোদা আমাকে তুমি ক্ষমা কর। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে খোদা।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ অসহায় কণ্ঠে খোদার দরবারে তাঁর অন্তরের আকুতি জানালেন বারবার। বাইরে অন্ধকার আকাশের বুকে একটি দুটি করে একে একে ফুটে উঠল তারাগুলো।

নূরকুৎব আলমের কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ল। অনুরোধ জানালেন তিনি। বললেন, এ্যায়সা মৎ বলিয়ে জনাব!

জনাব কথাটা শাহজাদা সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের কানে কেমন যেন বেসুরো শোনাল। সরাবের পাত্রটা মুখের কাছে তুলে ধরেছিল সে। একবার মাত্র ঠোঁটে স্পর্শ করে নামিয়ে রাখল পাত্রটা। নেশায় আচ্ছন্ন মাথাটা কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল তার। আরক্ত চোখ দুটো তুলে অনেকক্ষণ দরবেশের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। মৃদু হাসি ফুটলো মুখে। বলল, কোই বুরা বাৎ তো নেহি বোলা ফকির সাহাব।

নেহি, নেহি।

তব্? তবে, তবে কেন এই প্রতিবাদ? চাতুরী! চাতুরী বৈকি। বড় চতুর খোদার পীর এই নূরকুৎব্ আলম। হয়তো ভেবেছিলেন, তাঁর চাতুরীটুকু ধরতে পারবে না শাহজাদা সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ। একটা সরাবী মানুষ যখন নেশায় মত্ত, তখন সাধ্য কী তার বিচার বুদ্ধি বিবেচনার? সে তো তখন একটা বুদ্ধু বনে গেছে। চিন্তাশক্তি হারিয়ে বসে আছে। একটা খেলার পুতুলে পরিণত রয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কী তাই? সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ কী সত্য সত্যই একটা খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছে? দরবেশ নূরকুৎব্ আলমের খেলার পুতুল? যেমন ইচ্ছা খেলাবে তাকে দরবেশ। সে শুধু খেলবে?

তাতো হবে না। পারবে না সৈফুদ্দীন। কথাটা শুনেই ভীষণ ভাবে চমকে উঠেছিল সে। আতঙ্ক বিস্ময়ে সে যেন তার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলছিল। ভাবতে পারছিল না সে জিন্দা আছে। একজন

দরবেশ, খোদার অকৃপণ করুণা যাঁর ওপর সদা বর্ষিত হয়, যিনি সংসারত্যাগী, অথচ সংসার এবং মানুষের কল্যাণ কামনা করেন, সমাজকে পরিচালিত করেন সঠিক পথে, সে-ই তিনি এমন কথাটা বলতে পারলেন, অকম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন সুলতানের মৃত্যু সংবাদ। সুলতানকে আর জিন্দা রাখা উচিত নয়।

সন্ধ্যার অন্ধকারটা ঘনাবার সঙ্গে সঙ্গেই সরাবের পাত্র হাতে তুলে নিয়েছিল সৈফুদ্দীন। খোজাটাকে ডেকে বলেছিল, ওদের ডাক!

তবু দাঁড়িয়েছিল খোজাটা। যদিও সে বুঝতে পেরেছিল কাদের ডাকতে হবে। কারণ প্রতিদিন সে-ই ডাকতে যায় ওদের। শাহজাদার বিলাস-সঙ্গিনী ওরা। কিন্তু কাকে ডাকতে হবে, সেটুকু না জানা পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। বড় খেয়ালী শাহজাদা সৈফুদ্দীন। ক্ষণে ক্ষণে মন মর্জি বোঝা ভার। ভয়ের কোন কারণ হয়তো নেই, কিন্তু অযথা তিরস্কার সহ্য করতে হয়। সেইজন্মেই চুপ করে দাঁড়িয়েছিল সে।

সৈফুদ্দীন দেখেছিল তা। হঠাৎ মনটা তার বিরূপ হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, এই বুদ্ধু, তুম্‌কো ক্যা বোলা?

উ লোককো বোলানে বোলা। ভয়ে ভয়ে উত্তর দিয়েছিল খোজাটা।

তব্ যাতা নেহি কিঁউ?

লেকিন মালিক, কিস্‌কো বোলায় গা?

সত্যি কথা। চিন্তা করেছিল সৈফুদ্দীন। বলেছিল, জুবেদা বিবিকো বোলাও।

চলে গিয়েছিল খোজাটা। একটু পরেই দ্বারপথে উঁকি দিয়েছিল একখানি সুন্দর মুখ। এক ইরানী কন্যা। অনেকগুলো আসরফি ব্যয় করে ওকে সংগ্রহ করেছে সৈফুদ্দীন। সংগ্রহ করেছিল ওকে ভোগ করবে বলে। কারণ ওর সুন্দর সুঠাম দেহটা অফুরন্ত

যৌবন কামনার আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল তার মনে। ইরানী বণিকের দল প্রথম দিন ওর ওড়না-ঢাকা মুখের আবরণটা একমুহূর্তের জন্যে সরিয়ে দিয়ে জানতে চেয়েছিল, ক্যা মালিক, পসন্দ হুয়া ?

সৈফুদ্দীন কথা বলতে পারেনি। কেমন যেন শিহরণ অনুভব করেছিল দেহে মনে। বার বার ইচ্ছা করেছিল ওর সুন্দর মুখখানা আর একবার দেখে—আর একটি বার।

বণিকের দল তাদের প্রাপ্য নিয়ে চলে গিয়েছিল। শাহজাদা সৈফুদ্দীনের হারেমে স্থান পেয়েছিল আর একটি ফুটন্ত গোলাপ। সত্যই তাই। পাগল হয়েছিল সৈফুদ্দীন। ওর দেহটা তাকে পাগল করেছিল। ওর বিস্ময়কর যৌবন যেন কোন শিল্পীর সৃষ্টি। পেয়েছে পরিচয়। জেনেছিল সব কথা। ওর হারিয়ে যাওয়া সম্মানের দিনগুলো। ওকে বুকে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল। নিজের হাতে মুছিয়ে দিয়েছিল আঁখির অশ্রু। বলেছিল, তুমি যদি ফিরে যেতে চাও, আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারি জুবেদা!

মুক্তি! ম্লান হয়েছিল জুবেদার কণ্ঠ। বলেছিল, আজ আর আমার মুক্তির কোন মূল্য নেই শাহজাদা। আজ আপনি যদি আমাকে মুক্তি দেন, ফিরে হয়তো যাব, কিন্তু যা একবার হারিয়ে গেছে, তাতো আর কোনদিন ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। তার চেয়ে এই আমি বেশ আছি শাহজাদা, ভাল আছি। আমার নসিবে যদি থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি সুখী হব, শান্তি পাব।

জুবেদা ?

দয়া করুন শাহজাদা, আমাকে আপনি ত্যাগ করবেন না। জুবেদার কণ্ঠে কান্নার সমুদ্র উথলে উঠেছিল যেন।

ওকে আরো গভীর করে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ছিল সৈফুদ্দীন। বলেছিল, আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই জুবেদা, একদিন তোমার যৌবনে পরিপূর্ণ দেহটা আমার দেহে মনে কামনার আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল। হিংস্র পশুর মত কটা দিন রাত্রি

সমানে তোমার দেহটাকে নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করেছি। তোমার যৌবনটাকে খতম করে দিতে চেয়েছি। জান, এমনও মনে হয়েছে আমার, তোমাকে আমি খতম করে দিই। নিজের হাতে গলা টিপে শেষ করে দিই তোমায়। দিতেও গিয়েছি ক'বার। তোমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে তোমার কণ্ঠটা বেষ্টন করেছি এই হাতে। কিন্তু পারিনি। যন্ত্রণায় এতটুকু কাতরোক্তি না করে তুমি তোমার সুন্দর চোখ দুটি তুলে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছো। তোমার চোখের নীরব ভাষা যেন আমাকে বলেছে, দাও, দাও, আমাকে শেষ করে দাও। আমিতো এই যন্ত্রণার, লজ্জার হাত থেকে মুক্তি চাই। তুমি আমায় দয়া করো, মুক্তি দাও। চমকে উঠেছি আমি। সরিয়ে নিয়েছি হাত। তুমি তেমনি চোখের দৃষ্টিতেই যেন জানতে চেয়েছো, কী হল, পারলে না? সত্যিই আমি তোমাকে ভালবাসি জুবেদা। আমার মনপ্রাণ তোমাকে চায়। একমাত্র তোমাকেই।

নিজেকে যেন জুবেদার হাতে সমার্পন করেছিল সৈফুদ্দীন। দুটি হৃদয় এক হয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল সব কিছু। ভুলে ছিল সরাব। কিন্তু তা কি হয়? হয় না। হলও না। খেয়ালী মানুষটার পরিবর্তন এল আবার। জুবেদাকে ভুলল না, কিন্তু ভুলে যাওয়া সরাবের পাত্র আবার কাছে টেনে নিল। ডাক দিল সুন্দরীর দলকে। ঠিক এমনি সময় এলেন নূরকুৎব্ আলম। নতুন কথা শোনালেন। বিশ্বাস করতে পারল না সৈফুদ্দীন। কঠিন কথা বলে হটিয়ে দিতেও পারল না। নাছোড়বান্দা দরবেশ তাকে ছাড়লেন না।

আজ মনটা ভাল নেই তার। কী এক অজানা আতঙ্ক যেন সমস্ত দিনটা তাকে ঘিরে আছে। গ্রাস করতে চাইছে। সরাবের পাত্রটা তুলে নিয়ে অনেক দিন পরে মনে পড়েছিল জুবেদার কথা। খোজাটাকে তাই ডাকতে বলেছিল ওকে।

জুবেদা এসে প্রশ্ন করেছিল, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন শাহজাদা ?

হ্যাঁ জুবেদা। বলেছিল সৈফুদ্দীন। আজ সমস্ত দিন কেবল তোমার কথাই মনে হয়েছে আমার। তুমি কেমন আছ জুবেদা ?

হেসেছিল সে। বলেছিল, আপনার মেহেরবানীতে বাঁদী বেশ ভালই আছে শাহজাদা।

সাচ্ ?

সত্যি। জুবেদা হেসেছিল আবার।

সৈফুদ্দীন চিন্তিত হয়েছিল। একটুক্ষণ নীরব থেকে কী যেন ভেবেছিল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, অথচ আমি ভাল থাকতে পারছি না। থাকতে চাই, লেকিন, ভাল থাকতে দেওয়া হচ্ছে না আমাকে।

কেন ?

কী জানি। হয়তো আমার মনের ভুল। কিংবা আমি কী চাই তা নিজেই জানি না। একদিন মনে হয়েছিল, জিন্দেগীটা শুধু মাত্র ভোগের জন্যে। লেকিন, আজ আর তাও ভাল লাগে না। সরাবে বেশ নেশা হয় না আর। অথচ না খেয়েও পারি না।

কেন ?

কেন, তাও জানি না। যেন খেতে হয় বলেই খাই।

কে বললে ?

কেউ বলে নি, আমার মনে হয়েছে। কেন জান মনে হয়েছে, দিন রাত্রি অখণ্ড অবসর। কোন কাজ নেই। আমি একা। আমাকে একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে, তাই।

ওঃ। চুপ করে ছিল জুবেদা। প্রশ্ন করেনি। আর কিছু জানতে চায়নি সে। খেয়ালী একটা মানুষ। কী যে করে, কেন করে, তা বোধহয় নিজেই জানে না। উপলব্ধি করতে পারে না।

অথচ জুবেদা দেখেছে, অনেক দিন লক্ষ্য করেছে, দীর্ঘ কটা বছর। ওই অস্থির মানুষটা, যে মানুষটার মধ্যে এখনও যৌবন-শক্তি অটুট—প্রাচুর্যের মধ্যে কেমন যেন অসহায়, ব্যক্তিত্বহারা।

সৈফুদ্দীন ডেকেছিল, জুবেদা!

বলুন।

একটা শের শোনাবে জুবেদা? অনেক দিন তোমার মুখে কোন শের শুনিনি। শোনাবে?

ঘাড় নেড়ে ছিল জুবেদা। শুনিয়েছিল ঃ

উড়তে উড়তে আস কা পঞ্জী
দূর উফখ মে ডুব গয়া
রোতে রোতে বৈঠ গয়ি
আওয়াজ কিসি সওদাই কি।

আমার পাখি উড়তে উড়তে দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল। ডাকব যে সে শক্তিও নেই। কেন না, কাঁদতে কাঁদতে আমি পাগল হয়ে গেছি। আর পাগলের আওয়াজ একেবারে বসে গেছে, কণ্ঠে তার কোন শব্দই নেই।

শেরটা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো সৈফুদ্দীন। একসময় একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। তার মৃদুকণ্ঠটা শোনা গেল, সত্যি এমনই হয় জুবেদা।

না, না।

আমি জানি জুবেদা। আমি বুঝতে পারি। আমাকে অনেক ডেকেছ তুমি, অনেকদিন। আমি শুনতে পাইনি। না, না, শুনতে পেয়েছিলুম ঠিকই। সাড়া দিইনি ইচ্ছা করেই। কারণ সাড়া দিলে ফিরে যেতে হয়, ধরা দিতে হয়। মন যে নিত্য নতুনের প্রত্যাশী। এক খেয়ালী জীবন বড় ক্লান্তিকর। তাই আমরা নিত্য নতুনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই। আমরা···

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল সৈফুদ্দীন। দ্বারের পাশে একটা

ছায়া স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ আছে জানে না সে। প্রশ্ন করেছিল, কৌন্ হো?

কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। লক্ষ্য করেছিল, একটু যেন নড়ে উঠল ছায়াটা। বান্দা হলে সাড়া দিত নিশ্চয়ই। তবে কে? নূরকুৎব আলম? একমাত্র তিনিই তার হারেমে প্রবেশের অধিকার পেয়েছেন। বৃদ্ধ দরবেশ, তাঁকে বাধা দিয়ে কী হবে?

আবার জানতে চেয়েছিল, কে আপনি?

এবার মুখ বাড়িয়েছিল ছায়া। নূরকুৎব আলমই বটে।

সৈফুদ্দীন বলেছিল, আপনি?

হ্যাঁ শাহজাদা।

লেকিন...

জরুরী কথা আছে। যদি বলেন তো...

জুবেদাকে চলে যেতে বলেছিল সৈফুদ্দীন। সে চলে গেলে দর বেশের দিকে চেয়ে জানতে চেয়েছিল, এবার বলুন আপনার বাৎ কী?

নূরকুৎব আলম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেননি। ভাল করে সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দিক দেখে নিয়ে ছিলেন। তারপর সৈফুদ্দীনের মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছিলেন, মসনদটা আপনি চান শাহজাদা?

মসনদ! কথাটা যেন বুঝতে পারে নি সৈফুদ্দীন। দরবেশের প্রশ্নের ধরণে একটু যেন বিস্ময় জেগেছিল তার। বলেছিল, আপনার কথাটা আমি বুঝতে পারছি না ফকির সাহাব। তাছাড়া এখন মসনদ আব্বাজানের। সুলতান তিনি। লেকিন, একদিন আমিই সুলতান হব। মসনদ না চাইবার কারণ কী?

আছে! হেসেছিলেন বৃদ্ধ দরবেশ। বলেছিলেন, আমার মনে হয় মসনদটা আপনি পাবেন না। কারণ...

কী?

ওটা বোধহয় কাফেরটা ছিনিয়ে নেবে। আমি জানি, সে নেবেই।

সৈফুদ্দীনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল। কে কাফের, মসনদটা সে কেন ছিনিয়ে নেবে, তার কিছুই বুঝতে পারছিল না। কেমন যেন ওলোটপালট হয়ে যাচ্ছিল সব কিছু।

এ সব কী বলছেন আপনি ফকির সাহাব?

সাচ্ বাৎ শাহজাদা। গম্ভীর হয়েছিলেন নূরকুৎব আলম। বলেছিলেন, সুলতান কাফেরটাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলেন। আমি তাকে বন্দী করতে বলেছিলুম। লেকিন, সুলতান আমার কথা শুনলেন না। আমাকে স্পষ্ট বললেন, দোস্তের সঙ্গে বেইমানী তিনি করবেন না।

আপনি কার কথা বলছেন?

বুঝতে পারছেন না?

না। মাথা নেড়েছিল সৈফুদ্দীন। সত্যই সে বুঝতে পারেনি।

নূরকুৎব আলম বলেছিলেন, আমি গনেশের কথা বলছি শাহজাদা। সুলতান বিলকুল কাফেরগুলোকে দরবার থেকে হটিয়েছেন। লেকিন, অনেক বলেও দোস্তকে হটাতে চাননি। আজ সেই দোস্ত তাঁর মুখের ওপর বলে গেল, বেইমানের নোক্‌রী সে করবে না। সুলতান ছেড়ে দিলেন তাকে।

গনেশ নারায়ণ আমির-ই ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন? সৈফুদ্দীনের কণ্ঠে যেন বিস্ময়।

হ্যাঁ শাহজাদা। হাসলেন নূরকুৎব আলম। বললেন, লেকিন, সে আবার আসবে। কাফেরগুলোর জন্যে দিলে বড় দর্দ। সে এবার চাইবে সুলতানকে হটিয়ে নিজেই সুলতান হতে। আর সে যদি আসে, সুলতান নিশ্চয়ই বিনা যুদ্ধে তাকে মসনদটা ছেড়ে দেবেন।

না, না। যেন প্রতিবাদ জানালে সৈফুদ্দীন।

নূরকুৎব আলম কয়েক মুহূর্ত শাহজাদার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। সৈফুদ্দীনের মুখখানা পাংশু। বললেন, কাফেরগুলোকে আমি চিনি শাহজাদা।

সৈফুদ্দীন কথা বলল না। সামনে রাখা সরাবের পাত্রটা টেনে নিল সে। পান করলে। সে যেন বড় অসহায়। কেউ নেই তার। সুলতানী স্বপ্ন শেষ।

নূরকুৎব আলম মৃদুকণ্ঠে ডাকল, শাহজাদা!

সৈফুদ্দীন তাঁর মুখের দিকে চাইল। অসহায় কণ্ঠে বলল, বলুন?

কথাটা বললেন নূরকুৎব আলম। কণ্ঠটা তাঁর এতটুকু কাঁপল না। কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভাবে চমকে উঠল সৈফুদ্দীন। একি বলছেন ফকির সাহাব! না না, অসম্ভব। সে তা পারবে না। মসনদ তার চাই না। সুলতানীতে কোন প্রয়োজন নেই।

সৈফুদ্দীন বসে আছে। চিন্তা করছে। একের পর এক তুলে নিচ্ছে সরাবের পাত্র। উঠে দাঁড়ালেন নূরকুৎব আলম। বললেন, আমি তাহলে যাই শাহজাদা!

চলে যাচ্ছেন? দ্বিধাগ্রস্থ কণ্ঠে কথাটা জানতে চাইল সৈফুদ্দীন।

নূরকুৎব আলম হাসলেন। বললেন, দেশটা হিন্দুর। একদিন মসনদটা তাদেরই ছিল। আপনি আমি কেউ নই, কোন অধিকার নেই আমাদের। যাদের দেশ, তারা যদি আমাদের হাত থেকে আবার তা কেড়ে নেয়, তাহলে আমাদের দুঃখ করা উচিত নয়। যাদের দেশ, তাদের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত।

আমরা কোথায় যাব?

তা জানি না। আমাদের নসিবে খোদা যা লিখে দিয়েছেন তাই ঘটবে। হিন্দুরা নিশ্চয়ই এটুকু দয়া আমাদের করবে, নিশ্চয়ই তারা আমাদের এদেশের মাটি ছেড়ে চলে যেতে বলবে না। বাকী জিন্দেগীটা তাদের দরজায় ভিক্ষা করে কেটে যাবে।

না, না। যেন আঁতকে উঠল সৈফুদ্দীন।

হাসলেন নূরকুৎব, বললেন, হ্যাঁ শাহজাদা। আমাদের তাই করতে হবে। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ নিশ্চয়ই দোস্তের হাতে তুলে দেবেন মসনদটা।

আমি দিতে দেব না। যেন চিৎকার করে উঠতে চাইল সৈফুদ্দীন।

আপনি! একটু যেন হাসি দেখা দিল নূরকুৎব আলমের ওষ্ঠে। বললেন, আপনার একার পক্ষে তা কী সম্ভব শাহজাদা?

আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

আমি? না, না, শাহজাদা। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমি কী করতে পারি? আমি যে ফকির শাহজাদা?

ফকির! শাহজাদা সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের ওষ্ঠে একটু ম্লান হাসির রেখা ফুটেই মিলিয়ে গিয়েছিল। নূরকুৎব আলমকে একটা পাকা বদমাস বলে মনে হয়েছিল তার। বৃদ্ধ শয়তানটা যেন পরীক্ষা করছে তাকে। যদি সে উত্তীর্ণ হতে না পারে, তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কেউ···। কথাটা চিন্তা করতে পারেনি সে। অনেক দিনের সন্দেহটা আজ সত্যের রূপ নিয়েছিল। দরবেশ আজ সমস্ত দিকেই প্রস্তুত হয়েছে। হয় সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ, নয়তো অন্য কেউ। বৃদ্ধ সুলতানের ইন্তেকাল আসন্ন। সেইজন্যেই উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীদের অপসারিত করেছে। যদি তারা সুলতানের পক্ষাবলম্বন করে, বাধা দেয়। সে বাধা যখন অপসারিত, তখন কেউ না কেউ মসনদে বসবে। সে হবে নতুন সুলতান। আর সে? কথাটা চিন্তা করতে পারে না। ভয় হয়েছিল তার। মনের মধ্যে সুলতানীর লোভটা জেগে উঠেছিল। মসনদটা তার চাই-ই। সে সুলতান বানতে চায়। তার জন্যে যে কোন মূল্য দিতে সে প্রস্তুত। বলেছিল আমি জানি, ফকির সাহাব, আপনি অনেক কিছুই করতে পারেন। আমি জানি, আমার আব্বাজান সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের চেয়েও আপনার কথার মূল্য আজ অনেক বেশি।

আপনি ইচ্ছা করলে এখন এই মুহূর্তে যাকে ইচ্ছা মসনদে বসাতে পারেন। সে ক্ষমতা আপনার আছে।

তোবা, তোবা! দুই কানে হাত চাপা দিয়েছিলেন নূরকুৎব আলম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, এ্যায়সা মৎ বলিয়ে জনাব।

জনাব? শাহজাদা সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ জনাব! দরবেশ প্রধান নূরকুৎব আলম তাকে সুলতান বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। আর কী চাই? কিছু না, কিছু না। কিন্তু কেমন যেন কষ্ট হল তার। একটু যেন যন্ত্রণা অনুভব করল। আব্বাজানের মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সামনে। স্নেহময় আব্বাজান তার। একটি দিনের জন্যেও যিনি দুঃখ দেননি, অবিচার করেননি। সেই তাঁকেই কী না···

কথাটা ভাবতে পারল না সৈফুদ্দীন। তার সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। নামিয়ে রাখা সরাবের পাত্রটা আবার তুলে নিয়ে পান করল সে।

নূরকুৎব আলম ডাকলেন, শাহজাদা।

সৈফুদ্দীন নীরবে তাঁর মুখের দিকে আরক্ত চোখ দুটো মেলে তাকাল। কথা বলল না।

নূরকুৎব আলম বললেন, আমি অনেক চিন্তা করেছি শাহজাদা। আপনি হয়তো ভাবছেন, এ আমার চাতুরী। লেকিন, বিশ্বাস করুন, এতে আমার এতটুকু স্বার্থ নেই। ইসলামকে বাঁচাতে হলে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আপনি যদি ধর্মকে ভালবাসেন, কাফেরের হাতে ধর্মের লাঞ্ছনা যদি দেখতে না চান, তাহলে মসনদে বসুন। খোদা আপনার ভাল করবেন।

লেকিন···

বলুন, শাহজাদা।

না, বলল সৈফুদ্দীন। যা বলতে চেয়েছিল বলা হল না তার।

মসনদ, সুলতানী—দুটোই তো তার কাম্য। সৌভাগ্য যখন নিজে যেচে হাত ধরতে চাইছে, তখন কেন সে হাত গুটিয়ে থাকবে? থাকবে না। মসনদটা তার চাই-ই। সেও সুলতান বানতে চায়। খোদা যখন তার ভাল করবেন, দরবেশ যখন বলছেন সে কথা, তখন আর ভয় কী তার। সে ভাববে না। মিথ্যা চিন্তা মনে স্থান দেবে না। সে এগিয়ে যাবে। ধর্মকে রক্ষা করবে। যদি প্রয়োজন হয়, কাফেরগুলোকে চিরদিনের মত খতম করে দিতেও দ্বিধা করবে না।

সে প্রশ্ন করল, আমি কী করবো?

কিছু করতে হবে না আপনাকে। আপনার কোন কাজ নেই। আপনি চুপচাপ বসে থাকুন।

বসে থাকবো?

হ্যাঁ। হাসল নূরকুৎব আলম। বললেন, আপনি যাতে বদনামী না হন, সে দায়িত্ব আমার।

সাচ্?

আপনি দেখবেন। হাসলেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি চলি শাহজাদা।

উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। দাঁড়ালেন না। তিনি চলে গেলেন।

বসে রইল সৈফুদ্দীন। সামনে সরাবের পূর্ণপাত্র। নিজের হাতেই ভরে নিয়েছিল। কিন্তু তুলে নিল না আর। যে সরাব তার অতি প্রিয়, কেমন যেন বিতৃষ্ণা জাগল এখন। খোজাটাকে ডাকল। সে আসতে বলল, এগুলো নিয়ে যা।

নিয়ে যাব! অবাক কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল যেন সৈফুদ্দীন। বলল, আর শোন, ওদের ডেকে দে। সব কোইকো। না না, ডাকতে হবে না। আমিই যাচ্ছি।

উঠে দাঁড়াল সৈফুদ্দীন। তার পা টলছে। মাথাটা দুলছে। সেই অসহ্য যন্ত্রণাবোধটা মুছে যায়নি। এখন বুকের মধ্যেও কেমন যেন যন্ত্রণা অনুভব করল সে। কিন্তু তার মনে হল, এ যন্ত্রণা আনন্দের, উত্তেজনার। সে সুলতান বানছে। আজ কিংবা কাল, দু'চার রোজ পরেই হয়তো! হারেম, মসনদ, এ দেশটা—মানুষ-গুলোও তার অধিকারে। মালিক সে। তার যা ইচ্ছা সে তাই করবে। কারো কথা শুনবে না। কেউ তাকে আদেশ জানাবার থাকবে না। তখন···

টলতে টলতে সে জেনানা মহলের অন্দরের দিকে এগিয়ে গেল।

খোজাটা দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। দেখল। কিছুই ভাবতে পারল না সে।

সেই রাত্রি!

পাণ্ডুয়ার পথে দুই অশ্বারূঢ় মূর্তি এগিয়ে চলেছেন নিঃশব্দে। দুজনেই নীরব। একটিও কথা বলছেন না তাঁরা। একজনের মনে অনেক কথার পাহাড় জমে আছে। ক'বার কথা বলার চেষ্টাও করেছে সে। কিন্তু অন্যজন সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কথার উত্তর দেননি। যেন শুনতে পাননি তিনি।

গণেশ নারায়ণ শুধু চিন্তিত নন, কিছুটা বিচলিতও যেন। কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। চিরদিনের মত পাণ্ডুয়া ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন তিনি। হয়তো এ জীবনে আর এখানে ফিরে আসা হবে না। সম্পর্ক শেষ। কত শত স্মৃতি মুছে যাবে মন থেকে। তাঁর স্বপ্নের পাণ্ডুয়া তাঁকে হয়তো ভুলে যাবে।

পাণ্ডুয়া তাঁকে চেনে। চেনে পাণ্ডুয়ার মানুষ। তিনি সবার অতি পরিচিত ছিলেন। পাণ্ডুয়ার প্রতিটি গৃহদ্বার ছিল তাঁর কাছে মুক্ত, অবারিত। সেই পাণ্ডুয়া হারিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে মানুষ।

তিনি ভাবছিলেন। অতীতটা ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত হয়ে উঠছিল তাঁর

মনে। পিতার হাত ধরে একটি বালক এসেছিল পাণ্ডুয়ায়। উদ্দেশ্য ফরাসী শিক্ষা।

পিতার এক বাল্য-বন্ধুর গৃহে স্থান হয়েছিল। নিঃসন্তান দম্পতী আদরে টেনে নিয়েছিলেন বুকে। তাঁদেরই ভৃত্য ব্রজ হয়েছিল অবসর সঙ্গী। পিতাই বন্ধুর গৃহকর্মে নিযুক্ত করিয়েছিলেন তাঁকে।

ব্রজ তাঁর রক্ষী হয়েছিল। অবসর সঙ্গীও। কিন্তু অবসর তাঁদের ছিল না। অবসরের দিনগুলোতে পাণ্ডুয়ার পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন তাঁরা। পাণ্ডুয়ার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। মনে প্রাণে ভালবেসেছিলেন দেশটাকে। সেইজন্যেই একদিন, যেদিন শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ মসনদে বসে পাণ্ডুয়ায় আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন, সেদিন সত্যবতীকে ছেড়ে দূরে চলে আসতে কষ্ট হলেও ভাতুড়িয়ার জন্যে এতটুকু কষ্ট হয় নি। কারণ মনে প্রাণে তিনি যে ভালবেসেছিলেন পাণ্ডুয়াকে। পাণ্ডুয়ার আকাশ মাটি বনানী প্রান্তর এক অচ্ছেদ বন্ধনে বেঁধে ফেলেছিল তাঁর মনটাকে, কী এক মায়ায় যেন ভুলিয়ে দিয়েছিল।

সেই মায়া আজ কাটাতে হল। কাটাতে বাধ্য হলেন তিনি কারণ অন্যায় আর অসত্যকে ঘৃণা করেন। প্রাণের চেয়েও ধর্ম তাঁর কাছে অনেক মূল্যবান। সুলতান যদি নির্বিচারে হিন্দুদের বধ করতেন, হয়তো তা সহ্য করতেন। কারণ তিনি জানতেন, বিশ্বাস করতেন, সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ কোন অন্যায় করতে পারেন না। অন্যায়কে তিনিও তাঁরই মত ঘৃণা করেন। কিন্তু সেই বিশ্বাস যে কত ভুল মিথ্যা প্রমাণিত হল একদিন। তবু তিনি চেষ্টা করেছিলেন। ভুল মানুষ-ই করে, সে ভুলের সংশোধনও আছে। কিন্তু অন্যায়ের কোন ক্ষমা নেই। সুলতানকে ফেরাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অন্ধ। চক্রান্তকারী মোল্লার দল তাঁকে শয়তানে পরিণত করেছে। তাঁর মন থেকে মুছে গেছে শুভবুদ্ধির শেষ চিহ্নটুকু। মৃত্যু ঘটেছে মনুষত্বের।

তবু কষ্ট হল তাঁর। সুলতানের জন্যে নয়, পাণ্ডুয়ার জন্য। পাণ্ডুয়া তাঁর জীবনের স্বপ্ন। তবু তাঁকে যেতে হবে। জীবনে যে ব্রত গ্রহণ করেছেন, হিন্দুর ধর্ম রক্ষার প্রতীজ্ঞা তিনি ব্যর্থ হতে দেবেন না। আপন স্বার্থ আজ তাঁর কাছে মূল্যহীন। আজ যদি পিতৃবন্ধু বেঁচে থাকতেন, হাত ধরতেন তাঁর, তবুও তিনি আর একটি দিনও পাণ্ডুয়ায় থাকতে পারতেন না। সেইজন্যেই ব্রজকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করেছেন স্বদেশের পথে। দিনের আলোয় পাণ্ডুয়া হয়তো পথ আটকাতো তাঁর। মিনতি জানাতো থাকবার।

মধ্য রাত্রির ম্লান জ্যোৎস্নাভরা আকাশের দিকে চোখ মেলে চাইলেন তিনি। চাপ চাপ মেঘের আস্তরণ। বিকালে আকাশ কাল করে এসেছিল। মনে হয়েছিল ঝড় উঠবে। কিন্তু ঝড় ওঠেনি। মেঘ কেটে গিয়েছিল। এখন দেখলেন মেঘ কাটেনি। সমস্ত আকাশ জুড়ে জমাট বেঁধে আছে। ঝড় উঠবেই!

নিজের অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। মনে মনে তিনিও যেন উচ্চারণ করলেন কথাটা, ঝড় উঠবেই।

অন্ধকারে ব্রজর গলাটা শোনা গেল। মৃদুকণ্ঠে সে ডাকল, বড় মশায়!

এবার সাড়া দিলেন তিনি। ওর ডাকে ফিরে চাইলেন। বললেন, কী রে?

একটা কথা বড় মশায়।

বল না।

আমরা আর এখানে ফিরবো না তো?

ফিরবেন না, আর কোনদিনই ফিরবেন না তিনি। কিন্তু কথাটা বলতে পারলেন না ব্রজকে। বললে, কী জানি?

উত্তরটা শুনে ব্রজও আর কিছু জানতে চাইল না। গভীর রাতে পাণ্ডুয়ার পথে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল তাদের অশ্ব দুটি। তাঁরা আবার চুপচাপ পথ অতিক্রম করতে লাগলেন।

পাঁচ

পদ্মনাভ হাসলেন। তাঁর শান্ত সুন্দর সৌম্য মূর্তিটি বড় উজ্জ্বল হয়ে উঠল সেই মুহূর্তে। গণেশ নারায়ণ চেয়ে চেয়ে দেখলেন অনেকক্ষণ। বিষ্ণু ভক্ত এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বড় ভাল লাগে তাঁর। যখনই সময় পান ছুটে চলে আসেন। পায়ের কাছে বসে বেদ পুরাণের গল্প শোনেন। আজ নয়, এ তাঁর দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। অনেক দিন আগে সেই পাঠ্যাবস্থায় যখনই পাণ্ডুয়া থেকে দেশে ফিরতেন, তখনই প্রতিদিন মধ্যাহ্ন আহারের পরেই চলে আসতেন। এসে হয়তো দেখতে পেতেন তিনি তখনও অভুক্ত, আহারের কোন আয়োজনই করেন নি। অভিমান জাগতো তাঁর, কখনো বা রাগ করতেন। হাসতেন ব্রাহ্মণ।

সংসারে একলা মানুষ। স্ত্রী বহুদিন পূর্বে গত হয়েছেন। একমাত্র পুত্র থাকে নবদ্বীপে। সেখানে শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী সে। ব্রাহ্মণের দিন কাটে বিষ্ণু সেবায়, তাঁর নাম-গানে। সব ভুলে যান তিনি। জগৎ সংসার সব কিছু।

গল্প শোনার আশায় ছুটে আসতেন তিনি। এসে দেখতেন, ব্রাহ্মণ তখনও অভুক্ত। রাগ করতেন। হাসতেন পদ্মনাভ। সরল সুন্দর হাসিতে মুখখানি ভরে যেত তাঁর। কখনো না গেলে নিজেই ছুটে যেতেন।

আজ সে সাধ্য নেই। বৃদ্ধ হয়েছেন। অশক্ত হয়ে পড়েছে শরীর। চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কিন্তু হাসিটি তেমনি অম্লান, মধুর।

হাসলেন তিনি। হাসলেন তাঁর কথা শুনে। চণ্ডীভক্ত গণেশ নারায়ণকে কিন্তু আঘাত দিলেন না। বললেন, নারায়ণ, তোমার

চণ্ডী কিংবা দুর্গা দুজনেই এক এবং অভিন্ন। কেউ কারো চেয়ে ছোট বা বড় নন। শাস্ত্রবাক্য যদি আমরা অনুধাবন করি, তাহলে দেখতে পাব, ঈশ্বর এক। ঈশ্বরীশক্তি সম্বন্ধে মানুষের ধ্যান-ধারণা যেন দুর্গার পরিকল্পনায় এসে প্রায় সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। কে এই দুর্গা? এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপি যে শক্তির লীলা আমরা প্রকট দেখছি—যার আদি নেই, অন্ত নেই, চিন্তার অতীত যা, সেই সর্ব ব্যাপিনী নিত্যা চৈতন্যশক্তিই দুর্গা!

একটু নীরব রইলেন তিনি। ক্ষীণ দুই চোখের দৃষ্টি মেলে একবার গণেশ নারায়ণের মুখের দিকে চাইলেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন ঃ

আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারিণী।
দয়া নিদ্রা চক্ষুতৃপ্তিঃ তৃষ্ণা শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ॥
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা শান্তির্লজ্জাধি দেবতা হিযা।
বৈকুণ্ঠে যা মহাসাধ্বী গোলকে রাধিকা সতী॥
মর্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা সতী হি যা।
যা বাণী যা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা॥
বহ্নৌ যা দাহিকাশক্তি প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে।
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা॥
শস্য প্রসূতি শক্তিশ্চ ধারণা হি ধরাষু যা।
ব্রাহ্মণ্যশক্তির্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ যুরেষু চ॥
তপস্বিনাং তপস্যা চ গৃহিণাং গৃহ দেবতা।
নৃপাণাং রাজ্যলক্ষ্মীঃ যা বণিজাং লভ্যরূপিণী॥
পারে সংসার সিন্ধুনাং এয়ী দুস্তর তারিণী।

একটু থামলেন তিনি। হাসলেন। বললেন, গণেশ, তিনি আদ্যা, নারায়ণী শক্তি; তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী। দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, লজ্জা—এই সকলের অধিদেবতা তিনি। তিনি ক্ষীরোদে মর্তলক্ষ্মী, তিনি

দক্ষকন্যা সতী। তিনি স্বরস্বতী, তিনি সাবিত্রী, তিনি বিপ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী। অগ্নিতে দাহিকাশক্তি তিনি, সূর্যে প্রভাবাশক্তি, পূর্ণ-চন্দ্রে শোভাশক্তি, জলে শৈত্যশক্তি—সকলই তিনি। শস্য প্রসবিনীশক্তি তিনি, ধরায় ধারণাশক্তি তিনি, তিনিই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যশক্তি, সুরের দেবশক্তি। তপস্বীদের তপস্যা, গৃহীদের গৃহ দেবতা, রাজাদের রাজ্যলক্ষ্মী, বণিকদের লভ্যরূপিণী। দুস্তর ভবসিন্ধু পার হ'তে যে ত্রিবেদ, তাও তিনিই।

চুপ করলেন তিনি। নীরব রইলেন।

একটু যেন লজ্জিত হলেন গণেশ নারায়ণ। মৃদুকণ্ঠে বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি। আমি···

বাধা দিলেন তিনি। হাসলেন। বললেন, না না, এতে তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই বাবা। লজ্জার কী আছে? কোন লজ্জা নেই। আমরা তো কেউই পরিপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে এ পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করি না। আমরা অজ্ঞান অবস্থাতেই মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হই, পৃথিবীর আলো দেখি। কেউবা আমরা আমাদের অনভ্যস্থ চোখে আলোর স্পর্শ পেয়েই চিৎকার করে কেঁদে উঠি, আবার কেউবা কাঁদতে ভুলে যাই। আমরা যারা কাঁদতে ভুলে যাই, তাদের যেমন করেই হ'ক কাঁদানো হয়। আমাদের অন্ধকার মনে আলোর স্পর্শ এনে দেওয়া হয়। আমরা জেগে উঠি। আমাদের চোখ, মন, সমস্ত সত্বা উন্মুখ হয়ে ওঠে। সমস্ত জীবন আমরা অজানার সন্ধানে ঘুরে বেড়াই, ছুটে বেড়াই। অজানাকে জানাই তো মানবের ধর্ম।

আবার চুপ করলেন তিনি। ক্ষীণ দৃষ্টি মেলে একবার তাঁর মুখের দিকে চাইলেন। প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল তাঁর মুখখানি।

গণেশ নারায়ণও বসে রইলেন নীরবে। বসে থাকতে বড় ভাল লাগল তাঁর। বিষ্ণুভক্ত এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের কাছে যখনই এসে বসেন, তখন সব কিছুই ভুলে যান তিনি। কী এক অদৃশ্য

শক্তি ব্রাহ্মণের কুঠীরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, জ্বালা মুহূর্তে দূর করে দেয়। মনে হয় সংসারে এমন শান্তি লাভের স্থান বুঝি আর কোথাও নেই। এত সুখ তিনি আর কোথাও গেলে পান না। মিথ্যা নয়, এ তাঁর মনের কথা। পদ্মনাভের শান্ত সুন্দর কুটীরটির জন্যে বার বার অন্তরটা তাঁর ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যে সংসারের তিনি মানুষ, সেখানে হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতা লোভের ছায়া নিয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। নির্লোভীকে লোভী করে তুলছে, হিংসা জাগছে সরল প্রাণে। ক্ষুদ্র স্বার্থে বৃহত্তর স্বার্থ ভুলছে মানুষ। আত্মচিন্তা, আত্মসুখ, অহংবোধ মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এক হতে দিচ্ছে না। একে অন্যকে ভাবতে পারছে না। ও আমার পর নয়, ও আমার আপন, ভাই বন্ধু পরম সুহৃদ। ও আমার আত্মার আত্মীয়। আকাশের নীচে মাটির পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আমরা সকলে এক, আমরা মানুষ।

কেউ পারে না, কেউ পারছে না। মানুষ মানুষকে করছে ঘৃণা। ক্ষমতার মদমত্ততায় উচ্চ নীচকে করছে ঘৃণা। সীমারেখা টেনে দিয়ে সৃষ্টি করছে ব্যবধানের প্রাচীর। ধনী নির্ধনীকে করছে পীড়ন। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণকে করছে অবজ্ঞা। অথচ কেউ একবারও চিন্তা করে দেখছে না, দেখার প্রয়োজনও অনুভব করছে না, এই সংসারে—মানুষের সৃষ্টি সমাজে সকলেরই প্রয়োজন আছে। এ সমাজ তো মানুষেরই। মানুষের সমাজে যদি মানুষের স্থান না হয়, ক্ষমতাসীন দল যদি দিনের পর দিন করে সমাজচ্যুত, সরিয়ে দেয় দূরে, তাহলে হিন্দু সমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। কারো সাধ্য হবে না হিন্দু সমাজকে টেনে তোলা, বাঁচিয়ে রাখা। উচ্চনীচের সংকীর্ণতা, ঘৃণা, অবজ্ঞায় এ সমাজের ধ্বংস হবেই।

কিন্তু তিনি তা চান না। সমাজকে অস্বীকার করে নয়, উচ্চনীচের ভেদ দূর করে, মানুষের অহেতুক ঘৃণা-অবজ্ঞার স্থান না

দিয়ে নতুন সমাজ গঠন করতে। তাঁর একমাত্র চিন্তা ধর্ম রক্ষা। হিন্দুধর্মের মাঝে এই যে শ্রেণীভেদ, উচ্চ-নীচের ব্যবধান, সমাজপতিদের নিষ্ঠুরতা দিন দিন সমাজটাকে করে তুলছে অসহায়, পঙ্গু। আজই এই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি মনে করেন, পরিবর্তন হওয়া উচিত। না হলে বিধর্মী মুসলমানের দল সুলতানের সহযোগিতায় মানুষগুলোকে ছিনিয়ে নেবে। দুর্বল করে তুলবে সমাজকে। হয়তো এমন একদিন আসবে···

না না। তা তিনি চিন্তা করতে পারেন না। ভয় হয় তাঁর। হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুরতা তাঁকে কাতর করে। মানুষের প্রতি মানুষের এই বিভেদ নীতি বুকে জ্বালা ধরায়।

আজ ক'মাস তিনি পাণ্ডুয়া ছেড়ে চলে এসেছেন। গ্রীষ্মের খরদাহ অনেকদিন বিদায় নিয়েছে। আজ আকাশের বুকে শরতের সোনালী রৌদ্র। মাঠে মাঠে সোনালী ফসলের স্বপ্ন সম্ভাবনা। ভাতুড়িয়ার পথে ঘরে ঘরে বেড়ালেন তিনি। মানুষ অবাক হল। যেন বিশ্বাস করতে চাইল না তাঁর কথা।

ব্রজ বলেছিল, বড় মশায়, ওদের আপনি পাবেন না।

কিন্তু ওদেরই যে আমি চাই ব্রজ। ওরা যদি আমার সহায় না হয়, তাহলে কিছুই সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।

কিন্তু ওরা যে চিরকাল মার খেয়ে এসেছে বড় মশায়।

আর যাতে মার না খায় তাই আমি চাই। ওরা হয়তো বিশ্বাস করতে পারছে না আমাকে। ছোট বড়র প্রশ্ন ওদের মনে বাধা সৃষ্টি করছে। সেই বাধা আমাকে অতিক্রম করতেই হবে। আমি ওদের মনে যেমন করে পারি বিশ্বাস বোধ জাগিয়ে তুলবই। আমি জানি, বিশ্বাস করি, ওরা না হলে আমার প্রতীজ্ঞা রক্ষা সম্ভব নয়।

সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষগুলোকে ডাক দিলেন

তিনি। ওদের সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান মনগুলোকে বিশ্বাসের আলো জ্বালিয়ে তুললেন। সাড়া দিচ্ছে ওরা। এগিয়ে আসছে। কিন্তু একি হল তাঁর? কেন মনে দেখা দিল সংশয়, নৈরাশ্য! তিনি ভাবলেন, চিন্তা করলেন, কী লাভ? কেন তিনি এগিয়ে এলেন একাকী?

কারণ বাধা আজ পদে পদে। বাধা দিচ্ছে অন্যান্য ভূ-স্বামীর দল। মানুষের মনে সন্দেহের বীজ বপন করার চেষ্টা করছে তারা। কারণ তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, আপন আপন স্বার্থরক্ষা। সুলতানের যে কোন আদেশকে তারা দেখেও দেখে না। প্রতিকার কামনা করলে চুপ করে থাকে।

সেইজন্যেই মানুষ কাঁদে। হিন্দুর মর্মছেঁড়া আর্ত চিৎকারে ভরে যায় বাংলার আকাশ বাতাস। তারা মার খায় আর কাঁদে। কান্না যেন তাদের জীবনের একমাত্র সম্বল।

অস্থির হয়ে উঠেছেন তিনি। অসহ্য বোধ হয়েছে এই কান্না। একবার ভাবছেন আর নয়, আর চুপ করে থাকা উচিত নয় তাঁর। চুপ করে থাকলে অন্যায় করবেন।

কিন্তু চুপ করে না থাকলেও উপায় নেই। নিজের শক্তি সম্পর্কে তিনি সচেতন। তিনি জানেন, এখন যদি কিছু করতে যান, যদি এখনই এই অত্যাচার বন্ধ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন, হয়তো সফল হতে পারবেন না। প্রয়োজন সময়ের, অসংখ্য যুবশক্তির। কিন্তু···

এখন ভাবলেন তিনি। নিজের কথাটা মনে পড়লো তাঁর। সুখ সম্পদ ঐশ্বর্যে ভরা গৃহ। পতিব্রতা স্ত্রী, স্নেহময়ী জননী, পুত্র, পুত্রবধূ। মানুষের কাম্য সব কিছুই তিনি পেয়েছেন। ভগবান তাঁকে কোন বিষয়েই বঞ্চিত করেননি। তবু মনে তাঁর শান্তি নেই। একটা অশান্তির আগুন দিবানিশি অষ্টপ্রহর বুকের মধ্যে জ্বলছে। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়, তিনি বুঝি পাগল হয়ে যাবেন। মানুষের কান্না তাঁকে পাগল করে তোলে। অথচ ইচ্ছা করলে তিনি চুপ

করে থাকতে পারেন। মানুষের কথা না ভাবলেই পারেন। শুধু নিজের কথা। আপন স্বার্থ চিন্তা। কিন্তু পারলেন না। অনেক বার চেষ্টা করেছেন, পারেননি। শুধু মাত্র আপন স্বার্থের চিন্তায় ভুলে থাকা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। শেষে একদিন জননী তাঁর মনের শেষ দ্বিধাটুকু কাটিয়ে দিয়েছেন। সকলের একজন হতে বলেছেন। যে ভুলের পথে অন্ধের মত ছুটে যাচ্ছিলেন, সে পথ পরিত্যাগ করতে বলেছেন।

তাই করেছেন তিনি। সুলতানের সঙ্গে শেষ সম্পর্কটুকু ছিন্ন করেছেন। ফিরে এসেছেন সকলের মাঝে। তবু আজ নিজেকে বড় একা মনে হয়। পদে পদে বাধা। ছশো বছরের পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত হতে ভয় পাচ্ছে মানুষ। বাধা দিচ্ছে স্বার্থপরের দল। সাধারণ মানুষের মৃত্যুই যে কাম্য তাদের। তারা মরলো কী বাঁচলো কী হবে দেখে। মুসলমানের দল যদি অসহায় মানুষগুলোকে ধর্মান্তরীত করে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। ওরা নীচ, ছোট, মূল্যহীনের দল ওরা। ওদের বাঁচা মরায় কিছুই এসে যাবে না। কিন্তু যারা আজ একথা ভাবে, তারা যদি একবার স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করতো, যদি সর্বনাশা ভবিষ্যৎটা দেখতে পেত, তাহলে এমন চিন্তা কখনই মনে স্থান দিত না। হিন্দু সমাজের একটি মানুষকেও তারা মূল্যহীন বলে ভাবতে পারতো না। সাবধান হত, প্রতিবাদ করতো, বাধা দিত। কারণ মোল্লার দল যে আঘাত আজ নিম্নশ্রেণীর ওপর হানছে, একদিন সে আঘাত তাদের ওপর এসে পড়বে না, কে বলতে পারে? নিশ্চয়ই আসবে। আজ মোল্লার দল আশ্রয় নিচ্ছে ছলনা আর কৌশলের। গরীব মানুষগুলোকে লোভের বশীভূত করছে। একদিন তারা গোটা সমাজটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শুধুমাত্র সময়ের প্রয়োজন। সেই সময়টুকু অতিবাহিত করছে তারা।

তিনি ভাবতে পারেননি সে দিনটার কথা। কিন্তু সে দিনটা যে

আসবে তা সত্য। হিন্দু যদি ঘুমিয়ে থাকে, আপন আপন স্বার্থ চিন্তা, একে অপরকে ঘৃণা-অবজ্ঞা, হানাহানি করে, সমাজের কঠিন অনুশাসন, ছোট বড়র বাধার প্রাচীর তাকে ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে যাবে। হয়তো মুছে যাবে তার অস্তিত্ব।

না-না। তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। মধ্যাহ্নে বিশ্রামের কথা ভুলে পথে নেমে ছিলেন। মনে পড়েছিল পদ্মনাভের কথা। তাঁর ছোট্ট পর্ণকুঠীরটি—যেখানে গেলে শান্তি পান। অশ্রান্ত মনটা মুহূর্তে শান্ত হয়।

গৃহদ্বারে পৌঁছাতেই হাসি মুখে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন ব্রাহ্মণ। কুশল বিনিময় করেছিলেন। কথায় কথায় দুর্গার কথা উঠেছিল। ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি দেবীর মাহাত্ব। অন্যদিন হলে আরো প্রশ্ন করতেন। জানতে চাইতেন আরো কিচ্ছু। আজ ব্রাহ্মণ নীরব হবার পর তিনিও চুপ করে আছেন। আবার মনের মধ্যে দুলে উঠেছে তাঁর চিন্তার সমুদ্রটা।

হঠাৎ পদ্মনাভ চোখ মেলে চাইলেন। মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, নারায়ণ।

ব্রাহ্মণের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চাইলেন তিনি। কথা বললেন না।

তিনি বললেন, মনটা আজ তোমার বড় অশান্ত, তাই না?

চমকে উঠলেন তিনি। অবাক দৃষ্টি মেলে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন। মনে হল, ব্রাহ্মণ যেন অন্তর্যামী।

তিনি যেন বুঝতে পারলেন সে কথা। হাসি মুখে বললেন, না বাবা, অন্তর্যামী আমি নই। কিন্তু তোমার মনটা আজ যে কোন কারণেই হোক অশান্ত, এটুকু যে তোমার মুখের দিকে চাইবে সেই বলে দেবে। আমি তোমাকে চিনি। তোমার মুখ দেখলেই আমি মনের কথা ধরতে পারি নারায়ণ।

স্বীকার করলেন তিনি। মৃদুকণ্ঠে বললেন, সত্যই আজ আমার মনটা বিশেষ ভাল নেই।

কেন…

না-না। বাধা দিলেন তিনি। বললেন, সংসার আমার সুখেই অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু…। চুপ করলেন তিনি। চিন্তা করলেন, কথাটা বলা উচিত হবে কী না। বাধা হয়তো নেই। কিন্তু যদি বিব্রত হন উনি।

পদ্মনাভ আবার ডাকলেন, নারায়ণ!

এ আমার মনের সমস্যা। আমি চিন্তা করে উঠতে পারছি না কী করবো? কী করা উচিত আমার। সেইজন্যেই এই অশান্তি। আমার মনটা চঞ্চল হয়ে আছে। বার বার দ্বিধা দ্বন্দ্বে দুলে উঠছে। একটু চুপ করলেন উনি। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। অসহায় কণ্ঠে বললেন, সত্যি আজ আমি বড় একা।

কে বললে তুমি একা?

ব্রাহ্মণের কথায় গণেশ নারায়ণ তাঁর মুখের দিকে চাইলেন। কথা বলতে পারলেন না।

হাসলেন পদ্মনাভ। মৃদুকণ্ঠে বললেন, না বাবা, কে বললে তুমি একা? তুমিতো একা নও। তিনি আছেন তোমার সঙ্গে, তাঁর ইচ্ছাই তো তোমার ইচ্ছা।

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা,
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুস্মৃতঃ স্বভাবাৎ।
করোমি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ,
নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥

ঈশ্বরের অসীম ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ জগৎ সংসারে কিছুই ঘটতে পারে না। তোমার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ইচ্ছাটুকুও তাঁরই দান। তুমি তোমার ইচ্ছাশক্তি তাঁকেই সমর্পণ কর বাবা। দেখবে, জীবনের পথে চলতে চলতে শুভ-অশুভ কিছুই আর মনকে টলাবে না তখন। তুমি তোমার কর্মপথে ঠিক এগিয়ে যাবে। আর…। একটু চুপ করে নীরবে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, বাবা,

পরাধীনতা অথবা দাসত্বের মধ্যে থাকলে মানুষের প্রাণে প্রকৃত ভক্তি অথবা ঈশ্বর প্রেমের উন্মেষ হয় না। স্বাধীন জীবনযাপনের মধ্যেই প্রকৃত ভালবাসাকে পাওয়া যায়। সেইজন্যেই আজ তোমার সামনে বাধার প্রাচীর। নিজেকে একা মনে হচ্ছে। কেউ আসছে না তোমার ডাকে সাড়া দিতে। কেন জান? ভয়। তাদের সামনে আজ ভয়ের ছায়া। তারা বিশ্বাস হারিয়েছে। কিন্তু বাবা, বিশ্বাসটুকু হারালে চলবে না। ভয় কী তোমার? তিনি আছেন। তিনিই তোমাকে পথ দেখাবেন। নিজেকে সমার্পণ কর তাঁর কাছে। দেখবে, জীবনের পথ চলা কখনো ব্যাহত হবে না। আজ যা কঠিন কঠোর অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, তখন আর তা হবে না।

আমি পারবো?

কেন পারবে না বাবা। আপন স্বার্থ মুক্ত হয়ে যে কাজই তুমি কর না কেন, সফলতা আসবেই। ধর্মরক্ষাই তো মানুষের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। সে কর্তব্যের পথ থেকে তুমি বিচ্যুত হয়ো না।

আবার অবাক হলেন তিনি। বললেন, আপনি কী করে জানলেন?

আমি? আবার মুখখানি তাঁর প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল। বললেন, শুধু আমি নয় বাবা, একথা আজ সকলেই জানে। সুলতানের সঙ্গে তোমার বিরোধের কথা আজ আর কারো অজানা নেই। তুমি কিছু না জানালেও কথাটা আমার কানে এসেছে। তুমি মানুষের কর্তব্যই পালন করেছো। অন্যায়কে মেনে নাওনি, অসত্যকে গ্রহণ করনি, এতে আমি সবার থেকে বেশী সুখী হয়েছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সফলতা লাভ কর। কিন্তু···

গনেশ নারায়ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

বৃদ্ধ একটু হাসলেন। বললেন, ধর্ম মানুষের প্রাণের সম্পদ। সেই সম্পদে কোনদিন হস্তক্ষেপ কোর না। কেউ যদি স্বেচ্ছায় ধর্মত্যাগ করে, বাধা দিও না।

গনেশ নারায়ন বললেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ক্ষমতার দম্ভে যারা মানুষের ধর্ম নিয়ে খেলা করছে, মুসলমানের রাজ্যে হিন্দুর অধিকারের মূল্য যাদের কাছে কিছু নয়, তাদের বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম। আমি চাই শাসকের সুশাসন। যদি সম্ভব না হয়, হিন্দুর অধিকারের মূল্য যদি তারা স্বীকার না করে, শুধুমাত্র হিন্দু, এই অপরাধে তাদের মান-সম্ভ্রম, নারীর ইজ্জৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, আমি তা চুপ করে সহ্য করবো না। হিন্দুর অধিকার আমি ফিরিয়ে আনবো।

পারবে ?

জানি না পারবো কী না। আমি চেষ্টা করছি। ডাক দিচ্ছি ঘুমিয়ে পড়া তারুণ্য শক্তিকে। যদি তারা জাগে, আমি যদি তাদের নাড়া দিতে পারি, তাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারি অধিকার বোধ। আমার বিশ্বাস, আমি ব্যর্থ হবো না। বাংলার বুকে আবার বাঙ্গালীর হারানো দিন ফিরে আসবে।

চুপ করলেন তিনি। অনেকক্ষণ দুজনেই বসে রইলেন মুখোমুখী। একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে পদ্মনাভ ডাকলেন, নারায়ণ।

গনেশ নারায়ণ তাঁর মুখের দিকে চাইলেন।

হাসলেন ব্রাহ্মণ। মৃদুকণ্ঠে বললেন, আমি সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম নারায়ণ। আর সেই সর্বশক্তিমান করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার স্বপ্ন সার্থক করেন।

কথা বললেন না গনেশ নারায়ণ। মাথা নত করে প্রণাম জানালেন ব্রাহ্মণকে।

আকাশে দিনের সূর্য তখন অস্তাচলে। গোধূলির রক্তরাগে প্রকৃতি রক্তরাঙা। মাঠের পথে রাখালের ক্লান্ত বাঁশির সুর। ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় নিলেন তিনি। পথে এসে দাঁড়ালেন। মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন। দুচোখ ভরে দেখলেন আকাশ, প্রকৃতি, প্রান্তর। এখন আর নিজেকে তাঁর একা মনে

হল না। মনে হল, তিনি একা নন, যা ভেবেছিলেন, মিথ্যা, ভুল। সবাই আছে তাঁর। তিনি আছেন সবার মাঝে।

সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করে কক্ষে প্রবেশ করতেই সত্যবতী এগিয়ে এল। বুঝতে পারলেন গনেশ নারায়ণ। এবার স্ত্রীর পীড়ন সুরু হবে। সত্যবতী সন্ধ্যাহার না করিয়ে ছাড়ল না।

একদিন বলেছিলেন, দেখ সত্যবতী, তোমার এই পীড়নটুকু থেকে এবার তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

গম্ভীর কণ্ঠে সত্যবতী বলেছিল, কেন?

হেসে বলেছিলেন তিনি, দশ বছর আগে যা পারতাম, তা যে আজও পারবো এতো ঠিক নয়। এখনও যদি তুমি সেই আগেকার মত সন্ধ্যায় রীতিমত আহার করিয়ে আবার রাত্রে আহার করতে বল, পারবো কেন?

সত্যবতী বলেছিল, কেন পারবে না?

কেন সেটুকু তুমিই চিন্তা করে দেখ। বলেছিলেন তিনি। বয়সটা কমছে না বাড়ছে।

নির্বিকার কণ্ঠে সত্যবতী বলেছিল, আমি জানি মানুষের বয়স কমে না, বাড়েই।

তবে?

কী তবে?

এবার তুমি আমাকে মুক্তি দাও। তোমার এই পীড়নটুকু আর আমার সহ্য হয় না।

কথাগুলো তিনি পরিহাসচ্ছলেই বলেছিলেন। কিন্তু সত্যবতীর মুখখানি থমথমে হয়ে উঠেছিল। রাধার মাকে ডেকে আহার্য বস্তুগুলি নিয়ে যেতে বলেছিল। ইতঃস্তত করেছিল রাধার মা।

তাকে ধমক দিয়ে বলেছিল সত্যবতী, কী হল রাধার মা, আমার কথাটা শুনতে পেলি না তুই?

ভয়ে ভয়ে রাধার মা বলেছিল, বাবা মশায় খাবেন না কেন ?

কেন খাবেন না অত কথায় দরকার কী তোর ? তোকে যা বলছি তুই তাই কর।

সত্যবতীর কণ্ঠের তীক্ষ্ণতায় একটু অবাক হয়েছিল রাধার মা। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও সেগুলি তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

সত্যবতীও চলে যাচ্ছিল। তিনি ডেকেছিলেন, শোন!

সত্যবতী ফিরেছিল।

বলেছিলেন, তুমি কী রাগ করলে সত্যবতী ?

রাগ! হেসেছিল সত্যবতী। বলেছিল, তোমার ওপর রাগ করতে পারি কী আমি ?

পার না ?

না গো।

তবে ?

সত্যবতী উত্তর দেয়নি। নীরব ছিল কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিল, আমি যাচ্ছি ?

যাবে ?

হ্যাঁ, মায়ের আহারের ব্যবস্থা করতে হবে এবার।

চলে গিয়েছিল সত্যবতী। ওর কথা ভেবেছিলেন তিনি। বুঝতে পেরেছিলেন সে বড় ব্যথা পেয়েছে মনে।

হিন্দু নারীর কাছে পতি দেবতা। পতির সেবাই তার একমাত্র জীবনের লক্ষ্য। কদিনইবা গৃহে থাকেন। যে কদিন থাকেন, সেই কদিনই কাছে পেয়ে সেবা করতে চায় সত্যবতী। কিন্তু তাতেও বাধা দিলেন তিনি।

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। স্ত্রীর এই ইচ্ছাটুকুতে বাধা না দিলেই পারতেন। সামান্য আহারে ও যদি খুশি হয়, সেটুকু করা তাঁর কর্তব্য।

রাত্রে বলেছিলেন, আচ্ছা সত্যবতী, তুমি সত্য করে বলতো, দুঃখ পাওনি ?

দুঃখ! অবাক হয়েছিল সত্যবতী। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, ও কথা বললে আমার মহাপাপ হবে। আমি যা পেয়েছি, কজন তা পায় ? আমিতো ভাগ্যবতী।

না, না, আমি ও কথা বলছি না। ওকে বোঝাতে চেয়েছিলেন তিনি।

সত্যবতী কিন্তু সহজে ধরা দিতে চায়নি। বলেছিল, আমি সত্যি কথাই বলছি।

আমি ও কথা বলছি না সত্যবতী। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আজ যে আমি সন্ধ্যায় আহার করলাম না, এতে তুমি সত্যি বলছো দুঃখ পাওনি ?

এবার আর না বলতে পারেনি সে। বলেছিল, তা পেয়েছি।

তবে তখন যে বললে···

ওটুকু বলতে হয়। হেসেছিল সত্যবতী। বলেছিল, স্বামীর তুষ্টির জন্যে স্ত্রীকে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়। দুঃখ পেয়েছি সত্য, কিন্তু তুমি যা বলেছ তাও তো সত্য। চিরদিন স্ত্রী স্বামীকে পীড়ন করবে এতো ঠিক নয়।

সত্যবতী!

হেসেছিল সে। বলেছিল, জানো, আমরা বড় লোভী। আমরা নিজেদের সুখের জন্যই সব সময় লালায়িত হয়ে আছি। দূরে থাক তুমি, কিন্তু তোমাকে কাছে পাবার আশায় দিন কাটে আমার। কাছে পেলে নিজের কথাটাই ভাবি কেবল। যে কদিন থাক, কেবলই ভাবি, কী করে তোমার সেবা করি। হেসে ফেলেছিল সত্যবতী। আমরা যে আগের দিনগুলো হারিয়ে ফেলেছি, অতীত যে আর ফিরে আসবে না, একথা একবারও মনে হয় না।

বলেছিলেন, কাল থেকে আবার আমি আহার করবো।

না, না।

আজ আমার শরীরটা ভাল ছিল না, সেইজন্যেই ও কথাটা বলে ফেলেছিলাম।

সত্যবতী একটু চিন্তা করেছিল। কেমন সন্দেহ জেগেছিল তার মনে। বলেছিল, সত্যি বলছো?

সত্যি।

হাসি ফুটেছিল তার মুখে। মনের মেঘ কেটেছিল। যাকে ধরতে গেলে জোর করতে হয়, সে ধরা দিয়েছিল স্বেচ্ছায়। মাথা রেখেছিল বুকে। ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি।

প্রায় বছর পাঁচেক আগের ঘটনা এটা। তারপর থেকে তিনিও মেনে নিয়েছেন এটুকু। ওকে ব্যথা দিতে চান না। সামান্য এটুকুর জন্যে ও যদি খুশি হয় হোক না।

নিজের হাতে আহারের স্থান করেছিল সত্যবতী। আয়োজন সামান্যই। সামান্য কিছু ফল আর একটু দুধ। আহারে বসলেন তিনি। অনেক কথা বলল সত্যবতী। বলল, তোমার ব্রজ দুলাল সেই বিকাল থেকে তোমায় খোঁজাখুঁজি করছে।

ব্রজ, কেন?

কেন তা বলতে পারবো না। হয়তো ওর এভাবে ভাল লাগছে না।

কথাটা বুঝতে পারলেন তিনি। সত্যিই তাই। ভাল তাঁর নিজেরও লাগছে না। কেমন যেন বন্দী বলে মনে হয়। এখন মনে হচ্ছে, সত্যই তাঁর বয়েস হয়েছে। আগে বুঝতে পারতেন না। বছরের অধিকাংশ সময় ভাতুড়িয়া আর পাণ্ডুয়া যাতায়াতে এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করতেন না। কর্মব্যস্ত দিনগুলি তাঁকে একটি দিনের জন্যেও অনুভব করতে দেয়নি, তাঁর বয়েস হয়েছে।

কিন্তু সত্যবতীর কথার উত্তরে কিছু বললেন না তিনি। একটু হাসলেন শুধু। কারণ কথাটা ব্রজকে উদ্দেশ্য করে বললেও লক্ষ্য শুধু সেই নয়।

সত্যবতী বলল, হাসলে যে ?

এবারও হাসলেন তিনি। বললেন, ভাল না লাগাই স্বাভাবিক সত্যবতী। কারণ ওর সারাটা জীবনই প্রায় পথে পথে কেটে গেল। একদিন এখানে এসেছে, পরদিনই ফিরে গেছে পাণ্ডুয়া। ঘরে কদিন কাটিয়েছে ও।

আর তুমি ?

আমি ! না, উত্তর দেওয়া হল না। আহার শেষ হয়েছিল। উঠে দাঁড়ালেন।

সত্যবতী বলল, আমি জানি।

কী ?

তোমার কী হয় ?

জান ?

জানি বৈকি। হাসল সত্যবতী। বলল, ঘুমটা যে আমারই ভাঙ্গে ?

ঘুম ভাঙ্গে ? অবাক হলেন তিনি। বললেন, কী ঘুম ভাঙ্গে তোমার ?

তোমার কথা শুনে।

কাকে বলি ?

বলতো কতজনকেই। সকলকে চিনিও না। নামও জানি না। কখনো কখনো ব্রজর নামটা শুনতে পাই। কখনো কখনো সুলতান না কাকে কী যেন বল।

কী বলি ?

কী যে বল তার অনেক কথাই বুঝতে পারি না। শুধু মাঝে মাঝে শুনতে পাই হিন্দু-হিন্দু। কাদের যেন ডাক। কখনো রাগ করো, আবার কখনো বা···। সত্যবতী চুপ করে গেল।

কখনো কী সত্যবতী ?

সত্যবতী চুপ করে রইলো।

তিনি ডাকলেন, সত্যবতী!

তুমি কাঁদ।

কাঁদি?

হ্যাঁ। সত্যবতীর কণ্ঠটা ম্লান শোনাল। বলল, আমি তোমার চোখে জল দেখেছি। আমি আলো জ্বেলে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছি। ভেবে পাইনি, কাদের জন্যে কাঁদ তুমি!

কাদের জন্যে? তিনিও যেন কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন।

হ্যাঁ। ঘাড় নাড়ল সত্যবতী।

মানুষের জন্যে। একটু চুপ করলেন তিনি। বললেন, সত্যি বলছি সত্যবতী, এ কান্না আমার অসহায় মানুষগুলোর জন্যে, যারা সহায়-সম্বলহীন। যাদের নিয়ে কিছু স্বার্থপর মানুষ, কঠিন সমাজ, দিনের পর দিন ছিনিমিনি খেলছে। আর···

আর?

আর কাঁদি হিন্দুর জন্যে। যারা মার খাচ্ছে, মরছে, কিন্তু মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে না, প্রতিবাদ জানাচ্ছে না, তাদের জন্যে। তারা যে কেন নিজেদের মিথ্যা পঙ্গু অসহায় ভাবে, আমি চিন্তা করে উঠতে পারি না সত্যবতী। আমি ভেবে পাই না, এমন দুর্বল ভীরু কাপুরুষে পরিণত হল তারা কেমন করে? কেমন করে বিস্মৃত হল অতীত। তাদের শৌর্য বীর্যের দিনগুলো। তারা তো অক্ষম ছিল না।

সত্যবতী বলল, কী জানি।

আমিও বুঝতে পারছি না। বললেন তিনি, আমার ডাকে সাড়া দিতে ভয় পাচ্ছে তারা।

কেন?

তাইতো বুঝতে পারছি না আমি। একটু চুপ করে রইলেন তিনি। সত্যবতীকে দেখলেন। বললেন, একবার যে সাড়া দিচ্ছে না, তা নয়। তবু···তবু নিজেকে আমার একা মনে হয়। আমার মনে হচ্ছে···

বাবা, ব্রজদাদা ডাকছে আপনাকে।

চমকে উঠলেন তিনি। মৃণ্ময়ীকে দেখলেন। বললেন, ব্রজ কোথায় মা?

এই যে বড় মশায়, আমি এখানে।

কথাগুলো বলে দ্বারের পাশ থেকে উঁকি দিল ব্রজ।

দেখতে দেখতে বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়লো সংবাদটা। শুনলেন গণেশ নারায়ণ। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যু হয়েছে। সংবাদটা এনে দিল ব্রজ।

প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গার পর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন তিনি। কদিন থেকেই তাঁর শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। বৈদ্যের দল তাঁদের সাধ্যমত চিকিৎসা করছেন, কিন্তু কোন পরিবর্তন লক্ষ্যিত হচ্ছে না তাঁর পীড়ার। তাছাড়া কিছুটা অবুঝ হয়ে উঠেছেন রাজেশ্বরী। খেতে চাইছেন না ঔষধ।

সত্যবতী এসে বলেছিল, তুমি এবার মায়ের কাছে যাও। শত অনুরোধেও আমি তাঁকে ঔষধ খাওয়াতে পারলাম না।

কথাটা শুনে শয্যা ত্যাগ করেছিলেন তিনি। মায়ের কক্ষের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

শয্যায় বসে মালা জপছিলেন রাজেশ্বরী। পুত্রকে দেখে হাসি ফুটেছিল মুখে। ডেকেছিলেন, আয় খোকা!

মায়ের পায়ের কাছে গিয়ে বসেছিলেন গণেশ নারায়ণ।

পুত্রের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে ছিলেন রাজেশ্বরী। এক সময় মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, তোকে একটা কথা বলব খোকা?

কী মা?

তোর বৈদ্যের দলকে ক'টাদিন আসতে নিষেধ কর বাবা।

মা!

মিথ্যা ঔষধগুলো খাইয়ে দেহটাকে আর ব্যস্ত করতে চাই না। যে কটা দিন আছি···

মা! যেন আর্ত চিৎকার করে উঠেছিলেন গণেশ নারায়ণ।

হ্যাঁ বাবা। হেসেছিলেন রাজেশ্বরী। আর কেন? সংসারে আর আমার প্রয়োজন নেই বাবা। যে কটা দিন আছি···

না, না, মা। এ তুমি···

এই সত্য বাবা। আমি তাঁর ডাক শুনেছি। আর কটা দিন তাঁর 'পরে নির্ভর করে আমাকে কাটাতে দে। তাঁকে আমায় প্রাণ ভরে ডাকতে দে বাবা।

উদ্গত অশ্রু দমন করে মার পদপ্রান্তে বসেছিলেন তিনি। জননীর মুখের দিকে চেয়ে দুচোখে বিস্ময় যেন ঝরে পড়েছিল তাঁর। কী এক স্বর্গীয় সুষমায় ভরা সে মুখ। গবাক্ষপথে প্রভাতের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছিল সে মুখে। ব্যাধীর এতটুকু চিহ্ন খুঁজে পাননি। ছিল না এতটুকু যন্ত্রণার ছায়া।

জননীর কক্ষ ছেড়ে একসময় বেরিয়ে এসেছিলেন। ব্রজ যেন অপেক্ষায় ছিল তাঁর। চুপিচুপি কাছে এসেছিল। ডেকেছিল, বড় মশাই!

কী রে ব্রজ, কদিন কোথায় ছিলি?

আমি পাণ্ডুয়া গিয়েছিলাম বড় মশায়।

পাণ্ডুয়া গিয়েছিলি তুই? কেন?

ব্রজ চুপ করেছিল।

হ্যাঁ রে, শুধু শুধু পাণ্ডুয়া গিয়েছিলি কেন তুই?

ব্রজ বলেছিল, ভাল লাগছিল না সেইজন্যে। তাছাড়া ছোট মশায় আমাকে একবার ঘুরে আসতে বলেছিল।

যদু?

হ্যাঁ বড় মশায়।

অথচ তিনি এ সবের কিছুই জানেন না। কদিন আগে অবশ্য

যন্থ বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে অন্য মহলে গেছে। দেখতে পাননি একদিনও। ভেবেছিলেন, ঘরের কোন কাজে বোধহয় আটকে পড়েছে সে। ওকে আর ডাকেননি। তাছাড়া প্রয়োজনও ছিল না।

ব্রজ বলেছিল, এইমাত্র আমি সেখান থেকে ফিরছি।

পাণ্ডুয়ার খবর কী ব্রজ?

স্থলতানের মৃত্যু হয়েছে।

ব্রজ!

হ্যাঁ বড় মশায়। গত পরশু রাত্রে নিহত হয়েছেন তিনি।

না, না।

বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি। গিয়াস্থদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুটা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল। ভেবে পাননি তাঁর নিহত হওয়ার কারণ। কে তাঁকে নিহত করল?

দোষ? হ্যাঁ, দোষ হয়তো তাঁর আছে। দীর্ঘ স্থলতানী জীবনের শেষের কটা বছর তিনি কম অন্যায় করেননি। অনেক অবিচার করেছেন হিন্দুদের প্রতি। স্থশাসক স্থলতান কেমন যেন খেয়ালী হয়ে উঠেছিলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামিকে দিয়েছিলেন প্রশ্রয়। মুসলমান মোল্লা ফকির আর আমির ওমরাহের দল হিন্দুদের প্রতি তাঁর মনকে বিষিয়ে তুলেছিল। কিন্তু তাই বলে তিনি নিহত হবেন, এ কথা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেননি।

দীর্ঘ দিন। ৭৯৪ হিজরায় (১৩৯১ খ্রীঃ) স্থরু, ৮১৪ হিজরায় (১৪১০-১১ খ্রীঃ) শেষ। মধ্যে দীর্ঘ কুড়ি বছর। এই কুড়ি বছরে মান্থষের কম উপকার তো তিনি করেননি! তবে? কেন তিনি নিহত হলেন? জীবনের শেষ লগ্নে কে তাঁর বুকে হিংসার ছুরি হানলো?

ভাবতে পারলেন না তিনি। গিয়াস্থদ্দীনের জন্যে দুঃখ হল

তাঁর। একবার ভাবলেন ছুটে যান। গিয়ে দেখে আসেন তাঁকে। বন্ধুর শেষ শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে জানিয়ে আসেন শ্রদ্ধা।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। আজ তিনি যেতে পারেন না। যাওয়া উচিত হবে না তাঁর পক্ষে। সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ হয়তো প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবে না তাঁকে। তিনি সংবাদ পেয়েছেন, আজ সে সম্পূর্ণভাবে মোল্লা নূরকুৎব আলমের উপর নির্ভর করছে। বিলাসী শাহজাদাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পুরেছে দরবেশ।

তবে কী?

কথাটা ভাবতে পারলেন না তিনি। অসম্ভব নয়। সুলতান ছিলেন গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। হয়তো তিনি বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। হয়তো…

যদুও একদিন বললে সে কথা। প্রশ্ন করলে, এবার কী করবেন?

আমি? চমকে উঠলেন গণেশ নারায়ণ। পুত্রের মুখের দিকে চাইলেন। বুঝতে পারলেন ওকি বলতে চায়। তবু বললেন, কী করবো?

আমাদের সতর্ক হতে হবে। প্রস্তুত থাকতে হবে সব সময়।

কেন?

সুলতান গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুটা হত্যাকাণ্ড সন্দেহ নেই। কিন্তু সে হত্যাকাণ্ড শুধুমাত্র তাঁকে শেষ করার জন্যেই সংঘটিত হয়নি। হত্যাকারীর দলের উদ্দেশ্য ভিন্ন। পথের বাধাটুকু অপসারিত করেছে তারা।

কেন?

আপনার জন্যে।

আমার জন্যে?

হ্যাঁ বাবা। একটু নীরব থাকার পর যদু বলল, আমার মনে হয় যে কোন উপায়েই হোক, আমাদের সমস্ত সংবাদ ওরা সংগ্রহ

করে। আপনার সৈন্যদল গঠনের সংবাদ ওরা নিশ্চয় জেনেছে। সেইজন্যেই…

কিন্তু যদু, আমার নিজস্ব সৈন্যদলতো বহুদিন যাবৎ রয়েছে?

তা আছে। যদু হাসল। বলল, সেই সংখ্যা আজ আপনি দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণে পৌঁছতে চান, এটাতো সত্যি।

আর কথা বললেন না তিনি। চুপ করে রইলেন।

যদু বলল, আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে বাবা।

ছয়

জুবেদা।

এঁ্যা।

এ আমি কী করছি জুবেদা?

কী করছেন?

কী করছি? প্রশ্নটা যেন নিজেকেই নিজে করলো সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ। বলল, না জুবেদা, আমি কিছু করছি না। আমার কিছু করার ক্ষমতা কোথায়? আজ সব কিছুই করছে উজীর আজম খান। নূরকুৎব আলমের ভাই। আমার করণীয় কিছু নেই। সব দায়-দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। বলেছেন, আমি নাকি 'সুলতান-ইস্‌-সালাতীন'। আমি রাজাধিরাজ। চীন সম্রাট য়ুঙ-লোর কাছে তিনিই দূত পাঠিয়েছেন। এ খবরটা পর্যন্ত আমাকে জানান নি। জানলাম তখন, যখন সম্রাটের প্রতিনিধি আব্বাজানের শোকানুষ্ঠানে যোগ দিতে এলেন। আমাকে সমবেদনা জানিয়ে সম্রাটের পত্র দিলেন। বললেন, আমি মসনদে বসায় সম্রাট নাকি আনন্দিত হয়েছেন। জুবেদা, আমাকে বাংলার মসনদে বসিয়ে অথবা আমি সুলতান হতে অনেকেই আনন্দ পেয়েছে, ও আনন্দিত হয়েছে। তাদের আনন্দ পাওয়ার অথবা আনন্দিত হওয়ার যে যথেষ্ট কারণ আছে, আমি তা স্বীকার করি না। মানুষ আনন্দ পাক, আনন্দে দিন কাটুক তাদের, এটা আমিও চাই। কিন্তু এ আমি কী করছি জুবেদা? আমি কী করলুম? আমার এই জিন্দেগীটাতে যখন আমি শাহজাদা ছিলুম, অথবা আজ আমার এই সুলতানী জীবনে আমি কী করেছি? কিছু করিনি কী? না না, কিছু করেছি

বৈকী। আমি অনেক কিছুই করেছি। আচ্ছা ও বুরা। খারাপ-ভাল। সংসারে আদমীর এই দুটোই করার আছে। কেউ খারাপ করে, আবার কেউবা ভাল। ভাল হয়তো কিছুই করিনি আমি। কারণ ভাল করার মত কিছু ছিল না। একজন শাহজাদা কী ভাল করতে পারে? ভাল কিছু করার সাধ্য তার ছিল না! স্থলতান ছিলেন। তিনিই তো মালিক। ভাল যা কিছু করার সব তো তাঁরই এক্তিয়ারে। ফকিরকে আমির, আমিরকে ফকির, তিনিই বানাতে পারতেন। কারণ তার ক্ষমতা ছিল। সকলেই তাঁর হুকুমের বান্দা। আমিও তাই ছিলাম। কিন্তু আমাকে কোন দিন কোন হুকুম তিনি করেন নি। যদি করতেন, আমিও তা পালন করতে বাধ্য হতাম। জান জুবেদা, আমি যখন শাহজাদা ছিলুম, তখন আচ্ছা কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল না। লেকিন, খারাপ অনেক কিছুই করেছি। করেছি বলতে, করতে বাধ্য হয়েছি। না করে উপায় ছিল না। আমি আমার নিজের জন্যে, একমাত্র আমার নিজস্ব ভোগ ও তৃপ্তির জন্যে অনেক বুরা কাজ করেছি। করে আনন্দ পেয়েছি। সেদিনগুলোতে একমাত্র নিজের আনন্দই তো ছিল কাম্য। আমি তখন শুধু নিজের কথা ভাবতুম, আনন্দ খুঁজতুম। অন্যের কথা ভাববার মত অবসর ছিল না। ছিলেন স্থলতান। তিনি ছিলেন বলেই আমি কিছু ভাবিনি। জুবেদা জান, তুমি যদি ভেবে থাক, দিনগুলোতে আমি খুব আনন্দে ছিলুম, তাহলে কিন্তু ভুল করবে। যন্ত্রণা ছিল বৈকী। কষ্ট হ'ত। নিজেকে কেবল যেন বঞ্চিত বলে মনে হত আমার। হাত পা বাঁধা একটা অসহায় জীবন। মুক্তি ছিল না। ছিল না নিজস্ব চিন্তাধারা। কারণ আমার ক্ষমতা ছিল সীমিত, সীমাবদ্ধ। জুবেদা, আমার সেই শাহজাদা থাকার দিনগুলোতে আমি মাঝে মাঝে কেমন অমানুষ হয়ে উঠতুম। সমস্ত জগৎ সংসার আমার কাছে বিষবৎ বলে মনে হ'ত। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো মন। বিলাসীতা, ব্যাভিচার

যন্ত্রণা বাড়তো। আমি মুক্তি চাইতুম, মঙ্গল কামনা করতুম। না না জুবেদা, আমি কিছু চাইতুম না, কারণ কিছু না চাইতেই তো অনেক পেয়েছিলুম। আমার পাওয়ার শেষ ছিল না। নারী আর সুরা। আজ যারা বেগম আমার, তারা সেদিন ছিল বিবি। শাহজাদা সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের বিবি। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের পুত্রবধূ। গর্বের অন্ত ছিল না তাদের। আর সেইজন্যে আমাকে যেন তারা অবজ্ঞা করতো। কারণ আমি সামান্য শাহজাদা। সুলতান সত্যিকারের ক্ষমতাবান। তিনিই তো সব, আমি কিছু নই। কোন ক্ষমতা নেই আমার। বে-ফালতু একটা জীবনের অধিকারী, ব্যস্‌। আর সেইজন্যেই জান জুবেদা, আমার বিবিদের অবজ্ঞার জন্যেই আমি তোমাদের দিকে নজর দিয়েছিলুম। নারী আর সুরা। ভোগের তৃষ্ণা বেড়ে গিয়েছিল আমার। লেকিন, আমি কী করলুম জুবেদা? এ জিন্দেগীটায় কী করলুম? না না, কিছু করেছি বৈকী। নিশ্চয়ই করেছি। শাহজাদা সৈফুদ্দীন যা পারেনি, সুলতান সৈফুদ্দীন তা পেরেছে। সেদিন ইচ্ছা সত্বেও সম্ভব হয়নি। কেন জান? সেদিন সাহস ছিল না। আমি তোমাকে আমার বেগম করে নিয়েছি জুবেদা। না না, জুবেদা, তুমি যা ভাবছো তা নয়। তোমার এই দেহটা একদিন আমার মনে কামনার আগুন জ্বালিয়ে ছিল সত্যি। আমি তোমাকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠে ছিলুম। শয়তান বণিকটা তোমার মুখের ওড়নাটা একবার মাত্র সরিয়ে দিয়েছিল। তোমার দুটি সুন্দর চোখ আর পাতলা ঠোঁট আমি দেখেছিলুম। আর একবার দেখতে চাইলে সে রাজি হয়নি। বলেছিল, মূল্য দিলে তোমাকে তো আমি পাবোই। শুধুমাত্র তোমার মুখখানি নয়, তোমার দেহটাও আমার অধিকারে আসবে। যে দেহটা আমি আমার নিজের ইচ্ছামত ভোগ করতে পারবো। হ্যাঁ, জুবেদা আজ আর আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি

তোমার দেহটাকে পাওয়ার জন্যেও অস্থির হয়ে উঠেছিলুম। শয়তান বণিকটার সেই অস্বাভাবিক চড়া দর শুনেও তাকে হাঁকিয়ে দিলুম না। কিংবা জোর করে কেড়ে নিলুম না। খুব বেশি একটা দরাদরিও করিনি। একবার বলতে, সে হেসে বলেছিল, ভাল জিনিষ চড়া দরেই কিনতে হয়। সে আমাকে জ্ঞান দিয়েছিল। অথচ ইচ্ছা করলে আমি মূল্য না দিয়েই কেড়ে নিতে পারতুম। কিন্তু আমি তা চাইনি। কোন রকম গণ্ডগোল সৃষ্টি করার ইচ্ছা আমার ছিল না। ইচ্ছা ছিল না বলতে, কোন রকম গণ্ডগোল করার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। সেই সন্ধ্যায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তোমাকে পেতে চেয়েছিলুম। আমি তোমাকে হারেমে এনে তুলেছিলুম। খোজাটা সরাব দিয়েছিল আমায়। ও জানতো, তখন আমার কিসের প্রয়োজন। সামান্য পান করতেই আমার নেশা-হয়েছিল। কিন্তু পা টলেনি এতটুকু। আজ আর সরাব পান করলেও নেশা হয় না। সেদিন কিন্তু আমার নেশা হয়েছিল। নেশা গ্রস্থ আমি কিংবা একটা শয়তান তোমার কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করেছিল। তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে গবাক্ষের সামনে। আমার পদ শব্দ শুনেও ফিরে চাওনি। যারা ভয় পায়, ফিরে চায়। যদিও জানে, মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না, তবুও প্রথমটায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তুমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলে। হয়তো ভাগ্যের নির্মম পরিহাসটার কথা চিন্তা করেই তুমি প্রস্তুত হয়েছিলে। সেইজন্যেই হয়তো বাধা দাও নি। আমি যখন তোমার শরীরটাকে আবরণমুক্ত করে বুকে হাত দিয়েছিলুম, তখন শরীরের কোথাও এতটুকু কাঁপন জাগেনি। কিন্তু আমি তোমার চোখে জল দেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, বেদনায় তুমি কাঁদছো। কিন্তু তা যে সত্যি নয় বুঝেছিলুম অনেক পরে। অসহ্য ক্লান্তিতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল একসময়। আমি কান্নার শব্দের সঙ্গে তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে

পেয়েছিলুম। তুমি খোদার কাছে দোয়া ভিক্ষা করছো। জুবেদা, তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, সেদিন বোঝবার মত শক্তি হয়তো আমার ছিল না, একটা পশু মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের মনুষত্ব বোধ জাগতে অনেক সময় লাগে। আমারও লেগেছে। কিন্তু আজ আমি কী করবো জুবেদা ?

চুপ করল সৈফুদ্দীন। বিস্মিত জুবেদার মুখের দিকে চাইল। সে কিন্তু চুপ করেই রইলো।

জুবেদা! আবার ডাকল সৈফুদ্দীন।

জুবেদা কী ঘুমিয়ে পড়েছে ? সে বুঝতে পারল না। অস্থির হল।

অনেকক্ষণ পরে জুবেদা চোখ মেলে চাইল। সত্যই যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল সে।

জুবেদা।

এ্যাঁ!

আমি কী করবো জুবেদা ?

কী করবেন ?

তাই আমি জানতে চাইছি। আমি বুঝতে পারছি না কী করবো, কী করা উচিত আমার।

কেন ?

আমাকে ওরা ঠকাচ্ছে জুবেদা, আমাকে ভুল বোঝাচ্ছে। সুলতান হয়েও আমি বোকা বনে আছি। ওদের হাতের খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছি। অথচ ··

কী ?

আমি কী করবো বুঝতে পারছি না। আমার কিছু করা উচিত।

কী করবেন ?

তাইতো ভাবছি, তোমার কাছে জানতে চাইছি। তুমি বল আমি কী করবো।

আমি ?

হ্যাঁ জুবেদা।

কিন্তু···

কী ?

আমি কী বলবো ?

তুমি কী বলবে ? আবার সেই প্রশ্ন। সৈফুদ্দিন জুবেদার মুখের দিকে তাকাল। তাকে দেখল। বলল, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব জুবেদা ?

বলুন।

আচ্ছা জুবেদা, আমিতো তোমার অনেক ক্ষতি করেছি ? দিনের পর দিন তোমার দেহটার ওপর অত্যাচার করেছি। ফুলের মত নিষ্পাপ ছিলে তুমি, আমি তোমাকে নরকে নামিয়ে নিয়ে গেছি। তুমি কেঁদেছো, আমি ভেবেছি মিথ্যা অভিনয়। আজ তোমাকে আমার বেগম বানানোটা আমার অসংখ্য খেয়ালের একটা। শাহজাদা বলে আমার যে সব বিবিরা সেদিন মনে মনে আমায় অবজ্ঞা করতো, তাদের দেখানো উদ্দেশ্যও হতে পারে। কারণ আজ তারা আমার কাছে আসতে চাইলেও আমি তাদের দূরে ঠেলে দিই। তাদের যেন বোঝাতে চাই, একদিন যাকে তোমরা মূল্য দাওনি আজ তার কাছে তোমাদের কোন মূল্য নেই। তোমরা যেমন ছিলে, তেমনি থাক। একটু চুপ করল সৈফুদ্দীন। জুবেদার মুখের দিকে চাইল। বলল, তুমিও আমাকে ঘৃণা কর, তাই না জুবেদা ?

কেন ?

আমাকে তো সবাই ঘৃণা করে।

তাতে কী ?

তুমি কর না ?

না।

কেন কর না ?

কেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন তুমি আমাকে ঘৃণা কর না? তোমার ভয় নেই জুবেদা, তুমি আমাকে সত্যি কথা বল। যারা সত্যি কথা বলে, আমাকে ঘৃণা করি, তাদের আমি ভালবাসি। কারণ আমি যা করেছি, জিন্দেগী ভর যে দুঃখ সকলকে দিয়েছি, তাতে শ্রদ্ধা ভালবাসা নয়, ঘৃণাই আমার প্রাপ্য। তুমিও আমাকে ঘৃণা কর জুবেদা?

না।

কেন?

কেন?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেন তাই আমি জানতে চাই। কেন তুমি আমাকে ঘৃণা কর না? অস্থির হয়ে উঠল সৈফুদ্দীন। জুবেদার কাছ থেকে দূরে সরে গেল।

হাসল জুবেদা। মৃদুকণ্ঠটা শোনা গেল তার। খুব আস্তে সে বলল, মানুষ অন্যকে ঘৃণা করতে করতে নিজেও ঘৃণীত হয়ে পড়ে। যে শ্রদ্ধা করতে পারে না, ভালবাসতে পারে না, মানুষকে ঘৃণা করার অধিকারও তার নেই।

জুবেদা।

বলুন।

আমি তোমার অনেক ক্ষতি করেছি জুবেদা। তোমার দেহটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি, তোমার জিন্দেগীটা বরবাদ করে দিয়েছি।

কে বললে?

আমি বলছি। কারণ একটা পশু তোমার দেহটায় তার ক্ষুধা মিটিয়েছে। তারপর···

বাধা দিল জুবেদা। বলল, আপনি না হয়ে আমি যদি অন্য কারোর হাতে গিয়ে পড়তুম, সেও আমাকে রেহাই দিত না।

তুমি কি স্বপ্ন দেখনি?

স্বপ্ন !

হ্যাঁ স্বপ্ন। ঘর সংসার স্বামী পুত্র। তুমি কী খোদার কাছে কিছুই চাও নি ?

কেন চাইবো না।

তবে ?

সকলেই তো চায়, লেকিন, পায় ক'জন ? আমিও চেয়েছিলুম, স্বপ্ন দেখেছিলুম। লেকিন, আমার নসিবে যা লেখা আছে তা তো ঘটবেই। আমি আমার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছি। আমার কোন আপশোষ নেই।

তবে তুমি কাঁদতে কেন ?

কাঁদতাম আপনার জন্যে, আপনার কথা ভেবে। আমি জেনানা। খোদা আমাদের অসহায় করে পাঠিয়েছেন। হয়তো তা নয়। দুনিয়ায় আদমী আমাদের অসহায় করে রেখেছে। লেকিন, আমার চেয়েও আপনাকে অসহায় বলে মনে হয়েছিল। শুধুমাত্র ভোগের মোহে অন্ধ হয়েছিলেন আপনি।

আজোও তো তাই আছি।

কেন ?

ওরা আমাকে অন্ধ অসহায় করে রেখেছে। ওই খোদার নূরকুৎব আলম আর তার ভাই আমির জামান খাঁ। তারা আমাকে বোঝাচ্ছে, আমি সুলতান-উস্-সালাতীন। আমার কোন কাজ নেই। আমি শুধু সরাব খাব, ফুর্তি করব। সুলতানী জীবন আমার। কাজ করবে তারা—আমার বান্দার দল। কিন্তু তারা তো কাজ করছে না, করছে অপকর্ম। আমার ভালমন্দ, ইচ্ছা অনিচ্ছার ধার ধারছে না। আমি শুধুমাত্র নামে সুলতান। আমার কোন ক্ষমতা নেই।

কেন ?

আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাখা হয়েছে। আমার নামে ওদের

ইচ্ছামত দেশটাকে শাসন করছে। মানুষগুলোকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমাকে করে রেখেছে বন্দী।

কে বললে ?

আমি বুঝতে পারি। আমি দেখেছি যে মানুষ আমার নাম শুনলে ঘৃণায় মুখ ফেরায়। অথচ আমি মানুষের সঙ্গে মিশতে চাই, তাদের ভাল চাই।

পারেন না ?

হয়তো পারি। কিন্তু আমাকে কিছু করতে দেওয়া হচ্ছে না। সেইজন্যেই আমি তোমার কাছে জানতে চাইছি, আমি কী করবো ? কী করা উচিত আমার ?

আমি বলবো ?

হ্যাঁ জুবেদা। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। একজনকেও বন্ধু বলে মেনে নিতে পারছি না। যাকে বিশ্বাস করতে পারি, যে আমাকে পথ দেখাতে পারে। জুবেদা, তুমি বল আমি কী করবো ? জুবেদার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলো সুলতান সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ।

জুবেদা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল না। সাড়া দিল না সুলতানের কাতরতায়। গবাক্ষপথে আকাশের দিকে দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিল শুধু।

রাত্রি শেষের আকাশ। ক'দিন আগে পূর্ণিমা চলে গেছে। এখন মরা জ্যোৎস্নায় চাঁদের ম্লান ছবি। তারাদের চিহ্নমাত্র নেই। আলোর সমুদ্রে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে তারা। হয়তো লুকিয়ে পড়েছে। অন্ধকার এলে ঘটবে আত্মপ্রকাশ। সেই প্রতীক্ষা তাদের বুকে।

সুলতানের হাত দুটো বড় ঠাণ্ডা। জুবেদার তাই মনে হল। মানুষটা শুধু অসহায় নয়, ভয়ও পেয়েছে। কিন্তু কী করবে সে ? কতটুকু সাধ্য তার ? কিছুমাত্র না। সে জানে, জীবনটা অসম্মান আর লাঞ্ছনার মধ্য দিয়েই সুরু হয়েছিল। দেহটা বহু অত্যাচার

সহ্য করেছে। বহু পুরুষের ভোগের বস্তু হয়েছে একদিন। অটুট যৌবন তাকে বেগম করেছে। হয়তো তার নসিবে ছিল।

কিন্তু সে তো এ জীবন চায় নি। এমন কামনা একটি দিনের জন্যেও মনে জাগেনি। সুদূর ইরাণে জন্মভূমির দ্রাক্ষাকুঞ্জের ছায়ায় খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলাঘর পেতেছিল। হয়তো ছোট্ট একটি নীড়ের স্বপ্নও জেগেছিল মনে। কিন্তু···

জুবেদা!

আবার সেই কণ্ঠস্বর। ভয় পাওয়া একটা মানুষ জানতে চায় সে কী করবে। হাসি পেল তার। মানুষটার মুখের দিকে শান্ত দুই চোখের দৃষ্টি মেলে চাইল।

জুবেদা!

বলুন।

আমি কী করবো জুবেদা?

আমি বলবো?

হ্যাঁ জুবেদা।

না জাহাঁপনা। মৃদুকণ্ঠে বলল জুবেদা। আপনাকে কিছু বলা আমার শোভা পায় না। তাছাড়া আমি নিজেও জানি না, কী বলা উচিত আমার।

বলবে না? হতাশা ফুটে উঠল সে কণ্ঠে।

আমাকে বলতে হবে না জাহাঁপনা। বলবে আপনার মন। বুকে হাত দিন। প্রশ্ন করুন। দেখবেন, উত্তর পেয়ে গেছেন।

জুবেদা তুমি···

আমি আপনাকে পেয়ার করি জাহাঁপনা। আমি আপনার ভাল চাই। তার বেশি কিছু বলার সাধ্য আমার নেই।

জুবেদা কাছে এগিয়ে এল। অশান্ত মানুষটাকে শান্ত করতে চাইল। বলল, রাত শেষ হয়ে এল জাহাঁপনা। এবার শুয়ে পড়ুন। একটু ঘুমিয়ে নিন।

ঘুম আমার আসছে না জুবেদা।

ঠিক আসবে। আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

ঘুমাতে পারবো ?

নিশ্চয়ই পারবেন।

সত্যি সত্যিই শুয়ে পড়লো সৈফুদ্দীন। পাশে বসে পরম স্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো জুবেদা।

একসময় ঘুম নেমে এল সৈফুদ্দীনের ছু চোখে। বলল, প্রভাত হলে আমাকে ডেকে দিও জুবেদা।

জুবেদা বলল, আমি জেগে রইলুম জাহাঁপনা!

সত্য সত্যিই জেগে উঠল সৈফুদ্দীন। সুলতান সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ। বলল, আমি বান্দা নই, আমি সুলতান। এ দেশটার রাজা আমি। আমার নামে অন্যে দেশ শাসন করবে এ হতে পারে না। মানুষের সুখ দুঃখ, ভাল মন্দের বিচার আমি করবো। কারো ন্যায় অন্যায়ের বিচার করা, শাস্তি দেওয়ার অধিকার অন্যের নেই। আমি আছি। সুলতান সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ জিন্দা আছে এখনো।

আজম খান বললেন, এ আপনি কী করছেন জাহাঁপনা ?

কী করছি ? সৈফুদ্দীনও যেন জানতে চাইলেন কথাটা। আমিরের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, কিছু করা না করার অধিকারটুকু কী আমার নেই ?

আমি সে কথা বলছি না জনাব।

তবে ?

সুলতানের তীক্ষ্ণ প্রশ্নটায় সহসা কোন উত্তর দিতে পারলেন না আজম খান। অনেকক্ষণ পরে বললেন, আমি শিহাবুদ্দীনের কথা বলছিলাম জাহাঁপনা।

সেনাপতি শিহাবুদ্দীন ?

হ্যাঁ জনাব।

তিনি কী করলেন ?

আমার সন্দেহ হচ্ছে, সে ভাতুড়িয়া গিয়েছিল।

কেন ?

সেটাই এখনো জানা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে।

অথচ আমাকে চুপ করে থাকতে বলছিলেন।

আজ্ঞে।

শাসন ক্ষমতা আপনার হাতে। এতদিন আমি কিছুই লক্ষ্য করিনি। আমাকে দু'ভাই-এ আপনারা যা ইচ্ছা তাই বুঝিয়েছেন। ভয় দেখিয়ে চুপ করে রেখেছেন। ভয়টা কী, না একটা মন্ত্রেষের ভয়। আমি চুপ করে না থাকলে সেই মানুষটাকে কেড়ে নেবে! কিন্তু সত্যই তা নয়।

জাহাঁপনা!

শিহাবুদ্দীন সত্য সত্যই ভাতুড়িয়া গিয়েছিল ?

সত্যি ?

আপনি ? কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না আজম খান।

সত্যি উজীর সাহাব। আর কেন পাঠিয়েছিলাম জানতে চান ?

কেন ?

গণেশ নারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাঠিয়েছিলাম তাঁকে। আমি জানতে পাঠিয়েছিলাম, আপনাদের চোখে সেই হিন্দু কাফেরটা, যে কাফের ভীতি জাগিয়ে একদিন আপনার দাদা মসনদের প্রতি আমার মনটাকে লোভী করে তুলেছিলেন—সেই কাফেরটা সত্য সত্যই মসনদটা চান কী না ?

চান ?

না, উজীর সাহাব। মসনদ তিনি চান না। মসনদের প্রতি

এতটুকু লোভ নেই তাঁর। চুপ করল সৈফুদ্দীন। ম্লান একটু হাসি ফুটলো তার ওষ্ঠে। বলল, তিনি সুশাসন চেয়েছিলেন।

সুশাসন ?

হ্যাঁ। হিন্দু মুসলমানের সমান অধিকার।

তা কী করে সম্ভব ?

কেন নয় ?

হিন্দু কাফের।

আমিও। আমিও হিন্দুর সমান অধিকার স্বীকার করি। সমান অধিকার দিয়েছিলেন সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, সুলতান সিকন্দর শাহ, আব্বাজান সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহও হিন্দু মুসলমানের সমান অধিকার স্বীকার করতেন। মানুষ তাঁর কাছে ছিল প্রিয়। ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দিতে তিনিও চাননি। বাধ্য করেছিলেন আপনারা। ভুল পথে পরিচালিত করেছিলেন তাঁকে। যখন তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, সংশোধন করে নেওয়ার কথা ভাবছিলেন, ঠিক তখনই···

না, না।

হ্যাঁ উজীর সাহাব, আমি জানি। শত্রু তাঁকে হত্যা করেনি, ষড়যন্ত্র করে তাঁকে খুন করা হয়েছিল। আর কে যে তাঁকে খুন করেছিল, তাও আমার অজানা নয়।

এবার যেন কথা বলার সুযোগ পেলেন আজম খান। বললেন, কে সে জাহাঁপনা ?

কে ?

হ্যাঁ জাহাঁপনা। সুলতানকে খতম করেছিল কে ?

যদি বলি আপনি ?

আমি! প্রথমে বিস্ময়, তারপর ভয় পেলেন আজম খান। চোখের দৃষ্টি তাঁর ভয়ার্ত হয়ে উঠল। যেন প্রতিবাদ করতে চাইলেন, পারলেন না। শেষকালে অনেক কষ্টে বললেন, লেকিন,

জাহাঁপনা, আমি কেন ঝুটমুট সুলতানকে খতম করতে যাব? সুলতানকে খতম করে কী ফয়দা আমার?

লাভ নেই বলছেন?

হ্যাঁ জনাব। আমি আগে উজীর ছিলাম, এখনও সেই উজীরই আছি। আমি তো সুলতান হতে চাইনি?

লেকিন, ক্ষতি তো আপনাদেরই বেশী হচ্ছিল।

আমাদের?

অস্বীকার করতে পারেন? মাথা নাড়ল সৈফুদ্দীন। বলল, হ্যাঁ উজীর সাহাব, ক্ষতিটা আপনাদেরই বেশী হচ্ছিল। কাফের-গুলো তাদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে আপনাদের বদনামী করে তুলছিল! আপনারা তাদের হটিয়েছেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের শেষ জীবনটায় কলঙ্ক গোপন করেছেন। তাঁর ভুলের যদি সংশোধন করেন তিনি, সেই ভয়ে তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

না, না। আবার যেন ভয় পেলেন আজম খান।

উজীরের ভয় পাওয়া মুখখানার দিকে চেয়ে ভীষণ হাসি পেল সৈফুদ্দীনের। উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল সে। সুলতানের এই হাসির কারণ বুঝতে পারলেন না আজম খান। বোকার মত চেয়ে রইলেন শুধু।

অনেকক্ষণ পরে হাসি থামল সৈফুদ্দীনের। দুই চোখ কৌতূহলে চক্‌চক্ করে উঠল তার। গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল, উজীর সাহাব!

জনাব। ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া দিলেন আজম খান।

আমি বড় বুদ্ধু, না উজীর সাহাব?

জী!

হ্যাঁ উজীর সাহাব; সত্যই আমি যদি বুদ্ধু না হতাম, তাহলে আজ এখনও আপনারা আমার শুভাকাঙ্ক্ষীর দল আমাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে পারতেন না। আমি মসনদে বসেছি, সুলতান

বনেছি, ব্যস! অবশ্য একদিন আমি শুধুমাত্র সুলতান বানতেই চেয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করেছিলাম, দরবেশ নূরকুৎব আলমের প্রতিটি কথাই। কাফেরের দল নাকি সর্বনাশ করবে। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বিকিয়ে দেবেন মসনদটাকে। উজীর সাহাব, আমি বিশ্বাস করেছিলাম সে কথা। যোগ দিয়েছিলাম ফকির সাহাবের ষড়যন্ত্রে। লেকিন, তাঁকে একবার সন্দেহ করিনি আমি। কেন জানেন, আমার বিশ্বাস ছিল, খোদার পীর কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না।

চুপ করল সৈফুদ্দীন। আজম খানকে দেখল। বলল, উজীর সাহাব, আপনি তো বললেন, যা করেছেন সব আমার জন্মেই করেছেন। আমার আচ্ছা চেয়েছেন?

জাহাঁপনা।

আমি মেনে নিলাম, যা করেছেন সবই আমার জন্যে করেছেন। আমি যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি। কিন্তু আমি যা চাইনি তাও করেছেন আপনারা।

কী জাহাঁপনা।

জানেন না?

আমি—মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছেন না, বহুৎ আচ্ছা! হাসল সৈফুদ্দীন। বলল, একটা নির্দোষী মানুষকে একদিন কারাগারে নিক্ষেপ করে ছিলেন ষড়যন্ত্র করে। তারপর···

জনাব।

তাকে একদিন হত্যা করেছেন আপনারা। কেন? জবাব দিন। বলুন, আমি কী তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলাম?

আজম খান চুপ করে রইলেন।

সৈফুদ্দীনের মুখখানা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। ভীষণ গলায় ডাকল, উজীর সাহাব।

জাহাঁপনা !

জবাব আপনাকে দিতেই হবে উজীর সাহাব। আমি সুলতান। আমার বিনা হুকুমে কেন আপনারা তাকে হত্যা করেছেন, বলুন ?

সে নিজেই আত্মহত্যা করেছিল জনাব।

আত্মহত্যা করেছিল ?

হাঁ জাহাঁপনা।

মিথ্যা কথা।

না জাহাঁপনা। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি এতটুকু মিথ্যা বলছি না। সত্যই সে আত্মহত্যা করেছিল।

আমি বিশ্বাস করি না।

খোদার নামে আমি কখনও মিথ্যা বলেছি জাহাঁপনা। আমি কুরাণ সরিফ ছুঁয়ে বলতে পারি···

ছিঃ ছিঃ। সৈফুদ্দীনের কণ্ঠে ঘৃণা ঝরে পড়ল। বলল, উজীর সাহাব, খোদা মেহেরবান। সেই মেহেরবান খোদার নাম আপনি উচ্চারণ করবেন না। কারণ আমার মত পাপীও তাঁকে ভয় পায়। নিজের গুণাহের কথা চিন্তা করে তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে আমার জিভটা আড়ষ্ট হয়ে যায়। জানেন উজীর সাহাব, আমি আমার জীবনের পাপ স্খলনের জন্যে কখনো তাঁর দোয়া ভিক্ষা করি না। আমি তাঁকে ডাকি, তাঁর নাম নিই, আর বলি, খোদা আমি জানি আমি পাপী। পাপের বিষ মিশে গেছে আমার রক্তে। ভাল হতে চাইলেও আমি তা পারবো না। কারণ পাপ করার একটা নেশা আছে। পাপ করবো না বলে কথা দিলেও হয়তো তা রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠবে না আমার পক্ষে। তোমার বিচারে যে শাস্তি আমার প্রাপ্য হয় তাই দিও আমায়। আমি হাসি মুখে তোমার দেওয়া শাস্তি গ্রহণ করবো। যদি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ জীবনে শেষ হয় তাহলে পরজন্মে আমাকে তুমি দোয়া কর খোদা। কারণ যারা পাপ করে, সেই পাপীদের বড় যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার হাত

থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দিও। একটু চুপ করল সৈফুদ্দীন। নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করল সে। এক সময় ব্যথীত কণ্ঠে বলল, কোরাণ শরিফ স্পর্শ করতে শয়তানের বুক কাঁপলেও হাত কাঁপে না। এ দুনিয়াটাতে এসে আমিও কম শয়তানী করিনি তো?

জাহাঁপনা!

জানি উজীর সাহাব, আপনি কী বলবেন। না, আপনাকে মিথ্যে কষ্ট দেব না। লেকিন, ইয়াদ রাখবেন, শয়তানও যদি সুলতান হয়ে মসনদে বসে, শয়তানীটা তারও ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়।

আজম খান নীরবে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটি কথাও বলতে পারলেন না তিনি।

সৈফুদ্দীন বিস্মিত বিমূঢ় উজীরের চোখের সামনে দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল। একবারও পিছন ফিরে চাইল না।

জুবেদা!

বলুন?

বলুন নয় জুবেদা।

তবে?

আমি তোমাকে কাছে পেয়েছি জুবেদা। তোমাকে আমি আমার একান্ত নিজের করে পেয়েছি। ধন্য হয়েছি। কিন্তু তুমি আমাকে আপন ভাবে গ্রহণ করতে পারনি।

কে বললে?

আমি বলছি জুবেদা। বল, সত্যি কী না?

না।

না নয়, হ্যাঁ জুবেদা। ব্যবধানের প্রাচীরটুকু আজও তোমার আমার মনের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি নিশ্চয়ই ভুলতে পারনি অতীতটাকে। একটা নারীমাংস লোভী

ক্ষুধার্ত শয়তানের সেই অত্যাচারের দিনগুলো। তুমি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছো, আমি উল্লাসে হেসে উঠেছি। আমি···

না, না।

না নয়, হ্যাঁ জুবেদা।

সত্যি নয়।

মিথ্যাই বা বলি কেমন করে?

কেমন করে?

হ্যাঁ জুবেদা, কেমন করে? কেমন করে বিশ্বাস করি, তুমি সব ভুলে গেছ। অতীতটাকে মুছে ফেলেছো মন থেকে। আমার সব অপরাধ ক্ষমা করেছো। আমাকে গ্রহণ করেছো?

বুঝতে পারেন না?

পারি না বললে মিথ্যা বলা হয়, পারি। কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ জাগে। আমার মনে হয়, এ বুঝি সত্য নয়।

কী?

তুমি আমার?

সত্যই আমি আপনার।

কিন্তু কেমন করে তা বুঝবো, বিশ্বাস করবো? বলবে, আমার বুকে মাথা দিন, কান পেতে শুনুন—তোমার রক্ত কল্লোলে সদা আমার নামই উচ্চারিত হচ্ছে। আমি শুনেছি জুবেদা। তুমি যখন আমার বুকের গভীরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো তখন অনেক দিন আমি শুনেছি। একটা পাপীকে সত্যই তুমি ভালবেসেছো। কিন্তু জুবেদা, তবু তুমি আজও কেন আমাকে 'তুমি' বলতে পারলে না। জুবেদা বল, চুপ করে থেকো না। এটুকু বাধার প্রাচীর কেন তুমি সৃষ্টি করে রেখেছো? বল জুবেদা, আমি শুনতে চাই। সত্য শোনার সাহস আমি অর্জন করেছি। তুমি আমার অন্ধকারময় জীবনে আলো জ্বলিয়েছো। সত্যকে স্বীকার করতে আজ আর আমার কোন বাধা নেই। তুমি বল।

আপনি সুলতান।

আমি যখন মসনদে বসি তখন, এখন নয়।

একজন আদমীই মসনদে বসেন।

সত্য, কিন্তু সুলতান হয়ে সব সময় নিজের অস্তিত্বটুকু বাঁচিয়ে চলতে চাই না। আমি জানি, একটা সাধারণ মানুষ অনেক সহজ, অনেক সরল। সে মানুষটার জীবনও স্বচ্ছ। আমিও সেই স্বচ্ছ জীবনের অধিকারী হতে চাই। আমি একটা সাধারণ মানুষের মত বেঁচে থাকতে, জেগে উঠতে চাই। এই যে তুমি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ। একদিন অনেক আশরফির বিনিময়ে তোমার দেহটাকে সংগ্রহ করে ছিলাম। তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা কোন কিছুরই পরোয়া করি নি। জোর করি নি, বাধাও তুমি দাওনি। কারণ তুমি জানতে তোমার দেহটাকে ভোগ করার জন্যেই আমি তোমাকে সংগ্রহ করেছি। বিনা বাধায় তোমার দেহটাকে ভোগ করেছি। ইচ্ছে এবং খুশিমত। আজ দিনের পরিবর্তন হয়েছে। তোমাকে বেগম বানিয়েছি। লেকিন, তোমার সেই মনটার এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। এখন আমি যদি হাত বাড়াই তোমার দিকে। ওই যে বাঁদী আর খোজাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে যে যার নিজের কাজে, আমাদের নিশ্চয়ই দেখছে ওরা। ওই তো বুড়ো খোজাটা আড়চোখে ভয়ে ভয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছে। ও ভাবছে, আমি ওকে লক্ষ্য করছি না। আগে কোন দিন বাঁদী আর বান্দাগুলোর কথা ভাবতাম না। না না, ভাবতাম বৈকী। ওদের পোষা জানোয়ার ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতাম না। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওদের সামনে এখন আমি তোমাকে কাছে টেনে নিই। তোমার ওই বহুমূল্য পরিচ্ছদে ঢাকা দেহটা থেকে যদি প্রতিটি পোষাক খুলে নিই, অথবা যদি তোমাকেই তোমার দেহটা আবরণ মুক্ত করতে বলি, আমার বিশ্বাস, তুমি বাধা দেবে না। কিংবা আমার নগ্ন ইচ্ছাটাকে আদেশ বলে মেনে নিয়ে তোমার সুন্দর দেহটাকে

নিশ্চয়ই নগ্ন করে তুলবে। কেন জান? তোমার মনে এখনও সেই বাধার প্রাচীরটা বর্তমান। তুমি তোমার অতীতটাকে ভুলতে পার নি। অতীতের সেই লজ্জা আর যন্ত্রণার দিনগুলোকেও। তোমার মনে এখনও আমি সেই শয়তান রূপেই বিরাজ করছি। একটা কামান্ধ পশু। বিশ্বাস আর ব্যাভিচার তাকে শুধুমাত্র অন্যায় করতে শিখিয়ে ছিল। জুবেদা একটা সাধারণ মানুষ। একজোড়া স্বামী স্ত্রী। তারা তাদের দেহ মিলনকে পবিত্র ভাবে। না-না তাদের সে মিলন কামনাহীন নয়। একে অন্যের প্রতি আকর্ষীত না হলে তো মিলন সম্ভব নয়। কিন্তু তবু তাদের মিলন পরস্পরের বোঝা পড়ায়। একের ইচ্ছায় অন্যের অনিচ্ছা তাদের বিরত করে। কারণ তারা পশুত্বকে ঘৃণা করে। আর জানো, আজ আমারও তাদের মত হতে ইচ্ছা করে। আজ তুমিও ডাক দাও আমায়। তোমার ইচ্ছার মূল্য দিতে চাই। আমরা পরস্পরের হতে চাই। আমরা পরস্পরকে একান্ত আপন করে পেতে চাই। জুবেদা, বল, আমরা কা নতুন ভাবে বাঁচতে পারি না।

জুবেদা নীরব।

জুবেদা! দূরন্ত আকুলতা ঝরে পড়ল সৈফুদ্দীনের কণ্ঠে।

জুবেদা চোখ মেলে চাইল। এ দৃষ্টিপাত তার যেন এই প্রথম। মানুষটার অসহায় বিপন্ন মূর্তিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখল সে। কে এ? শাহজাদা? সুলতান? না, অন্য কেউ? জুবেদা যাকে দেখেনি, চেনে না, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা পুরুষ মূর্তি।

জুবেদা! আবার সে কণ্ঠটা ডাক দিল।

জুবেদা তবু নীরব। তার মনে সংশয়।

জুবেদা!

আমি?

হ্যাঁ হ্যাঁ জুবেদা, তুমি। আমি তোমাকেই ডাকছি যে। তুমি কী শুনতে পাচ্ছ না?

কেন ?

তোমাকে আজ আমার বড় প্রয়োজন জুবেদা। আমি তোমাকে চাই—শুধু তোমাকে।

মসনদ, সুলতানী ?

কিছু না। আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু চাই না জুবেদা।

সত্যি ?

সত্যি-সত্যি-সত্যি !

হাসল জুবেদা। হাত ধরল। মৃদুকণ্ঠে বলল, আমিও তো তোমাকেই চেয়েছি !

সাত

না, প্রতিরোধ নয়, আক্রমণ। শত্রুকে আক্রমণের সুযোগ আমরা দেব না, তাদের আক্রমণ করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। যদি সে সুযোগ দিই, আমরা ভুল করব। হয়তো সে ভুলের সংশোধন করা সম্ভব হবে না কোনদিন। তাই আমার মনে হয়, আক্রান্তের ভূমিকা না নিয়ে আমাদের আক্রমণ করাই উচিত। সুলতান শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহকে বুঝিয়ে দেওয়া কর্তব্য, বাঙ্গালী অন্যায় আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করে না। হিন্দুর যুদ্ধক্ষম বাহু এখনও অবশ নিস্তেজ হয়ে পড়েনি। বিনা কারণে সুলতান যাঁকে বিদ্রোহী বলে গণ্য করেছেন, তিনি এবার তাঁর সত্যকারের পরিচয় দেবেন।

যদু নারায়ণের কণ্ঠস্বরটা প্রতিবাদ জানাল যেন। কথাগুলো বলে কয়েক মুহূর্ত সকলের মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল সে। সে ভেবেছিল, কেউ হয়তো প্রতিবাদ জানাবেন তার কথার। কিন্তু সকলেই চুপ করে রইলেন। চিন্তিত তাঁরা। গভীর সঙ্কট আজ উপস্থিত। বিদ্রেহী প্রতিপন্ন হয়েছেন গণেশ নারায়ণ। সুলতানের আদেশ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেজন্যে ভাতুড়িয়া অভিমুখে সসৈন্যে ছুটে আসছেন শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ। সামান্য এক ভূ-স্বামীর ঔদ্ধত্যের শাস্তি তিনি দেবেন। ধ্বংস করবেন গণেশ নারায়ণের সাধের ভাতুড়িয়া।

সেই কথাই চিন্তা করছিলেন তিনি। বারবার বুকের মধ্যটা কেঁপে উঠছিল তাঁর। দুশ্চিন্তা জেগেছে মনে। আর এই দুশ্চিন্তাটুকু ভাতুড়িয়ার মানুষের জন্যে। সুলতানের সৈন্যদল তো তাদেরই ঘরে হানা দেবে আগে। এখন অগ্রায়ণের মধ্যভাগ। মাঠে মাঠে

সোনালী ফসল। মানুষের সারা বছরের ক্ষুধার অন্ন। হয়তো তারা সবকিছু তছনছ করে আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

মাত্র দুবছর আগে ৮১৫ হিজরায় (১৪১২ খ্রীঃ), মধ্যাহ্নে আহারের সময় হঠাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সুলতান সৈফুদ্দীন হম্জা শাহ। একটা খেয়ালী মানুষ বিদায় নিল,পৃথিবীর আলো বাতাসের মাঝ থেকে। তিনি তখন পাণ্ডুয়ায়। সুলতান সাহায্য চেয়েছিল তাঁর। চেয়েছিল সৎ হতে, সুশাসনে রাজ্য পরিচালনা করতে।

সন্দেহ ছিল। আজম খান আর দরবেশ নূরকুৎব আলমের ষড়যন্ত্র বলে মনে করেছিলেন। বার বার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেনাপতি শিহাবুদ্দীনকে। তারপর একদিন···

রাত্রির আহার সবেমাত্র শেষ করে উঠেছেন। এমন সময় ব্রজ এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে।

কী রে? জানতে চেয়েছিলেন তিনি। বাড়ি যাসনি?

বাড়ি তো যাচ্ছিলাম।

তবে ফিরে এলি কেন?

একজন ফকির তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ফকির! আশ্চর্য হয়েছিলেন তিনি। এতো রাত্রে ফকির এলো কোথা থেকে?

আমারও তাই মনে হয়েছিল। ব্রজ বলেছিল, বাড়ি যাওয়ার সময় দেখতে পেলুম সিংহদ্বারের প্রহরীদের কী সব যেন বোঝাচ্ছে লোকটা। কাছে গিয়ে শুনলুম, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। রক্ষীরা বলছিল, আজ রাত্রে আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। লোকটা নাছোড়। আপনার সঙ্গে তার দেখা না করলেই নাকি নয়। আমাকে দেখে জানতে চাইল কী করবে? একবার ভাবলাম, ভাগিয়ে দিই। তারপর মনে হল, তোমাকে জানানোই ভাল।

আমার সঙ্গে দেখা না করলেই নয়?

তাইতো বললে। বলেছিল ব্রজ।

চিন্তিত হয়েছিলেন তিনি। কোন দরবেশ কিংবা ফকির যে কখনো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি তা নয়। ভাতুড়িয়ার অনেক মোল্লা, ফকির, দরবেশই তাঁর পরিচিত। অনেকের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ভাল। অনেকেই দেখা করতে আসেন। তাঁদের অভাব অভিযোগ জানিয়ে যান। কখনো বা শুধুমাত্র সাক্ষাতের জন্যেই আসেন। কিন্তু সকলেই আসেন দিনের আলোয়। একপ্রহর রাত্রে আগে কেউ কোনদিন আসেন নি।

চিন্তা করেছিলেন তিনি। অনেক কথাই ভেবেছিলেন। একবার ভেবেছিলেন সাক্ষাৎ করবেন না। কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়েছিল যে-ই হোক, বিনা প্রয়োজনে নিশ্চয়ই আসেন নি। সাক্ষাৎ করা উচিত তাঁর। কিন্তু প্রয়োজনটা যে কী, তা তিনি অনেক চিন্তা করেও স্থির সিদ্ধান্তে পোঁছাতে পারেননি। ব্রজকে বলেছিলেন, ব্রজ, ফকিরকে তুই গিয়ে বসা, আমি যাচ্ছি।

ব্রজ বলেছিল, দেখা করবে?

দেখা করা উচিত আমার। আর শোন, তুই থাকবি।

ব্রজ চলে গিয়েছিল। পোষাক পরিবর্তন করেছিলেন তিনি।

সত্যবতী এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়েছিল। কাছে এগিয়ে এসেছিল সে। কী যেন বলতে চেয়েছিল।

বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু একটু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, ব্রজ কাছে থাকবে।

তবু সত্যবতীর মনটা প্রবোধ মানেনি। কথা বলেছিল এবার। বলেছিল, আমার কিন্তু ভাল বোধ হচ্ছে না।

না, না, ভয় নেই। স্ত্রীকে সাহস দিয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া সত্যিই ভয়ের কারণ ছিল না। যে কক্ষে ফকিরকে বসানো হয়েছিল, তাঁর পাশের কক্ষেই সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে ছিল ব্রজ। গুপ্তগৃহ সেটি। কারো সাধ্য নেই যে বুঝতে পারে, একজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে সব কিছু।

তিনি কক্ষে প্রবেশ করতেই আগন্তুক ফকির আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মৃদু কণ্ঠে সালাম জানিয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনিও নমস্কার জানিয়েছিলেন ফকিরকে।

হেসেছিলেন ফকির। নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, এতরাত্রে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখীত। কিন্তু বিরক্ত না করেও আমার উপায় ছিল না।

আমি জানতাম। মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন তিনি।

কী জানতেন? ফকিরের দুই চোখে কৌতূহল জেগেছিল।

আপনি আসবেন। সেইভাবেই মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন তিনি।

আমি আসবো আপনি জানতেন! ফকিরের যেন বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তারপরই যেন অবিশ্বাস জেগেছিল। বলেছিলেন, আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই তো?

সবে মাত্র হ'ল।

তাহলে? মাথা নেড়েছিলেন ফকির। বলেছিলেন, আপনি কেমন করে জানলেন, আমি আপনার কাছে আসবোই?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ঠিক জানতাম বললে ভুল কিংবা মিথ্যা বলা হয়। আমার অনুমান, আমি অনুমান করেছিলাম মাত্র। আর আমার অনুমানটা যে মিথ্যা নয় তা প্রমাণীত হয়ে গেল।

ফকিরের আর বাক্যস্ফুর্তি হয় নি। তিনি নীরবে আসন গ্রহণ করেছিলেন।

গুপ্ত কক্ষে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল ব্রজ। সে যেন কিছুই বুঝতে পারছিল না। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। কেমন যেন সন্দেহ জাগছিল মনে। তার মনে হচ্ছিল···

ব্রজকে ডেকেছিলেন তিনি। কক্ষের দেওয়াল ভেদ করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। হাতে মুক্ত তরবারি। ওর বিমূঢ় মূর্তিটা দেখে হাসি পেয়েছিল তাঁর। বলেছিলেন, ব্রজ, তোর হাতের ওটার

আর প্রয়োজন নেই। এখন এক কাজ কর। কিছু আহার্য আর পানীয় নিয়ে আয়।

না, না। ক্ষীণ আপত্তি জানিয়ে ছিলেন ফকির।

তিনি হেসেছিলেন। বলেছিলেন, দীনের কুটীরে যখন অনুগ্রহ করে পদার্পণ করেছেন, তখন সামান্য আতিথ্যেয়তাটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

আদেশ পেয়ে ব্রজ চলে গিয়েছিল।

সৈফুদ্দীনের তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি। জিজ্ঞাসা করেছিল, সত্যি বলছেন, আমাকে আপনি চিনতে পেরেছেন?

বিলক্ষণ। হেসেছিলেন তিনি। এ কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিত বলে মনে হয়েছিল। ছদ্মবেশ আমাকে এতটুকু বিভ্রান্ত করতে পারে নি। যেটুকু সন্দেহ ছিল, আপনার কণ্ঠস্বর শুনেই দূর হল। যদিও কণ্ঠস্বরকে আপনি যথাসম্ভব বিকৃত করেছিলেন। আর সাবধানতা অবলম্বন আমিও করেছিলাম। একজন ফকির এই রাত্রে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, বড় জরুরী তাঁর প্রয়োজন, আমার মনে সত্যই সন্দেহ জাগিয়েছিল।

আর কেন আমি এসেছি?

সহসা কোন উত্তর দেননি তিনি। একটু নীরব থেকে বলেছিলেন, আমার অনুমান। আমার বিশ্বাসটা মিথ্যা হয় নি।

আমাকে আপনি বিশ্বাস করেন?

করি।

কেন?

কেন? আবার নীরব হলেন তিনি। নিজের মনেই ক্ষণেক চিন্তা করেছিলেন। ম্লান কণ্ঠে বলেছিলেন, ইলিয়াস শাহী বংশ চিরদিন মানুষের মূল্য দিয়ে এসেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রথম স্থান পেয়েছে মানুষ, ধর্ম নয়।

কিন্তু আব্বাজান···

বাধা দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ তাঁর শেষ জীবনে ভুল কিছু করেছেন সত্য, কিন্তু সেই ভুলটুকুই তাঁর বিচারের মাপকাঠি নয়। ভুল মানুষই করে, সংশোধনও করে। তাঁর ভুলের সংশোধন তিনি করতেন কিনা আমি জানি না। কিংবা তিনি তা করতে চাইলেও তাঁকে তা করতে দেওয়া হ'ত না। কারণ তাঁকে ঘিরে যে চক্রান্তের জাল বিস্তার শুরু হয়েছিল, সাবধান হয়েও বাঁচতে পারেন নি। দোষ যে তাঁর ছিল না তাও নয়। একদিন তাঁর মনে লোভের ছায়া মাত্র ছিল না। তিনি ঘৃণা করতেন অন্যায় আর অসত্যকে। তিনি প্রতিকার কামনা করেছিলেন। বাঁচতে চেয়েছিলেন। তাঁর দুর্ভাগ্য, মৃত্যু এনে দিয়েছিল সুলতান সিকন্দর শাহের। পিতা পুত্রের বাঁচার লড়াইয়ে নিহত হয়েছিলেন পিতা। সুলতান হয়ে মসনদে বসেছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন মানুষের ভাল করতে। কিন্তু ভুলতে পারেন নি একজনের মৃত্যুর বিনিময়ে তিনি মসনদে বসেছেন। শেষ জীবনে পাপ বোধ জেগেছিল মনে। দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সেই সুযোগ নিয়েছিল শয়তানের দল। যারা ধর্মান্ধতার দুরারোগ্য ব্যাধীতে ভুগছে। সহস্র পাপ করে যারা নিজেদের ভাবে পূণ্যবান। অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়াসী সুলতান তাদের হাতে খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন।

আমাকেও তারা তাই করতে চায়। সৈফুদ্দীনের কণ্ঠটা আর্তনাদ করে উঠেছিল।

আপনাকেও? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

হ্যাঁ, আমাকেও। বলেছিল সৈফুদ্দীন। একটু ম্লান হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠেছিল ওষ্ঠে। একটু করুণ শুনিয়ে ছিল তার কণ্ঠটা। আমি শাহজাদা ছিলাম। সুলতান বানিয়েছে তারাই।

কেন?

আব্বাজান কাফের বনে যাচ্ছিলেন। একদিন যা স্বীকার

করেছিলেন, পরে তাই অস্বীকার করতে শুরু করেছিলেন। একদিন স্পষ্ট বলে ফেলেছিলেন, হিন্দুদের ওপর অত্যাচার যেন বন্ধ করে তারা।

তারপর ?

আব্বাজানের ইন্তেকাল এসে গেল। আমি তাদের কথায় সুলতান বানতে রাজি হলাম। তারা খতম করে দিল আব্বাজানকে।

হাসি ফুটেছিল তাঁর মুখে। সৈফুদ্দীনের মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, কিন্তু লোকে বলে আমিই নাকি ষড়যন্ত্র করে সুলতানকে শেষ করেছি।

ওরা তাই প্রচার করছে।

আপনি ?

আমি ? সৈফুদ্দীনও যেন চিন্তা করেছিল কথাটা। বলেছিল, আমিও ওদের প্রচারে সায় দিয়েছিলাম। সায় দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ ওরা যে আমার হাতে মসনদটাকে তুলে দিয়েছে। লেকিন···

কী ?

ওরা ভেবেছিল, আমি মসনদে বসলে ওদের সুবিধে হবে। ওদের যা ইচ্ছে তাই করবে ওরা। আমি শুধু বসে দেখবো। ওরা ওদের বিকৃত লালসা চরিতার্থ করবে। হিন্দুর ঘর জ্বালাবে, তাদের ঘরের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। আমিও প্রথম প্রথম মেনে নিলুম। কোন প্রতিবাদ জানালাম না। কী করে জানাবো ? প্রতিবাদ জানাবার মত বোধশক্তি আমার ছিল না। না, না, বোধশক্তি ছিল। বোধশক্তি যদি না-ই থাকবে, এখন প্রতিবাদ জানালাম কী করে ? কী করে বললাম, এ অন্যায় ? এর নাম অত্যাচার। তোমরা সাবধান হও। বন্ধ কর এই অত্যাচার। কী করে বললাম জানেন ? একদিন আমি শয়তান ছিলাম। আমার আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি জানোয়ার বনে গিয়েছিলাম

ভোগ-লালসার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিলাম। সরাব আর জেনানা। আর কিছু নয়, কিছু চাইতাম না। নারীর দেহটাই শুধু চেয়েছিলাম। আমার শাদি করা বিবিদেরও আমি আমার ভোগ্যবস্তু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি। নারীর ভালবাসা পেয়ার মহব্বৎ সব ঝুট! কিন্তু একদিন আমার ঘুম ভাঙল। আমি জেগে উঠলাম। আমি দেখেছি, যেসব জেনানাকে আমি ভোগ করেছি, যাদের দেহগুলো নিয়ে আমি দিনের পর দিন ছিনিমিনি খেলেছি, তারা শুধু অসহায় কান্নায় বুক ভাসিয়েছে আর অভিশাপ দিয়েছে। কেউ ক্ষমা করেনি, ভালবাসেনি, খোদার কাছে আমার জন্যে প্রার্থনা জানায় নি। বলেনি, খোদা ও জানে না ও কী করছে। ওকে তুমি দোয়া কর। যা আমার বিবিরা পারেনি, জুবেদা তাই পারল। জুবেদা আমায় নতুন জীবনের পথ দেখাল। আমি ভালবাসলাম, নারীকে সম্মান দিতে শিখলাম। যে পুরুষ নারীর যোগ্য সম্মান দিতে জানে না, সে শয়তান, পশু। তখনই আমার মনে হল, হিন্দুর ঘর ভাঙছে মুসলমান। মোল্লার দল ধর্মের ভাঁওতায় ভুলিয়ে জোর করে হিন্দুদের করছে ধর্মান্তরীত। যে ঘর তারা ভাঙছে, সে ঘরের রক্ষক আমি। আমি সুলতান।

চুপ করেছিল সৈফুদ্দীন। অনেকক্ষণ নীরবে বসেছিলেন তিনিও। কথা বলেননি। দেখছিলেন মানুষটাকে। একদিন পরিচিত ছিল তাঁর। মনে ছিল ঘৃণা। উচ্ছৃঙ্খল শাহজাদাকে সত্যই তিনি খুব ঘৃণা করতেন। শাহজাদা সৈফুদ্দীনের নামে বাংলার মেয়েদের বুক কাঁপতো।

শাহজাদা নয় সুলতান। সুলতান সৈফুদ্দীন জেগে উঠেছে। জেগে উঠেছে একটা মানুষের মন। বাঁচাতে চায় মানুষের ধর্ম!

সত্য নয়, যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল তাঁর। সুখস্বপ্ন। যে স্বপ্নের সাধনায় তিনিও ব্রতী হয়েছেন। তাঁরও তো মর্মকথা মানুষের অধিকার। ধর্ম নয়, মানুষ। মানুষের প্রথম পরিচয়, সে

মানুষ। ধর্ম তার প্রাণের সম্পদ। প্রাণের সম্পদ নিয়ে কেন ছিনিমিনি খেলবে শয়তানের দল। কোন অধিকারে?

সৈফুদ্দীন ডেকেছিল, আমির সাহাব!

চমকে উঠেছিলেন তিনি। বিস্মিত হয়েছিলেন।

হেসেছিল সৈফুদ্দীন। বলেছিল, যে ভুল আব্বাজান করেছিলেন, সে ভুলের সংশোধন করতে চাই আমি। অতীতের সব কথা ভুলে গিয়ে আপনি আমার পাশে দাঁড়ান। আমাকে সাহায্য করুন। আপনার বিনা সাহায্যে আজ আমার পক্ষে পথ চলা সম্ভব নয়।

কিন্তু···

আপনাকে সাহায্য করতেই হবে। বলেছিল সৈফুদ্দীন। শিয়াবুদ্দিনকে বারবার ফিরিয়ে দিয়েছেন আপনি। সে বারবার আমার কাছে ফিরে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে পেরেছি, আমি ডাকলে আমার ডাক আপনি শুনবেন না। শিকারে বেরিয়েছি তাই। শিকার মিথ্যা। আমি আপনার কাছেই এসেছি।

কিন্তু আমি কী করতে পারি জাহাঁপনা?

আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারেন আমির সাহাব। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনার শক্তির ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। তাছাড়া···

কি?

একদিন আমি শয়তান ছিলাম। অনেক গুণাহ করেছি। পাপের পথ আজ পরিত্যাগ করতে চাই। ভাল হতে চাই, ভাল করতে চাই মানুষের। লেকিন···

কী?

জানেন, অন্যায় করার একটা মোহ আছে। আজ সে মোহ কাটিয়ে উঠেছি সত্য, কিন্তু চিরদিন যে পারবো তা নাও হতে পারে। সেইজন্যই আপনাকে আমার প্রয়োজন। আব্বাজানের

দোস্ত ছিলেন আপনি। তাঁকে অনেকবার অনেক বিপদে সাহায্য করেছেন, বাঁচিয়েছেন। আমাকেও আপনি বাঁচান। কারণ আজ আমার সবই আছে, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু একজনও নেই।

তাঁর হাত দুটি জড়িয়ে ধরেছিল সৈফুদ্দীন। কাতরতায় সাড়া দিয়েছিলেন তিনি। ফিরে গিয়েছিলেন পাণ্ডুয়ায়। কিন্তু মাত্র কটা মাস। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত সৈফুদ্দীন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হল। শয়তানের দলও সুযোগমত সক্রিয় হয়ে উঠল। মসনদটা নিয়ে শুরু করতে চাইলো ছিনিমিনি খেলা।

কঠিন হলেও তিনি শক্ত হাতে হাল ধরলেন। ডেকে পাঠালেন সেনাপতি শিয়াবুদ্দীনকে। বললেন, আগামীকাল মসনদে বসবেন আপনি।

আমি? শিয়াবুদ্দীন চমকে উঠেছিল। প্রবীণ সেনাপতি যেন বিশ্বাস করতে পারেননি তাঁর কথাটা।

হ্যাঁ আপনি। দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন তিনি। আজ আপনার মত মানুষকেই আমার প্রয়োজন।

লেকিন···

বলুন?

সুলতান সৈফুদ্দীনের কোন পুত্র নেই সত্য, কিন্তু ইলিয়াস শাহ বংশের শাহজাদা তো ক'জন আছেন?

আমিও তা জানি।

তাহলে?

শাহজাদা আছে সত্য, কিন্তু মানুষ নেই। এক একটি অপদার্থ জীব সব। আরাম খোঁজে। খায় আর ঘুমায়। আর কোন কাজ নেই তাদের। সব খবরই আমি নিয়েছি।

তাহলে?

আমি চাই শক্ত হাত। প্রয়োজনে যে হাতটা শয়তানের টুঁটি চেপে ধরতে পারবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমান অধিকার দেবে

মানুষকে। ভাঙবে মোল্লাদের শয়তানি চক্র। বন্ধ করবে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অত্যাচার।

আমিও তো মুসলমান?

কিন্তু আপনি বাঙ্গালী। একদিন হিন্দুর ঘরে জন্ম হয়েছিল আপনার। শিরা উপশিরায় ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে হিন্দুর রক্ত। হিন্দুর কাছে ধর্ম যে কী তা আপনি জানেন। সেইজন্যেই হিন্দু মুসলমানের রক্ষকরূপে দেখতে চাই আপনাকে।

৮১৫ হিজরার শেষে (১৪১২ খ্রীঃ) বাংলার মসনদে বসলেন শিহাবুদ্দীন। সুলতান শিহাবুদ্দীন বায়জিদ শাহ। সেনাপতি শিহাবুদ্দীনকে মসনদে বসিয়েছিলেন তিনিই। ভেবেছিলেন, শান্তি ফিরবে, বন্ধ হবে অত্যাচার। ভুল! ভুল করেছিলেন তিনি। এমন ভুল গণেশ নারায়ণ জীবনে আর করেননি।

সেদিন যদু তাঁকে নিষেধ করেছিল, শিহাবুদ্দীনকে দিয়ে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। আজ ক্ষমতার লোভে তিনি সম্মত হচ্ছেন। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমান অধিকারের। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রমাণিত হতে দেরী হবে না।

হলও তাই। মাত্র কটা মাস পার হওয়ার পরই বুঝতে পারলেন তিনি। বুঝতে পারলেন, যদুর কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। রক্তের ঋণ ভুলে গেছেন শিহাবুদ্দীন বায়জিদ শাহ। ভুলে গেছেন তাঁর ঋণের কথা। সামান্য একজন সেনাপতির বাংলার মসনদ লাভ গণেশ নারায়ণের জন্যেই সম্ভব হয়েছিল।

বুঝতে পারেন অনেক কিছুই। বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আবার শুরু হল হিন্দুর আর্তনাদ, ক্রন্দন। প্রৌঢ় সুলতান। কিন্তু হিন্দু নারীতে পূর্ণ হতে শুরু করলো হারেম।

একদিন প্রতিবাদ জানালেন তিনি। বললেন, এ অন্যায়!

অন্যায়? কথাটা বলে শিহাবুদ্দীন এমন ভাবে তাঁর মুখের

দিকে তাকিয়ে ছিলেন যেন কথাটা তিনি সেই প্রথম শুনলেন। হাসলেন। বললেন, কী ন্যায় আর কী অন্যায় তা কী আমি জানি না? ন্যায় অন্যায়ের শিক্ষার পাঠ নেওয়া কী আবার নতুন করে আপনার কাছে শুরু করতে হবে আমির সাহাব?

শিহাবুদ্দীনের কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারেননি। ভেবেছিলেন কী বলবেন? যোগ্য কী উত্তর দেওয়া যায়। চুপ করে থাকেননি, উত্তর দিয়ে ছিলেন। বলেছিলেন, আপনি সুলতান। বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, মালেক। কিন্তু এই সুলতানী তখ্‌তে আমিই আপনার হাত ধরে বসিয়েছিলাম। অবশ্য আপনার যোগ্যতা আমি অস্বীকার করি না। আমির ওমরাহের দল যদি আপনাকে মেনে নিতে না চাইতেন, তাঁদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা আপনার ছিল। আপনার হাতে ছিল সৈন্যবাহিনী। কিন্তু এ কথাটাও ভুলে যাবেন না, সেদিন অন্য কিছুও ঘটতে পারতো। হয়তো পরিবর্তে অন্য কেউ সুলতান হয়ে মসনদে বসতে পারতেন।

পারতেন শুধু আপনার জন্যেই, এইতো?

কথাটা কী মিথ্যা?

মিথ্যা হয়তো নয়। আপনার সাহায্য আমি পেয়েছি ঠিকই। কারণ আমাকে সাহায্য না করেও আপনার উপায় ছিল না। আমি যদি মসনদে না বসতাম, আপনাকেও ফিরে যেত হ'ত ভাতুড়িয়ায়। আমি সুলতান হয়েছি আমার নসিবের জোরে। খোদা আমাকে দোয়া করেছেন।

সেইজন্যেই আপনি আপনার ইচ্ছামত চলছেন? হিন্দুদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছেন?

হিন্দুরা জিম্মি!

কিন্তু আপনিও একদিন হিন্দু ছিলেন?

সেটা আমার দুর্ভাগ্য।

শিহাবুদ্দীনের কথাটা শুনে মনটা ঘৃণায় ভরে গিয়েছিল। তাঁর কথা বলতে ইচ্ছা করেনি। অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করেছিলেন। পাণ্ডুয়ায় থাকা আর যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি তাঁর। বলেছিলেন, আমি আগামীকালই ভাতুড়িয়া ফিরে যেতে চাই।

কেন ?

এরপর আপনার কাছে দাসখত্ লিখে দিয়ে পাণ্ডুয়ায় থাকা কী উচিত হবে ?

কিন্তু ফিরে যাব বললেই তো ফিরে যাওয়া যায় না আমির সাহাব ?

সে কথাটা আমি বেশ ভাল ভাবেই জানি।

তাহলে মিথ্যা কেন ফিরে যেতে চাইছেন ?

আমি জানি, আমার গতিরোধ করে এমন সাধ্য কারো নেই।

বাংলার সুলতানেরও ?

সুলতান শিহাবুদ্দীন বায়জিদ শাহের যে নেই, এটা আমি বেশ ভালভাবেই জানি। জানেন আপনিও। তবু যদি চান, একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

কথাটা বলে আর দাঁড়ান নি তিনি। সুলতানকে সেলাম জানান নি। চলে এসেছিলেন। আর তার পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নি। সেই রাত্রেই যাত্রা করেছিলেন ভাতুড়িয়ার পথে।

ইচ্ছা করলে তিনি হয়তো থাকতে পারতেন। দেখতেন সুলতানের শক্তি। কিন্তু তা তিনি চাননি। তিনি অনাবশ্যক বিরোধ এড়াতে চেয়েছিলেন। তাই সেই রাত্রেই মহানন্দার বুকে ভাসিয়ে ছিলেন তাঁর নৌকা।

তারপর কটা মাসের হিসাব। নীরবে আর বসে রইলেন না তিনি। যেখানে শুনলেন অত্যাচারীদের ক্রন্দন, ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হিন্দুর ওপর মুসলমানের অত্যাচার বাধাপ্রাপ্ত হতে লাগল পদে

পদে। ক্ষিপ্ত সুলতান বারবার সাবধান করলেন। ভয় দেখালেন। মুসলমান মোল্লাদের লাঞ্ছনায় হুঁশিয়ার করে দিলেন তাঁকে।

না, তিনিও নীরব রইলেন না। উত্তর দিলেন সুলতানকে। হিন্দুর প্রতি অত্যাচার তিনিও সহ্য করবেন না। অপরাধী হিন্দু নয়, মুসলমান। অপরাধী স্বয়ং বাংলার সুলতান। যদি প্রয়োজন হয়, সুলতানের অপরাধের শাস্তি দিতেও হিন্দুরা এগিয়ে যাবে।

এত স্পর্ধা! একজন হিন্দুর এত বড় দুঃসাহস? সামান্য এক জন ভূ-স্বামী সুলতানের বিচার করবে, শাস্তির ভয় দেখাবে! আর তিনি তাই নীরবে সহ্য করবেন? অসম্ভব। শাস্তি দিতে হবে। গণেশ নারায়ণ বিদ্রোহী। বিদ্রোহীর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। অপরাধী শুধুমাত্র গণেশ নারায়ণ একা নন। ভাতুড়িয়ার মানুষগুলোও।

ছুটে আসছেন সুলতান শিহাবুদ্দীন বায়জিদ শাহ। সঙ্গে সৈন্যবাহিনী। ভাতুড়িয়াকে শশ্মানে পরিণত করতে হবে। ভাতুড়িয়ার বুকে···

যেন সংবিত ফিরে পেলেন গণেশ নারায়ণ। জেগে উঠলেন। কানে এল পুত্র যদুর কণ্ঠস্বরটা। যদু বলছে, আক্রমণ প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করা আমাদের উচিত হবে না। শত্রু যাতে ভাতুড়িয়ায় প্রবেশ করতে না পারে, সেই চেষ্টাই করতে হবে আমাদের। ভাতুড়িয়া প্রবেশের পূর্বেই আমরা তাদের বাধা দেব।

বৃদ্ধ নায়েব বললেন, কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব বাবা?

যেমন করেই হোক সম্ভব করে তুলতে হবে নায়েব-দাদু। আর তাছাড়া আমাদের অযথা ভয় পাওয়ার কোন কারণই নেই। সুলতানের সৈন্যবাহিনী হয়তো সুশিক্ষিত। অনেক যুদ্ধে লড়াই হয়তো তারা করেছে, কিন্তু এই দিনটির আশঙ্কায় ভাতুড়িয়ার চাষী মজদুর বাগ্‌দী নমঃশূদ্রদের যে শিক্ষা দিয়েছি, তাও তো তুচ্ছ করার

মত নয়। সুলতানের সৈন্যরা লড়াই করবে, তাদের লড়াই না করে উপায় নেই বলে। লড়াই করতে তারা বাধ্য। লড়াই করার জন্যেই তাদের রাখা হয়েছে। আর আমরা লড়াই করবো বাঁচার জন্যে। এ লড়াই শুধুমাত্র আমাদের পরিবার পরিজনের জন্যে নয়। শুধুমাত্র ভাতুড়িয়ার জন্যেও নয়। এ লড়াই সমগ্র বাংলা দেশের জন্যে। এ লড়াই হিন্দুর বাঁচার লড়াই। আজ মানুষ জেগে উঠেছে। মানুষ বুঝেছে, মার খেয়ে বেঁচে থাকা যায় না। তাই তারা মারতে চায়। হয় মেরে মর, নয় বাঁচ। এটা আমার কথা নয়, আমি তাদের কথাই বলছি। আজ তারা বাঁচতে চায়।

তবু বৃদ্ধ নায়েবের মনে সন্দেহের দোলা। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থ যেন তিনি। বললেন, সুলতানের কাছে যে পত্র দেওয়া হয়েছে, তার উত্তর তো এখনো আসেনি বাবা ?

কোনদিনই উত্তর আসবে না নায়েব-দাদু। আসবেন সুলতান। আর কটা দিন মাত্র অপেক্ষা করলে সুলতানের সৈন্যবাহিনী মুক্ত তরবারি হাতে ভাতুড়িয়ায় আপনাদের শেষ উত্তর দিতে আসবে।

তাহলে...

আপনারা বয়ঃজেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ। আমার আশঙ্কার কথাটুকুই বললাম আপনাদের। এবার আপনারা বিচার করুন। যদি প্রয়োজন বোধ করেন, আমার সিদ্ধান্তটুকু গ্রহণ করবেন। একটু চুপ করলো যদু। বলল, এ যুদ্ধ আপনারা কেউই চান না। চাই না আমিও। কিন্তু তবু যখন সুলতান শিহাবুদ্দীন অন্যায়ভাবে ভাতুড়িয়া আক্রমণে এগিয়ে আসছেন, তখন কেন আমরা চুপ করে থাকব ? কেন তার অন্যায় নিষ্ঠুরতা চুপ করে বসে দেখব ? আমরা কী মরে গেছি ? বাঙ্গালী কী হীনবল হয়ে পড়েছে ? হিন্দু কী ভুলে গেছে তার অতীত ? একদিন সব ছিল তার। শুধু বাংলা

নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের সে ছিল ভাগ্যবিধাতা। আজ কিছু নেই তার। বিধর্মী শাসকের কাছে দানপত্র লিখে দিয়েছে। অন্যের দয়ায় আজ নির্ভরতার জীবন।

না! গর্জে উঠল একটি কণ্ঠ।

চমকে উঠলেন উপস্থিত সকলে। সবিস্ময়ে গণেশ নারায়ণের মুখের দিকে চাইলেন। এ কে? ইনি তো গণেশ নারায়ণ নন। কে বলবে, এই সেই নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ! এ যে ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠস্বর। এ যেন সিংহনাদ! শত্রুর উদ্দেশ্যে গর্জে উঠেছে তাঁর কণ্ঠ। বিশাল শরীরটি দৃঢ়, কঠিন। দুই চক্ষু তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল। নাসারন্ধ্র স্ফিত। বিশাল বক্ষে যেন সমুদ্রতরঙ্গ। বাহু দুটি মুষ্টিবদ্ধ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন তিনি।

পিতার কাছে এগিয়ে গেল যদু। মৃদুকণ্ঠে ডাকল, বাবা মশায়!

পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমার ভুল হয়েছিল যদু। সত্যই আমি ভুল করেছিলাম। হয়তো আমি ভয় পেয়েছিলাম।

না, না। যেন প্রতিবাদ করতে চাইল যদুর কণ্ঠটা।

হ্যাঁ যদু। সত্যই তাই। হয়তো তা নয়। দুশো বছরের বিদেশী শাসন আমাদের ভীরু দুর্বল করে তুলেছিল। স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে ভুলে গিয়েছিলাম আমরা। আজ ভুল ভেঙ্গেছে। বাংলার মানুষ আজ দাসত্বের নাগপাশ ছিন্ন করতে চায়। আমি বাধা দেব না। যুদ্ধ করবো। আক্রমণকারীর ভূমিকাই নেব। আমি জানি, দীর্ঘদিন ধরে যাদের শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছি, তারা সুলতানের সৈন্যের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। কিন্তু···

কী বাবা মশায়?

যুদ্ধে যেমন সৈন্য প্রয়োজন, তেমনি চাই উপযুক্ত সেনাপতি। যুদ্ধ করে সৈন্যরাই, কিন্তু যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত করতে হবে তাদের। তুমি আমি ভিন্ন আর তো কাউকে দেখছি না।

আমি আছি। মৃদুকণ্ঠে কথাটা বলে পিতার সামনে এসে দাঁড়াল মহেন্দ্র।

তুমি! বিস্মিত গণেশ নারায়ণ পুত্রের সুকুমার মুখখানির দিকে চাইলেন। কৈশোর শেষে যৌবনদ্বারে উপনীত। এখনও ছেলে মানুষী যায় নি যার, সে করবে সৈন্য পরিচালনা?

হাসল মহেন্দ্র। বলল, আপনি হয়তো আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। ভাবছেন, আমি ছেলেমানুষ। হয়তো···

না, না, তা নয়। বাধা দিয়ে হাসলেন তিনি। বললেন, আমি ভাবছি, তুমি যুদ্ধবিদ্যা শিখলে কবে?

আপনিই তো শিখিয়েছেন আমায়।

আমি! এবার সত্য সত্যই তিনি অবাক হলেন। চিন্তা করে দেখলেন, কোনদিনই তিনি তাকে অস্ত্রশিক্ষা দেননি। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তিনি তার মুখের দিকে চাইলেন।

হাসল মহেন্দ্র। বলল, নিজের হাতে আপনি সত্যিই কিছু শেখাননি আমায়। কিন্তু যাদের শিখিয়েছেন তাদের দেখেই কিছুটা শিখেছি। শিখেছি ব্রজদাদার কাছে। আর শিখিয়েছেন নায়েব-দাদু।

ব্রজ ও নায়েবের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। ব্রজ ঘাড় নাড়ল। হাসলেন বৃদ্ধ নায়েব। জানে সবাই। শুধু সংবাদ রাখেননি তিনিই।

যদু বলল, মহেন পারবে বাবা মশায়।

সবাই যদি পারে, তিনিই-বা পারবেন না কেন? নিশ্চয়ই পারবেন। এ সংসারে মানুষের অসাধ্য তো কিছু নেই। মানুষই সাধ্যাতীত বলে ভাবে, দূরে সরে আসে ভয়ে, দুর্বলতায়। কোথাও বা সংকীর্ণ স্বার্থপরতায়। যেখানে কিছু পারে না, হয় থাকে ভয়, দুর্বলতা কিংবা স্বার্থপরতা। আপন স্বার্থ, ব্যক্তিগত স্বার্থ।

মায়ের কথা মনে পড়লো তাঁর। রাজেশ্বরী বলেছিলেন, তুই

কিছু পারবি না। পারা সম্ভব নয় তোর পক্ষে। মানুষের ভাল চাইলে আপন স্বার্থ ভুলতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা ত্যাগ করে সকলের কথা ভাবতে হবে।

বলেছিলেন, খোকা, সুলতানের অত্যাচার, মানুষের আর্তনাদ কান্না সবই দেখতে পাচ্ছিস, শুনতে পাচ্ছিস তুই, কিন্তু দেখা আর শোনা ছাড়া, কিংবা চিন্তা করা ভিন্ন আর কিছু করা তোর পক্ষে সম্ভব নয়। কেন না সুলতানের আমির তুই। হোন না তিনি মুসলমান, হিন্দু মুসলমানের অত্যাচারে কাঁদুক না, কোন ক্ষতি নেই। কারণ তোর নিজের তো কোন ক্ষতি হচ্ছে না। তোর আপন স্বার্থে তো আঘাত পড়েনি। বলেছিলেন, খোকা, সংসারে স্বার্থপরের জাতই আলাদা। কথাটা তোকে আমি বলছি না। আমি তাদের সত্যিই চিনতে পারি না।

জননীর কথাগুলো সেদিন আঘাত হেনেছিল বুকে। ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অনেক চিন্তার পর তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি সত্য কথাই বলেছেন। যেটুকু দ্বিধা সংশয় ছিল, ত্যাগ করেছিলেন। হিন্দুর প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের দরবারের আমিরের পদত্যাগ করে ফিরে এসেছিলেন ভাতুড়িয়ায়।

কিন্তু আবার ভুল করলেন। হয়তো ভুল সেদিন করতেন না যদি মা থাকতেন। কিন্তু রাজেশ্বরী ছিলেন না। মৃত্যুর অমৃত লোকে যাত্রা করেছেন। সংসারে আবির্ভাব ঘটেছে এক নতুন অতিথীর। তার কচি মুখখানির আধো-আধো কথায় পূর্ণ গৃহ তাঁর। শ্যামসুন্দর। যদুর পুত্র।

দুরন্ত শিশু রাজেশ্বরীর কণ্ঠের হার। বৃদ্ধ অথর্ব দেহটা যেন নবজীবন লাভ করেছে। বুকে করে রাখেন শিশুকে। বলেছিলেন, কোন দুঃখ নেই। শুধু দাদু ভাইকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

বলেছিলেন, আমি কী করবো মা?

তুই। রাজেশ্বরী পুত্রের মুখের দিকে মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জীবনে যে ব্রত গ্রহণ করেছিস, তা তুই সফল করে তুলিস বাবা। জাতি ধর্মের উর্ধ্বে স্থান দিস মানুষের। মানুষই একমাত্র সত্য। সেই সত্য পথের পথিক তুই। ভয় পাসনি, মনে স্থান দিসনি দুর্বলতাকে, স্বার্থ চিন্তা ত্যাগ করে এগিয়ে যাস সত্য পথে। হয়তো বাধা আসবে। একাকী মনে হবে নিজেকে। কিন্তু জয়ী ঠিকই হবি।

তবু ভুল করলেন। সুলতান সৈফুদ্দীনের বাঁচার আকুতি ভুলিয়ে দিয়েছিল মায়ের কথা। একবারও মনে হয়নি জননীর সতর্কবাণী। তিনিতো তাঁকে সতর্কই করেছিলেন। জীবনের চলার পথের মন্ত্র ভুলে গিয়েছিলেন।

বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে যে স্বাধীনতা সেইতো প্রকৃত স্বাধীনতা। ভিক্ষায় অথবা দাসত্বে নয়, অর্জন করতে হবে অধিকার। উঞ্ছবৃত্তি জীবনের কলঙ্ক। সেই কলঙ্কই যেন মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন। ভুলেছিলেন মিথ্যা আশ্বাসে। সে ভুল ভাঙ্গতেও তাই দেরী হল না।

আজ তিনি বুঝতে পেরেছেন, বিধর্মীর কাছে হিন্দুর প্রতি সুশাসন প্রার্থনা সেই উঞ্ছবৃত্তিরই পুনরাবৃত্তি। অর্জন করে নিতে হবে। মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনবেন স্বাধীনতায়।

তিনি বসে আছেন একাকী। চিন্তার সমুদ্র আজ তাঁর মনে। যারা ছিল চলে গেছে। ব্যস্ত হয়েছে আগামী দিনের চিন্তায়।

তিনিও উঠলেন। বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। ম্লান অন্ধকারে আকাশ মাটি বনানী একাকার। মুক্ত আকাশের নীচে সন্ধ্যার রূপ অনেকক্ষণ দেখলেন তিনি। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেলেন।

হঠাৎ কার যেন ডাক শুনলেন তিনি। কে যেন ডাকছে তাঁকে। তিনি ফিরে চাইলেন তার দিকে। চিনতে পারলেন।

কী ভাবছিলে বড় মশায়? ব্রজর কণ্ঠস্বর।

ব্রজ ?

হ্যাঁ বড় মশায়।

কী রে ?

কী ভাবছিলে ?

ভাবনার কী শেষ আছে ব্রজ ? কণ্ঠটা কেমন যেন ম্লান শোনাল তাঁর। বললেন, আমি ভাবছি···

বাধা দিল ব্রজ। বলল, তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া আমার শোভা পায় না বড় মশায়। তবু বলছি, মিথ্যা চিন্তা তুমি ত্যাগ কর।

কিন্তু না চিন্তা করেও পারছি না ব্রজ। মন যে মানতে চাইছে না। মনে হচ্ছে···। তিনি চুপ করে গেলেন। কেমন যেন দুর্বল বোধ করলেন নিজেকে। মহেন্দ্রর কচি মুখখানা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

ব্রজ বলল, মহেন দাদার সঙ্গে আমি তো থাকছি বড় মশাই।

তবু তিনি সান্ত্বনা পেলেন না। মনে হল, মহেন্দ্র নয়, তাঁরই উচিত ছিল এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু সকলে যা স্থির করেছেন, তিনিও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন তা।

ব্রজ ডাকল, বড় মশায় !

চল ব্রজ।

অন্ধকার পথে কাছারী বাড়ি থেকে ফিরে এলেন তাঁরা।

আট

মৃণ্ময়ীর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে মহেন্দ্র মৃদুকণ্ঠে ডাকল, মিনু, মৃণ্ময়ী।

মৃণ্ময়ী জাগলো না। সাড়া দিল না। ঘুম ভাঙ্গল না। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর অবুঝ কান্নাটা কিছুতেই শান্ত করতে পারেনি মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র ভাবলো, ও ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। ওকে জাগানোর প্রয়োজন নেই। জাগালে হয়তো আবার কান্না শুরু করবে, পথ আটকাবে। হয়তো যেতে দিতে চাইবে না। অথচ যেতে তাকে হবেই।

মধ্য রাত্রি। পূর্ণিমার শ্বেত শুভ্র আলোয় বিশ্ব চরাচর প্লাবিত। কেঁদে কেঁদে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল মৃণ্ময়ী। ঘুম ছিল না মহেন্দ্রর চোখে। ওর রোগা ছোট্ট দেহটিকে বুকের মাঝে নিয়ে জেগেছিল। মনে পড়েছিল কত কথা। আজ তারজন্য ওর এই ব্যাকুলতা। দুশ্চিন্তা মাঝে মাঝে বড় অবাক করে তাকে। ভেবে পায় না কারণ, ওর আজকের এই পরিবর্তন।

মৃণ্ময়ীর ঘুমন্ত মুখখানির দিকে তাকাল মহেন্দ্র। বড় ভাল লাগল তার। শিশিরস্নিগ্ধ লাবণ্যমাখা কোরক যেন। পাপড়ি মেলার লগ্নে উপনীত। ফুটন্ত যৌবন আজ মাতাল করে মন। বিস্ময় জাগায়। কুমারী লজ্জায় ও যখন চোখ মুদে থাকে, মহেন্দ্রর পৌরষ যেন অশান্ত হয়ে ওঠে তখন। ভাঙাতে চায় লজ্জা। বলে, কী হল মৃণ্ময়ী!

মৃণ্ময়ী সাড়া দেয় না।

মৃণ্ময়ী!

উঁ!

কী হল মৃণ্ময়ী ?

মৃণ্ময়ী চুপ করে থাকে তবু।

মৃণ্ময়ী !

উঁ!

মৃণ্ময়ী !

বল ?

কী হল মৃণ্ময়ী ?

কিছু না। অস্ফুট স্বরে বলে ও।

তবে ?

জানি না।

জান না ?

উঁহু।

ওকে আরো জোরে বুকের গভীরে টেনে নেয় মহেন্দ্র। পাগলের মত মুখে গালে শরীরের রেখায় রেখায় এঁকে দেয় স্নেহ চুম্বন। ওর নিরাভরণ দেহ সৌন্দর্য তাকে অস্থির আত্মহারা করে তোলে। উত্তপ্ত দুটি দেহ হৃদয়ের তটে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। ওর বুকে মাথা রেখে শুনতে পায় একটি ভীরু মনের দ্রুত স্পন্দন। আর তখনি তার মনে হয়, ও যেন ভয় পেয়েছে। ও যেন ধরা দিয়েছে অনিচ্ছায়। ধরা দিতে বাধ্য হয়েছে।

ওকে ছেড়ে দেয়। বাহুবন্ধন শিথিল করে। আবেশে বন্ধ আঁখি মৃণ্ময়ী যেন বিস্মিত হয়!

মহেন্দ্র ডাকে, মৃণ্ময়ী।

মৃণ্ময়ী সাড়া দেয় না। চোখ বন্ধ করে।

তুমি কী আমাকে ভয় পাও মৃণ্ময়ী ? তুমি কী আমাকে···

ওর মুখে হাত চাপা দেয় মৃণ্ময়ী। কণ্ঠটা যেন আর্তনাদ করে ওঠে তার, না, না।

তবে ?

মৃণ্ময়ী চুপ করে থাকে। উত্তর দেয় না।

আমার দিকে তাকাও মৃণ্ময়ী।

ও তবু চোখ মেলে না।

মৃণ্ময়ী! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার। কণ্ঠটা ম্লান শোনায়।

মৃণ্ময়ী চোখ মেলে কী যেন বলতে চায়। পারে না।

মৃণ্ময়ী!

আমার লজ্জা করে।

লজ্জা করে তোমার! তার কণ্ঠে গভীর বিস্ময়। কেন মৃণ্ময়ী?

জানি না।

মৃণ্ময়ী!

জানি না গো। দুই মৃণাল বাহুতে বেষ্টন করে কণ্ঠ। লজ্জায় মুখ ঢাকে। বলে, সত্যি বলছি, ভীষণ লজ্জা করে আমার। মৃণ্ময়ীর অস্ফুট কণ্ঠটা শুনতে পায় মহেন্দ্র। অথচ···

সত্যি মাঝে মাঝে ভারি অবাক লাগে মহেন্দ্রর। মনে হয়, সত্য নয় স্বপ্ন। সে দিনগুলো, সেই সব হারিয়ে যাওয়া দিনের কত শত মধুর স্মৃতি। আজ মধুর বলেই মনে হয়। কিন্তু আজকের এই মধুরতার লেশমাত্র ছিল না সে দিনগুলোতে। সেদিনের বালক মহেন্দ্র মেয়েটাকে শত্রুজ্ঞান করতো। আজ মাঝে মাঝে সে সব কথা মনে পড়লে ওর লজ্জা করে। মৃণ্ময়ীর এতটুকু অবাধ্যতা সহ্য করতে পারত না। রাগের মাথায় কতদিন মারধোর পর্যন্ত করেছে ওকে।

না, মেয়েটা সহ্য করেনি। মেনে নেয়নি পীড়ন। নালিশ জানিয়েছে রাজেশ্বরীর কাছে। বিচার করেছেন দিদা। আর এমনই অবাক কাণ্ড, প্রতিবারের বিচারে সে-ই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। যদিও শাস্তি গ্রহণ করতে হয়নি, তবু তার ভীষণ খারাপ লেগেছে। অভিমান জেগেছে। প্রতীজ্ঞা করেছে মনে মনে, মেয়েটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না, কিন্তু মেয়েটা কাছে এলেই সব ভুলে গেছে।

কারণ রাজেশ্বরীর বিচারটা ঠিক হয়নি সে কথা মৃণ্ময়ীই জানিয়েছে। আবার ভাব হয়ে গেছে তুজনের।

সেদিনগুলো বড় ভাল লাগতো। ছোট্ট মেয়েটির কথায় কিছু পারে না এমন কাজ ছিল না। তুজনে কতদিন চুপিচুপি পালিয়ে গিয়ে মাঠে মাঠে ছুটে বেড়িয়েছে। নদীতে সাঁতার দিয়েছে। গাছে চড়েছে। আর ধরা পড়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে। যেদিন তুজনেই অপরাধী প্রমাণিত হয়েছে, সেদিন বড় খারাপ লেগেছে তার। মনে হয়েছে, দোষ তো ওর নয়, দোষ তার। যদিও ও ডেকেছিল, কিন্তু সে না গেলেই পারতো।

তারপর !

একদিন আকাশের সব আলো, জীবনের রঙ, তুরন্তপনার সমাপ্তি ঘটলো অকস্মাৎ। জীবনটা যেন হঠাৎ ছন্দহারা হল। কেটে গেল সুর। স্তব্ধ হল কণ্ঠ। কান্নার সমুদ্রে দিশাহারা হল তুটি প্রাণ। রাজেশ্বরী যেন সব কিছু কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন।

প্রথম প্রথম ভাল লাগতো না। একা একা ঘুরে বেড়াতো সারা দিন। মৃণ্ময়ী ডাকলেও সাড়া দিত না। একদিন ডাকাও বন্ধ করে দিল।

তারপর কিছুদিন পরে ওর দিকে চেয়ে কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল মহেন্দ্র। পলক পড়লো না চোখের। মনে হল, সে যেন স্বপ্ন দেখছে। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে অতি পরিচিতা খেলার সাথী সেই মেয়েটা। এতো সে নয়, অন্য কেউ। কে এ? মহেন্দ্রর চিন্তায় নতুন স্বপ্নের রূপ নিল। এলো লজ্জা সঙ্কোচ দ্বিধা। ওর নাম ধরে ডাকতে গিয়েও পারলো না। রাত্রে ঘুম নেমে এল না তুচোখের পাতায়। ওর কথা ভাবতো। ওর মুখখানা বারবার ভেসে উঠল চোখের সামনে। বুকের মধ্যে শিহরণ জাগলো। আনন্দ, বিস্ময়, যন্ত্রণা। মহেন্দ্রর কী যেন হল সেদিন। সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটলো তার।

সকালে মুখের দিকে চেয়ে মা জানতে চাইলেন, কী হয়েছে, খোকা ?

দুপুরে খাবার সময় চিণ্ময়ী বলল, কী হয়েছে ভাই ঠাকুরপো ? তোমার মুখখানা অমন শুকনো কেন ভাই ?

ঠাট্টার স্বরেই কথাটা বলেছিল বৌঠান। খেতে খেতে চমকে মুখ তুলেছিল মহেন্দ্র। দ্বারের আড়ালে থেকে কে যেন কথাটা শুনেই হেসে উঠেছিল খিলখিল করে।

কী যেন বলতে যাচ্ছিল সে। বাধা দিয়েছিল চিণ্ময়ী। মুখ টিপে হেসে বলেছিল, তোমার ব্যামো হয়েছে ভাই ঠাকুরপো। বড় কঠিন ব্যামো।

না, না। বাধা দিয়েছিল সে।

চিণ্ময়ী বলেছিল, না বললে শুনছে কে ভাই ? ব্যামোই তোমার হয়েছে। কার্ত্তিকের মত চেহারাটা কদিনেই কেমন শুকিয়ে গেছে। বাবা মশায় থাকলে একটা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করতেন। তিনি যখন নেই, তোমার দাদাকেই বলি। বৈদ্য না ডাকলেই নয় আর।

বৌঠান ! যেন আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠেছিল সে।

চিণ্ময়ী বলেছিল, কী হলো ভাই ঠাকুর পো, অমন ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলে কেন ?

দ্বারের অন্তরাল থেকে সেই কণ্ঠটা আবার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। সেদিকে দেখেছিল সে, কিন্তু যাকে আশা করে ছিল, দেখতে পায় নি।

সেই রাত্রি !

সেটা এমনি এক পূর্ণিমা লগ্ন। দুগ্ধ ধবল আলোর বন্যায় প্লাবিত প্রকৃতি। অনেক রাত্রি পর্যন্ত উদ্যানে একাকী ঘুরে বেড়িয়েছিল। বসন্তের বাতাসে নাম না জানা ফুলের সৌরভ

মাতাল করে তুলেছিল মনটাকে। রাত্রির স্তব্ধতায় ডেকে উঠে ছিল কোকিলের কণ্ঠস্বর।

ক্লান্ত শ্রান্ত মন নিয়ে কক্ষে এসে প্রবেশ করেছিল মহেন্দ্র। চমকে উঠে ছিল।

চিণ্ময়ী বলেছিল, বৈদ্য আনা সম্ভব হল না ভাই ঠাকুর পো। একটা রাত একটু কষ্ট করে কাটিয়ে দাও। তোমার দাদাকে বলে কালই ব্যবস্থা করবো।

কথা বলতে পারে নি সে। বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে অবগুণ্ঠনাবতীর দিকে চেয়েছিল।

চিণ্ময়ী বলেছিল, মিনু রইলো। খোকার শরীরটা খারাপ করেছে, না হলে আমিই দেখতাম তোমায়। বলাতো যায় না, ব্যামো যখন হয়েছে···

চুপ করে গিয়েছিল চিণ্ময়ী। দেখতে পেয়েছিল, অবগুণ্ঠণাবতী যেন বাধা দিলে। হাসতে হাসতে চিণ্ময়ী বলেছিল, আমি চলি ভাই।

সত্য সত্যই চলে গিয়েছিল মৃণ্ময়ী।

মহেন্দ্র দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ। কেমন যেন ভয় ভয় করেছিল। মৃণ্ময়ী তার কত পরিচিত, কিন্তু সেদিন লজ্জা তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এগিয়ে যেতে পারে নি। পারেনি মৃণ্ময়ীর নাম ধরে ডাকতে। নিজেকে কেমন যেন অসহায় বোধ করছিল। পাষাণভার মনে হয়েছিল পা তুটোতে।

অনেকক্ষণ পরে পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল মৃণ্ময়ী।

কী হল? কথা বলেছিল সে।

আমি যাই। বলেছিল মৃণ্ময়ী।

কেন?

তোমার অসুবিধে হচ্ছে?

না, না।

আমি যাই।

চলে যাবার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল মৃণ্ময়ী। মহেন্দ্র যেতে দেয় নি। ধরে ফেলেছিল ওকে।

দ্বারে আবার করাঘাত শোনা গেল। ব্রজ ডাকছে। যাত্রাকাল উপস্থিত। তাকে যেতে হবে। কিন্তু···

মৃণ্ময়ী অবুঝ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। বলেছিল, না, না, তোমাকে আমি যেতে দেব না।

মৃণ্ময়ী !

আমি সব শুনেছি। আমি সব জানি। তোমাকে আমি যেতে দেব না।

ছিঃ মৃণ্ময়ী ! ওকথা বলতে নেই। ওকে বুঝিয়েছে মহেন্দ্র। ওর অবুঝ মনের কান্নাটা শান্ত করতে চেয়েছে। ওর ছেলেমানুষ মনের অকারণ ভয়টাকে দূর করতে চেয়েছে। কিন্তু বোঝেনি মৃণ্ময়ী। বুঝতে চায় নি। কেঁদেছে আর কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে একসময়।

এখন ওর মুখের দিকে চাইল মহেন্দ্র। ওকে দেখল। বড় ভাল লাগলো। তারও মনটা কেমন করে উঠল যেন। একটা শিরশিরে ভয়ের ছায়া নেমে এল রক্ত স্রোতে। কিন্তু পরক্ষণেই মনটাকে কঠিন করলো সে। নিজেকে ধিক্কার দিল, ছিঃ, সে না পুরুষ !

ভাবল, ওকে জাগাবে না। ও ঘুমাক। কিন্তু পারল না। ডাকল, মিনু, মৃণ্ময়ী !

এবার ঘুম ভাঙ্গল মৃণ্ময়ীর। চোখ মেলে চাইলো। কথা বলল না।

আমি এবার যাব মৃণ্ময়ী, বলল মহেন্দ্র।

ওঃ।

মৃণ্ময়ী !

মৃণ্ময়ী হাসতে চাইলো, পারল না। দু ফোঁটা অশ্রু টলটল করে উঠল চোখের কোলে। ওর সারা দেহটা কাঁপছে থরথর করে।

ছিঃ মৃণ্ময়ী, ভয় পেও না। হাসল সে। বলল, ভয় কী, জয়ী আমরা হবোই।

কথা বলল না মৃণ্ময়ী। বাইরে ডাকল ব্রজ।

ওকে একটু আদর করলো মহেন্দ্র। স্নেহচিহ্ন এঁকে দিল ওর ওষ্ঠে। তারপর বাইরে বেরিয়ে এল।

বিদায় দিলেন সকলেই। গণেশ নারায়ণ, সত্যবতী আর চিণ্ময়ী। যদু নারায়ণও যাত্রা করবে এখনই। ওদের এগিয়ে দেবে কিছুদূর। আগামীকাল সেও যাত্রা করবে। গণেশ নারায়ণ দু একদিন পরে।

সত্যবতী ব্রজকে ডেকে বলল, ছেলেটাকে একটু দেখিস ব্রজ।

ব্রজ হাসল। তার কালো মুখখানা সুন্দর হাসিতে বড় উজ্জল হয়ে উঠল। বলল, মিথ্যে তোমরা ভেব না মা। ব্রজ তো রইলো।

সত্যবতী বলল, হ্যাঁ ব্রজ, আমরা ভাববো না।

দূরে দাঁড়িয়ে দেখল মৃণ্ময়ী। ওরা চলে যাবার পর সকলেই দাঁড়িয়ে রইলেন পাষাণের মত। সত্যবতী দুই হাত তুলে অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল।

পরদিন অপরাহ্নে চর মারফৎ পথেই সংবাদ পেল মহেন্দ্র, সুলতান গিয়াবুদ্দীন বায়জিদ শাহ প্রায় দশ সহস্রাধিক সৈন্য নিয়ে ভাতুড়িয়ার দিকে এগিয়ে আসছেন। অসংখ্য রণতরী শতাধিক হস্তী এবং অশ্ব। সামান্য একজন ভু-স্বামীকে দমন করতে বাংলার সুলতান দ্বিগ্বীজয়ের রণসজ্জা করেছেন।

চিন্তিত হল মহেন্দ্র। দূত মারফৎ অগ্রজকে সংবাদ পাঠাল। সেদিনই রাত্রে যদু নারায়ণ এল ভাইয়ের কাছে। জানতে চাইলো সংবাদের সত্যতা। চর জানাল সবই সত্য।

চিন্তিত হল যদু। বলল, সুলতান নিশ্চয়ই আমাদের শক্তি সম্বন্ধে অবগত আছেন। নইলে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আসতেন না।

চর বলল, তবে স্থলবাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা খুব বেশী নেই।

কত হবে ?

চর সঠিক সংখ্যা বলতে পারল না। মোট কথা সৈন্যসংখ্যার সংবাদই সে নিয়ে এসেছে। সঠিক সংবাদ জানা গেল পরদিন। স্থলবাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা খুব বেশী হলে তিন সহস্রের বেশী হবে না। সুলতান রণতরীর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী। স্বাভাবিক। কারণ জলপথেই ভাতুড়িয়া পৌছানো সোজা। জলময় চলমান বিল খাত গড়া আক্রমণে স্থলবাহিনীর চেয়ে রণতরীই কার্যকর হবে।

চিন্তিত হল যদু। সংবাদ পাঠাল গণেশ নারায়ণকে। দূত মুখে তিনি সংবাদ পাঠালেন, সমস্ত রণতরী নিয়ে এখুনি তিনি এগিয়ে আসছেন।

যদু বলল, আমরা জলপথেই প্রথম আক্রমণ চালাবো।

মহেন্দ্র কোন মতামত প্রকাশ করলো না।

মাঝে মাত্র আর একটি দিনের পথ। রাত্রি প্রভাত হলেই ভাতুড়িয়ার দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসবে সুলতানের বিশাল বাহিনী। গণেশ নারায়ণ, যদু আর মহেন্দ্রর সৈন্যসংখ্যা সুলতানের সৈন্যদের অর্দ্ধেক। রণতরীও সামান্য।

মহেন্দ্র বলল, আমরা যদি আমাদের সমস্ত সৈন্য নিয়ে একসঙ্গে সুলতানকে আক্রমণ করি, তাহলে মনে হয়, ওদের গতিরোধ করা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। আর সেটা বোধহয় উচিতও হবে না।

কেন ?

আমাদের মোট সৈন্যসংখ্যা পাঁচ সহস্রেরও কম। রণতরী অল্প।

যদু ভাইয়ের কথাটা অস্বীকার করতে পারল না। চিন্তা সেও করেছে। কিন্তু···

মহেন্দ্র ডাকল, দাদা।

যদু ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল।

আমাদের রণতরীগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই উচিত।

ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? যদু যেন ভাইয়ের কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না। মনে হল, সে ভুল শুনেছে। নয়তো ভয় পেয়ে মহেন্দ্র একথা বলছে।

মহেন্দ্র দৃঢ়কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ দাদা, ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু কেন?

নাহলে ও গুলো মিছিমিছি ধ্বংস হবে।

তাহলে কী করবো আমরা?

আমরা স্থলপথে আক্রমণ করবো। আমাদের রণতরীগুলি এগিয়ে না গিয়ে অপেক্ষা করুক এক জায়গায়। যে কোন উপায়েই হোক, সুলতানের স্থলবাহিনীর কামানগুলি অধিকার করতে হবে আমাদের। আমরা স্থল থেকেই কামানের গোলায় ধ্বংস করবো রণতরীগুলি। আর···

কী?

সঠিক সংবাদ নিতে হবে সুলতানের। তিনি কোথায় আছেন।

ভাইয়ের সিদ্ধান্তটুকুই শেষপর্যন্ত মেনে নিল যদু। মহেন্দ্র ঠিকই বলছে। এছাড়া অন্য কোন উপায় সেও দেখতে পেল না।

গভীর রাত্রে গণেশ নারায়ণ এসে উপস্থিত হলেন। মহেন্দ্র যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। যদু যেতে চেয়েছিল। সে রাজি হয় নি। বলেছিল, এ দায়িত্বটুকু আমার ওপর ছেড়ে দাও দাদা।

গণেশ নারায়ণ সব শুনে ঘোরতর আপত্তি জানালেন। বললেন, না মহেন্দ্র, এ হতে পারে না। তাছাড়া রাত্রে আক্রমণ নিয়ম বিরুদ্ধ। যুদ্ধ যদি করতে হয়, প্রভাতেই কোর।

কিন্তু আমাকে যে এই রাত্রেই যেতে হবে বাবা।

এই রাত্রেই ?

হ্যাঁ।

না। দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন তিনি। বললেন, এ অন্যায়।

অন্যায় !

হ্যাঁ, অন্যায়। আজ রাত্রে কোনমতেই তুমি যেতে পারবে না। আমার আদেশ।

বাবা !

অনেকক্ষণ নীরবে নতমস্তকে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে রইল মহেন্দ্র। একটিও কথা বলতে পারল না। পিতার কঠিন সর্তটা তাকে বিচলিত করলো যেন। কিন্তু একসময় বিচলিত ভাবটুকু কাটিয়ে উঠল সে। চিন্তা করলো। পিতা তার সত্য কথাই বলেছেন। রাত্রে আক্রমণ কোন ক্ষেত্রেই ন্যায়সঙ্গত নয়। এই লিখিত নির্দেশটুকু যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষই মেনে চলে। চলতে বাধ্য হয়। কিন্তু···

মহেন্দ্র একসময় মাথা তুললো। মৃদুকণ্ঠে ডাকলো, বাবা।

বল। পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন গণেশ নারায়ণ।

আমার এই ধৃষ্টতাটুকু ক্ষমা করবেন আপনি। বলল মহেন্দ্র। আমি একটি ছোট্ট প্রশ্ন করছি আপনাকে। আশা করি, আপনি উত্তর দেবেন !

বল।

আক্রমণকারী সুলতান। সুলতান শিহাবুদ্দীন দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে আপনার মত সামান্য একজন ভূ-স্বামীকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছেন। আপনি নাকি বিদ্রোহী! সত্যই কী তাই ?

তবে ? তবে কেন তিনি আক্রমণ করতে ছুটে আসছেন ? অন্যায় কার ?

গণেশ নারায়ণ এ কথার কোন উত্তর সহসা দিতে পারলেন না। নীরব রইলেন তিনি।

মহেন্দ্র বলল, দোষ কার? এ ক্ষেত্রে দোষী কে? বিচার করুন। সুলতান শিহাবুদ্দীন যদি অন্যায়ভাবে ভাতুড়িয়া আক্রমণ করেন, ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে তিনি যদি ছুটে আসেন অসংখ্য মানুষকে হত্যা করতে, হিন্দুর প্রতিবাদের কণ্ঠ যদি রুদ্ধ করতে চান, একদিন যাঁর সহায়তা ভিন্ন মসনদে বসা সম্ভব হ'ত না তাঁর পক্ষে, সেই উপকারী বন্ধুর উপকারের কথা বিস্মৃত হয়ে আগুন জ্বালান বাংলার ঘরে ঘরে, তখন আমরাই বা কেন শুধুমাত্র নীতিটুকু আঁকড়ে থেকে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেব? কেন?

মহেন্দ্রর কণ্ঠে যেন আগুন ঝরে পড়ল। তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হল তার কণ্ঠ। তারপর একসময় নীরব হল সে। নীরব রইলো ক্ষণকাল। বলল, বাবা, সুলতানের পক্ষে এ স্বার্থ যুদ্ধ। আজ যদি তিনি আপনাকে দমন করতে পারেন, তাহলে হিন্দুর কণ্ঠ হয় তো চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে। আর হিন্দু হয়তো মুসলমানের শত অত্যাচারেও প্রতিবাদ জানাতে সাহসী হবে না কোনদিন। আজ হিন্দুর জাগ্রত চেতনা অন্যায়ের কাছে ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নষ্ট করে দেবেন না। তাছাড়া একটু চিন্তা করে দেখুন, সত্যই আমরা কোন অন্যায় করছি কি না। দুশো বছর আগে লক্ষণাবতী আক্রমণের বহু পূর্ব থেকেই সুলতান বখ্‌তিয়ার খিলজী তাঁর অশ্ব ব্যবসায়ীরূপী তুরুখ সওয়ার পাঠিয়ে বাংলা অধিকারের যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা নিশ্চয়ই ন্যায়নীতি নয়? মহাভারতে ধর্মযুদ্ধও কী ন্যায়নীতির উপর নির্ভর ছিল? ছিল না। থাকতে পারে না।

মহেন্দ্র চুপ করলো। নীরব রইলেন গণেশ নারায়ণ।

বাবা! একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে ডাকল যদু।

গণেশ নারায়ণ জেষ্ঠ পুত্রের মুখের দিকে নীরবে তাকালেন।

যদু বলল, আপনি অনুমতি দিন বাবা। মহেন্দ্র ঠিকই বলেছে। শঠের সঙ্গে শঠতা ভিন্ন উপায় কী?

তিনি এবারও কোন কথা বললেন না।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। ম্লান হচ্ছে আলো। উষা লগ্ন সমাগত।

সুলতান শিহাবুদ্দীন বায়জিদ শাহের সৈন্যরা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। একটু অবসর পেলেই ওরা ঘুমায়।

স্থানে স্থানে মশালের আলোগুলো ম্লান থেকে ম্লানতর হচ্ছে। রাত্রির প্রহরীদের চোখেও ঘুমের জড়তা। প্রভাতের বিলম্ব নেই। একটু পরেই পাখীর ডাক শোনা যাবে। জেগে উঠবে অসংখ্য মানুষ। ওরা নিশ্চিন্ত। যাত্রা শুরুর পূর্বে ওরাও একটু বিশ্রাম চায়। তাই ভূমি শয্যা নিয়েছে অনেকেই।

ঘুমাচ্ছেন সুলতান শিয়াবুদ্দীন বায়জিদ শাহ। পাণ্ডুয়া থেকে প্রথমে জলপথেই যাত্রা করেছিলেন তিনি। গত সন্ধ্যায় স্থল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। সংবাদ পেয়েছিলেন, উজীর আজম খান আর দরবেশ নূরকুৎব্ আলম তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। ওঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই তিনি চলে এসেছিলেন।

আলোচনা হয়েছিল গভীর রাত্রি পর্যন্ত। সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। অদ্ভূত এক অনুরোধ করেছিলেন নূরকুৎব আলম। যুদ্ধে জয়লাভ করে মেহেরবান সুলতান যেন ভাতুড়িয়া বাসীদের ওপর কোন রকম অত্যাচার না করেন। কারণ…। কারণটুকু চিন্তা করেছিলেন শিহাবুদ্দীন। নূরকুৎব্ আলমের প্রতি শ্রদ্ধাটা বেড়ে গিয়েছিল তাঁর। সেনাপতিদের আদেশ দিয়েছিলেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত শুয়ে প্রতীক্ষা করেছিলেন দিনের। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন একসময়।

ঘুমাচ্ছে সবাই। সৈন্য শান্ত্রী সুলতান সকলেই।

ঘুম নেই শুধু ওদের চোখে। ছায়া ছায়া অসংখ্য মানুষ। মার্জারের মত লঘু পদক্ষেপে বিভিন্ন দিক দিয়ে সুলতানের সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করছে ওরা। নিঃশব্দ সতর্ক ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ।

ওরা কারা? কী ওদের পরিচয়, উদ্দেশ্য?

ম্লান হচ্ছে ছায়া ছায়া অন্ধকারটা। রাতের আকাশে আলোর ইসারা। একটু যেন লালের আভা দেখা দিল পূর্বাকাশে। কোথায় যেন প্রথম ডেকে উঠল রাত-ভোরের পাখী।

হঠাৎ যেন সমুদ্রের গর্জন। অসংখ্য হুঙ্কারধ্বনি জেগে উঠল। কালো কুচকুচে বলিষ্ঠ মানুষগুলো ধারণ করলো সংহারমূর্তি। আর্তনাদ, হাহাকার। ভয়ে কে যেন চিৎকার করে কেঁদে উঠল। গর্জে উঠল কামান ধ্বনি। ঝলকে ঝলকে আগুন আর বারুদের গন্ধ। দিগ্বীদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাণের ভয়ে ছুটলো মানুষ। ছুটছে অশ্বগুলো। মত্ত হয়ে উঠল হাতীর দল।

সকাল হল। আলো ফুটলো। সূর্য উঠল আকাশে।

তখনও সমানে ধ্বনিত হচ্ছে কামানের গর্জন। মানুষের কাতরোক্তি শোনা যাচ্ছে। একের পর এক আগুন জ্বলে উঠছে সুলতানের রণতরীগুলোতে। দিনের আলোয় ভূতের মত কালো মানুষগুলোকে ধূলায় রক্তে আরো হিংস্র দেখাচ্ছে। মরছে ওরাও, কিন্তু মেরে মরছে।

মধ্যাহ্নের কিছু আগে অসংখ্য সেনা নিয়ে ছুটে এল যদু নারায়ণ। নৌবাহিনী নিয়ে এলেন গণেশ নারায়ণ। কিন্তু যুদ্ধ তখন সমাপ্তির মুখে। সুলতানের সৈন্যরা তখন পিছু হটতে আরম্ভ করেছে। তরী থেকে জলে ঝাঁপিয়ে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত মানুষগুলো।

একসময় শেষ হলো যুদ্ধ। বন্দী হল অসংখ্য। আবিষ্কৃত হল সুলতান শিহাবুদ্দীন বায়জিদ শাহের ক্ষতবিক্ষত দেহ। পুণর্ণবার তার রূপ নিল শশ্মানের।

সেই শশ্মানের মাঝে কার যেন অনুসন্ধান করলো গণেশ নারায়ণ। খুঁজল যদিও, কিন্তু অসংখ্য কালো কালো মূর্তির মাঝে পরিচিত মূর্তিটা দৃষ্টিগোচর হল না।

ওরা তখন প্রান্তর থেকে একটু দূরে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। তুজনে তুজনের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

মহেন্দ্র বলল, জান ব্রজ দাদা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে শয়তানকে বুঝি তোমার মতই দেখতে।

নিজেকে যদি দেখতে পেতে তাহলে ও কথাটি উচ্চারণ করতে না মহেন দাদা। বলল ব্রজ।

রঙ মাখা তুটো মূর্তি হেসে উঠল এক সঙ্গে।

সুলতানী মসনদ নয়, রাজ সিংহাসন। রাজা গণেশ নারায়ণ। ভাতুড়িয়ার সামান্য এক ভু-স্বামী। পাণ্ডুয়ার আকাশে উড়ছে হিন্দুর বিজয় পতাকা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে হিন্দু। রাজা গণেশের জয়ধ্বনীতে মুখর হয়ে উঠেছে বাংলার আকাশ বাতাস।

দীর্ঘ দুশো বছর ধরে মুসলমান শাসনের অবসানে প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু শাসন। নহবতে বেজে উঠল সানাইয়ের মিষ্টি মধুর রাগিনী। সভাগৃহ পূর্ণ হল মন্ত্রী, পাত্র মিত্র সভাসদের দলে। সসম্মানে বিদায় দিলেন উজীর আমিরদের। হারেমের বন্দীদের প্রতি জানালেন সহানুভূতি। বলে পাঠালেন, কেউ যদি মুক্তি চান, বিনা দ্বিধায় তিনি মুক্তি দেবেন। নইলে স্বচ্ছন্দে বাস করুন তাঁরা। তাঁদের কোন অসুবিধার কারণ তিনি ঘটাবেন না।

বিচার করলেন যুদ্ধ বন্দীদের। আজম খান আর নূরকুৎব আলমের। সুলতানের অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে তাঁরাও বন্দী হয়েছিলেন।

৮১৬ হিজরার মধ্যভাগ। আকাশে শরতের সোনালী সূর্য। বাতাসে শিউলীঝরার গন্ধ। এক লাখী প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রথম অনুষ্ঠিত হল রাজা গণেশের সভাকার্য। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে তিনি এক হতে আবেদন জানালেন। বললেন, হিন্দু-মুসলমান নয়, আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা মানুষ, আমরা বাঙ্গালী। ঈশ্বর এই বিশাল পৃথিবীর জন্যে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। আর মানুষই সৃষ্টি করেছে জাতি ধর্ম, উচ্চ নীচ, সমাজ, সংস্কার। আমি কোনটারই নিন্দা বা প্রশংসা করছি না। আমি বলছি না, মানুষ তার সমাজ সংস্কার ধর্ম ত্যাগ করুক। বলছি না,

সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এক হতে। আমার এক হতে বলার অর্থ মানুষ যেন মানুষের ধর্ম পালন করে। পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ত্যাগ করতে হবে। হিন্দু মুসলমান নয়, আমরা বাঙ্গালী। দুশো বছরের মুসলিম শাসনে মুসলমান সুলতানরা বলে এসেছেন, হিন্দুরা জিম্মি, কাফের। হিন্দুদের ওপর দিনের পর দিন অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে এসেছেন তাঁরা। ক্ষমতার মদমত্ততায় হিন্দুর ধর্ম জীবন আর ঘরের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ বানিয়েছেন। দেবতাকে টেনে ফেলে দিয়েছেন পথের ধূলায়। হিন্দু শুধু মার খেয়েছে, মরেছে, চোখের সামনে লুণ্ঠিত হতে দেখেছে নারীর ইজ্জত। তারা আবেদন জানিয়েছে, বিচার চেয়েছে। পায়নি। কিছুই পায়নি তারা। কিন্তু আজ ?

একটু নীরব ছিলেন তিনি। চিন্তাচ্ছন্ন দেখিয়েছিল তাঁকে। বলেছিলেন, আজ শাসনক্ষমতা হিন্দুর অধিকারে। হিন্দু ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারে। বিধর্মীয় গোঁড়ামী মুসলমানকে অত্যাচারী করে তুলেছিল, সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারে, কিন্তু না। হিন্দু কোনদিন পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নয়। হিন্দু জানে, ধর্ম তার প্রাণের সম্পদ। জীবনের চেয়েও ধর্ম অনেক বড়। যে যার আচার অনুষ্ঠান ধর্ম পালন করুক মানুষের মত। কিন্তু তা যদি কেউ না করে, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই আমি জানাচ্ছি, ধর্মের গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় দেয় যদি কেউ, আমি ক্ষমা করবো না।

মুক্তি দিলেন বন্দী সৈন্যদের। বিচার করলেন আজম খান আর নূরকুৎব আলমের। মুক্তি পেলেন না আজম খান। ষড়যন্ত্রকারী তিনি। অনেক অপরাধ প্রমাণিত হল তাঁর বিরুদ্ধে। বিচার সভায় অনেকেই রায় দিলেন প্রাণদণ্ডের। কিন্তু তিনি সারা জীবন কারাগারে নিক্ষেপ করলেন তাঁকে। বললেন, মৃত্যুতো ক্ষণিকের যন্ত্রণা বোধ। দেহটা প্রাণহীন হলে সব শেষ হয়ে যাবে।

তার চেয়ে কারাগারে বসে ওঁর পাপের শাস্তি বাকী জীবনটা ভোগ করুন।

নূরকুৎব্ আলমের কাছে জানতে চাইলেন, আপনি কী বিচার চান ফকির সাহাব?

আমি! যেন চমকে উঠলেন নূরকুৎব্ আলম।

হ্যাঁ আপনি। বললেন তিনি, কী চান, মৃত্যু না মুক্তি?

মৃত্যু না মুক্তি? কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন বৃদ্ধ। বললেন, একি বলছেন আপনি?

যা বলছি তা সত্য। আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন!

তাই পাবো?

তাই পাবেন ফকির সাহাব। আপনি মুক্তিই নিন?

মুক্তি নেব?

হ্যাঁ নেবেন। আপনাকে মুক্তি দিলাম আমি। আপনাকে মুক্তি দেওয়া আমার কর্তব্য। কারণ বাংলা দেশের মসনদে একের পর এক সুলতানেরা বসেছেন। শাসন করেছেন দেশকে, মানুষকে। তাঁরা জীবনে চেয়েছেন, সুখ সম্পদ স্বাচ্ছন্দ। কিন্তু তাদের মনে হিংসার বীজ বপন করেছেন আপনারাই। হিন্দুদের প্রতি তাঁদের মনটাকে অত্যাচারী করে তুলেছেন। বুঝিয়েছেন হিন্দুরা কাফের, মুসলমানের রাজ্যে তাদের কোন অধিকার থাকা উচিত নয়। তাদের ধর্মান্তরিত করলে, হিন্দু নারীর ধর্ম নষ্ট করলে খোদা দোয়া করবেন। কথাগুলো বিশ্বাস হয়তো তাঁরা করেননি, কিন্তু খোদার পীর আপনাদের উৎসাহে মন থেকে পাপের ভয় কেটে গেছে তাদের। হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারী হয়ে উঠেছেন তাঁরা। সেই সুযোগে জঘন্য উপায়ে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়েছেন আপনারা। কিন্তু ফকির সাহাব, জোর করে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের কাছে একবার তাদের মনের কথাটা জানবেন। জিজ্ঞাসা করবেন, মুসলমান হবার পরেও তারা খোদাকে ভালবাসতে পেরেছে কিনা?

মুক্তি দিলেন দরবেশ নূরকুৎব আলমকে। বললেন, ফকির সাহাব, অনেক অপরাধে অপরাধী আপনি। অন্যায়ের সীমা নেই আপনার। তবু আপনাকে মুক্তি দিলাম। আপনি দেখুন, প্রত্যক্ষ করুন, হিন্দুর শাসন পক্ষপাত দোষে দুষ্ট কী না? হিন্দু চিরকাল আশ্রিতবৎসল, সেই নীতি সে কেমন করে পালন করে। কিন্তু সাবধান, হিন্দু মুসলমানের এই মিলনের মাঝে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে যদি প্রবেশ করাতে চান, যদি শুরু করেন শয়তানীর খেলা, তখন কিন্তু ক্ষমা করবো না।

মুক্তি পাওয়ার পর নীরবে নতমস্তকে বিদায় নিলেন নূরকুৎব্ আলম। হিন্দু মুসলমানের মিলিত কণ্ঠ জয়ধ্বনি দিল রাজা গণেশের।

কটা মাসের মধ্যে রাজা গণেশের সুশাসনে ফিরে এল শান্তি। হিন্দু মুসলমান হয়তো মিলে মিশে এক হতে পারল না, কিন্তু হিন্দুর প্রতি প্রকাশ্য বিদ্বেষভাব দমন করতে বাধ্য হল তারা। হিন্দুরা বহুদিন পরে তাদের আচার অনুষ্ঠান আনন্দ উৎসব নির্বিঘ্নে পালন করতে পারল। হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাব যে কোথাও ফিরে এল না তা নয়। পাশাপাশি বাস করে মিলে গেল তারা।

আর হিন্দু মুসলমানের এই মিলন অসহ্য বোধ করলেন নূরকুৎব্ আলম। দিনের আহার রাতের নিদ্রা ভুলে গেলেন তিনি। ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করলেন। অভাব হল না শয়তানের। অনেকেই যোগ দিল তাঁর সঙ্গে। যোগ দিল বাংলার মোল্লা ফকির দরবেশরা। মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ এবার প্রকাশ্যে গণেশের বিরোধিতা শুরু করলো।

বারবার সাবধান করলেন গণেশ। হুঁশিয়ার করে দিলেন। কিন্তু যখন তাঁর সাবধানবাণীতে কোন ফল হল না, তখন এই বিরোধিতা কঠোর ভাবে দমন করার আদেশ দিলেন তিনি। দরবেশদের কয়েকজনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। ধ্বংস করলেন

কয়েকটি মসজিদ আর ঐসলামিক প্রতিষ্ঠান। কারণ এগুলিই ছিল শয়তানীর ঘাঁটি।

গণেশ নারায়ণ বুঝতে পারলেন, প্রধান শয়তান নূরকুৎব্ আলম। কিন্তু তাঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভব হল না। কারণ নূরকুৎব্ আলমের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলেন না তিনি।

তবু তিনি তাঁকে ডেকে কঠিন কণ্ঠে সাবধান করলেন। উত্তরে মৃদু হেসে নূরকুৎব্ আলম জানালেন, তিনি নির্দোষ। বর্তমানে মেহেরবান খোদার ভজনা ভিন্ন আর কিছুই তিনি করেন না। তাঁর দোয়াই শেষ জীবনে কামনা করেন তিনি।

বৃদ্ধ দরবেশের শয়তানীমাখা মুখের দিকে চেয়ে সবই বুঝতে পারলেন গণেশ নারায়ণ। বুঝতে পারলেন, তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের বিরোধিতার নায়ক নূরকুৎব্ আলম। প্রকাশ্যে নয়, গুপ্তভাবে তিনি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাইলেন তাঁকে।

বাধা দিল যদু। পিতার মনোভাব যেন বুঝতে পারল সে। বলল, আপনি কী দরবেশকে শেষ করে দিতে চান?

এঁ্যা! চমকে উঠলেন গণেশ নারায়ণ। পুত্র তাঁর মনের কথা কেমন করে জানতে পারল, বুঝতে পারলেন না তিনি। কেমন যেন অসহায় দেখাল তাঁকে। পুত্রের প্রশ্নের সহসা কোন উত্তরও দিতে পারলেন না।

যদু হাসল। বলল, আমি আপনার মনের কথা বুঝতে পারি বাবা। আর আমার মনে হয়, আপনি যা চিন্তা করছেন তা যদি কার্যকরী করেন, তাহলে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কাই বেশী।

কেন?

নূরকুৎব্ আলম সত্যই নির্দোষী।

কিন্তু···

ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়েছে। তাদের অপরাধ প্রমাণ হওয়ার

পর উচিত শাস্তিই তারা পেয়েছে। কিন্তু নূরকুৎব্ আলমকে আপনি যদি গুপ্তহত্যা করান, আপনাকেই সন্দেহ করবে সকলে। আপনার বদনাম হবে তাতে।

তাহলে ?

চিন্তিত হলেন গণেশ নারায়ণ। যত্নর কথাটাই সত্য বলে মনে হল তাঁর। জীবনে চরম ভুল করলেন তিনি।

জুবেদাও সেই কথাই বলল। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে চাইল সে। চোখ দুটি ছলছল করে উঠল তার। মৃত্নকণ্ঠে বলল, এমন ভুল করবেন না কুমার।

ভুল ! এর নাম কী ভুল ? না, ভুল নয়। ভুল বলে মনে হল না যত্নর। তার মন প্রাণ আজ জুবেদাকে চায়। ওর জন্যে সব পারে সে, সব কিছু। ভাতুড়িয়ার প্রাসাদে স্ত্রী আছে, পুত্র আছে। কিন্তু কদিন হল সব ভুলেছে সে। চিণ্ময়ীর মুখখানা একবারও মনে পড়ে না তার। জুবেদাকে দেখবার পর থেকে সব ভুলে গেছে।

কদিন আগের কথা। বিকালে অশ্বারোহনে বেড়াতে বেরিয়ে ছিল যত্ন। পরদিনই ভাতুড়িয়া ফিরে যাবে। মহেন্দ্র কদিন আগেই ফিরে গেছে। প্রায়ই পাণ্ডুয়া আর ভাতুড়িয়া যাতায়াত করে ও। পিতা সিংহাসনে বসার পর তার আর ভাতুড়িয়া যাওয়া হয়ে ওঠে নি। কারণ পিতা তাকে ছেড়ে দিতে চান নি। পিতার সঙ্গে থাকার সেও প্রয়োজন বোধ করেছিল। কিন্তু চিণ্ময়ীর পত্র নিয়ে উপস্থিত হল ব্রজ। অনেক দিন পরে স্ত্রীর পত্রখানি বারবার পাঠ করেছিল। অনুযোগ আর অনুযোগ। অনুযোগের অন্ত নেই চিণ্ময়ীর।

না, না, তা কেন ? যত্ন ভেবেছিল। চিণ্ময়ী সত্য কথাই লিখেছে। সত্যই ক'মাসে ওর কথা মনে হলেও মিলনে ব্যাকুলতা জাগে নি। অশ্বারোহনে যেতে যেতে চিণ্ময়ীর কথাই বারবার মনে পড়েছিল

তার। আগামীকালই ভাতুড়িয়া যাত্রা করবে সে। পূর্ণ করবে চিণ্ময়ীর পতি-মিলনের আকাঙ্খা। পুত্রের জন্যেও মনটা ব্যাকুল হয়েছিল তার।

পিতাও মত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এখন স্বচ্ছন্দে কিছুদিন তুমি ভাতুড়িয়া থেকে ঘুরে আসতে পার। তোমার মাও তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে ব্রজকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে আমার কাছে।

ধীর স্থির শান্ত নম্রা চিণ্ময়ীর কথাই ভাবছিল যদু। চিণ্ময়ী যেন প্রদীপের শিখার মতই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল। ওর দু চোখের দৃষ্টি তাকে মুগ্ধ করে। মনকে এক অনাবিল শান্তিতে পূর্ণ করে তোলে।

হঠাৎ পিছন থেকে আহ্বান শুনে অশ্বের গতিরোধ করেছিল যদু। হাসিমুখে কাছে এসেছিলেন দরবেশ নূরকুৎব্ আলম। সালাম জানিয়ে ছিলেন তাকে।

বিস্মিত হয়েছিল যদু। দরবেশের এই আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারের অর্থ খুঁজে পায় নি সে। একটু সন্দেহ যে জাগেনি তা নয়। তবু প্রশ্ন করেছিল, কী সংবাদ ফকির সাহাব?

হেসেছিলেন নূরকুৎব্ আলম। বলেছিলেন, মেহেরবান খোদার মেহেরবানীতে দিন বেশ ভালই কাটছে কুমার। লেকিন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

বলুন।

আপনাকে আমি একটি অনুরোধ জানাবো কুমার। মেহেরবানী করে আপনি যদি ব্যবস্থা করে দেন।

কী ব্যবস্থা! বিস্মিত হয়েছিল যদু।

বলেছিলেন নূরকুৎব্ আলম। জেবের মধ্য থেকে বার করে ছিলেন বেগমের পত্রখানি। সুলতান শিহাবুদ্দীনের বিধবা। তিনি অনুরোধ করে দরবেশকে পত্র লিখেছেন। তিনি যেন মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বেগমের একটু মাথা গোঁজার আশ্রয় আর দু বেলা দুটি অন্নের ব্যবস্থা করেন।

ফারসীতে লেখা পত্রখানি পাঠ করেছিল যদু। সত্য সত্যই দরবেশকে অনুরোধ জানিয়েছেন বেগম। কিন্তু সে ভেবে পায় নি, পত্র দরবেশকে না লিখে মহারাজকে লিখলেন না কেন ?

তার মনের কথা যেন বুঝতে পেরেছিলেন নূরকুৎব আলম। বলেছিলেন, বেগম আমার পরিচিতা। তাছাড়া হয়তো মহারাজকে তাঁর অভিপ্রায় জানাতে সংকোচ বোধ করেছেন। আমিও সাহসী হইনি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতে।

কেন ?

কেনর উত্তর দিতে পারেন নি তিনি। যদুরও অজানা ছিল না সে কথা। মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশের বিরোধিতা এবং দরবেশদের সেই বিরোধিতায় যোগদান, গণেশ নারায়ণকে তাঁদের প্রতি ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। কজনকে শাস্তিও দিয়েছিলেন তিনি। তাই নূরকুৎব্ আলম সাহসী হননি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতে।

যদু বলেছিল, আমি মহারাজকে একথা জানাবো।

ধন্যবাদ জানিয়ে ছিলেন নূরকুৎব্ আলম। বিদায় নিয়েছিলেন তিনি। ভ্রমণ শেষে প্রাসাদে ফিরে এসেছিল যদু।

কিন্তু পরদিন ভাতুড়িয়া যাত্রা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। সামান্য অসুস্থ হয়েছিলেন গণেশ নারায়ণ। পিতাকে অসুস্থ দেখে যাত্রা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল যদু।

মধ্যাহ্নে আপন কক্ষে বিশ্রামরত যদু ভৃত্য মারফৎ একখানি পত্র পেয়েছিল। পত্র দিয়ে ছিলেন নূরকুৎব আলম। তিনি তার সাক্ষাৎপ্রার্থী। যদু যদি অপরাহ্নে তাঁর সঙ্গে দয়া করে একবার সাক্ষাৎ করে, তিনি কৃতার্থ হবেন। সাক্ষাতের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তিনি।

সাক্ষাৎ করেছিল যদু। আর সাক্ষাতের পরেই অদ্ভুত অনুরোধ জানিয়েছিলেন নূরকুৎব্ আলম। বেগম তার সাক্ষাৎপ্রার্থী। সে যদি একবার সাক্ষাৎ করে বেগম আনন্দিত হবেন।

যত্ন বলেছিল, বেগমের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন বাধা নেই। কিন্তু···

যত্নর ইচ্ছাটুকু বুঝতে পেরেছিলেন নূরকুৎব্ আলম। হারেমে প্রবেশে তার বাধা। কিন্তু সে বাধাটুকু দূর করেছিলেন। যত্ন সাক্ষাৎ করেছিল বেগমের সঙ্গে। শিহাবুদ্দীনের বেগমের সঙ্গে কথা বলে খুশী হয়েছিল। সুন্দর ব্যবহার করেছিলেন তিনি তার সঙ্গে। যেন সে তার কত পরিচিত ?

বেগমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছিল সে। ঠিক এমনি সময় তার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল একখানি প্রতিমা। চমকে উঠেছিল যত্ন। সমস্ত শরীরে শিহরণ জেগেছিল। মনে হয়েছিল···

বেগমের অনুরোধ রেখেছিল যত্ন। পরদিনও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল। তারপরের দিনও। ভাতুড়িয়া যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি তার। পিতার প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যা বলেছিল। গোপনে যাতায়াত শুরু হয়েছিল হারেমে। শূন্যতার ছায়া ঘনালেই জুবেদার শরীটা তাকে আকর্ষণ করতে লাগল। যত্ন সব ভুললো।

জুবেদা বলল, এমন ভুল আপনি করবেন না কুমার। এ ভুলের সংশোধন নেই।

যত্নর দুচোখে কামনার আগুন। জুবেদার দেহটাকে এই মুহূর্তে দলে পিষ্ট করতে সে অস্থির। বলল, একে তুমি ভুল বলছো কেন জুবেদা ?

সত্যই এ ভুল কুমার। এ ক্ষণিকের মোহ।

না জুবেদা, এ মোহ নয়।

কুমার !

তুমি বাধা দিও না জুবেদা, অমত কোর না। তুমি বিশ্বাস কর, সত্যিই আমি তোমাকে ভালবেসেছি। আমি তোমাকে আমার একান্ত আপন করে পেতে চাই।

সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি। শাহজাদা সৈফুদ্দীনও বলেছিলেন একথা। বলছে যদু নারায়ণ। তবু জুবেদা বলল, আপনি যে হিন্দু কুমার, ব্রাহ্মণ। আমি মুসলমানী।

আমি ধর্ম মানি না জুবেদা।

কিন্তু ঘরে আপনার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে?

থাকুক।

কুমার!

আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না জুবেদা। তোমার কোন বাধা মানবো না। যুক্তি তর্কে তুমি আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না। আমি তোমাকে না পেলে পাগল হয়ে যাব।

সত্য সত্যই জুবেদার কোন বাধা টিঁকলো না। বাধা দিয়ে ফেরাতে পারল না যদুকে। তার সব বাধা ব্যর্থ হয়ে গেল। যদু তার দুই বাহুর বলিষ্ঠ আকর্ষণে ওকে কাছে টেনে নিল।

অনেকক্ষণ পরে। অন্নদার কক্ষ। যদু চলে গেছে। জুবেদা একা। একটা ক্ষুধার্ত পুরুষ নারী দেহ ভোগ করে ফিরে গেছে। হয়তো এতক্ষণে ক্ষণিকের ভুলের অনুশোচনা জেগেছে তার অন্তরে।

জুবেদা ভাবল। তার মনে হল, সংসারে তার কোন মূল্য নেই। এ দেহটা কেবল ক্ষুধার্ত পুরুষের ক্ষুধা মেটাচ্ছে। খোদা তাকে পুরুষের ভোগের জন্যেই পাঠিয়েছেন। অনেক কিছু চেয়েছিল সে। জীবনে অনেক স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু কিছুই পেল না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিছু হয়তো পাবেও না।

মহেন্দ্রর হাত দুটো ধরে অনুনয়ে ভেঙ্গে পড়লো, চিণ্ময়ী, না ঠাকুরপো না, এমন ভুল তুমি কোর না।

কিন্তু বৌঠান···

কী যেন বলতে গেল মহেন্দ্র। বাধা দিল চিণ্ময়ী। দু' ফোঁটা

অশ্রু ঝরে পড়লো তার চোখে। কান্না ঝরা গলায় বলল, দোষ তার নয় ঠাকুরপো। দোষ আমার ভাগ্যের। ভাগ্যের লিখন কে খণ্ডাবে ভাই?

কথা বলতে পারল না মহেন্দ্র। মাথায় তার আগুন জ্বলছিল। সে ভাবতে পারছিল না, বিশ্বাস করতে পারছিল না কথাটা। ছিঃ, ছিঃ! লজ্জায় তার মাথা কাটা যাচ্ছিল। কঠিনকণ্ঠে ব্রজকে বলেছিল, একথা কী সত্যি ব্রজ দাদা?

সত্যি! মাথাটা নীচু করেই মৃদুকণ্ঠে বলেছিল ব্রজ। মুখ তুলে চাইতে পর্যন্ত পারেনি। কারণ সে তার জ্যেষ্ঠ ভাইকে চেনে। শেষ কালে…

সত্যবতীকেই সংবাদটা জানিয়েছিল ব্রজ। যদিও সে সত্য কথা প্রকাশ করতে চায়নি। গোপন করতে চেয়েছিল প্রকৃত কারণ। কিন্তু গোপন রাখা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

চিন্ময়ীর পত্র নিয়ে পাণ্ডুয়া যাওয়ার কিছুদিন পরে একদিন একাকী ফিরে এল ব্রজ। সংবাদ পেয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল চিন্ময়ী। কোন কুণ্ঠা না রেখে বৃদ্ধের কাছে প্রশ্ন করেছিল, কী হল ব্রজ দাদা, তিনি এলেন না?

বিচলিত হয়েছিল ব্রজ। সত্য প্রকাশ করতে পারেনি। বলেছিল, আসবে বউদিমণি।

তিনি কী খুব ব্যস্ত? জানতে চেয়েছিল চিন্ময়ী।

হ্যাঁ, বউদিমণি। মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছিল সে।

চিন্ময়ীর মুখখানা অন্ধকার হয়েছিল।

সত্যবতীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মিথ্যা বলতে পারেনি ব্রজ। চেষ্টা করেছিল মিথ্যা বলার, কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েছিল। সব শুনে পাষাণে পরিণত হয়েছিল সত্যবতী।

অন্তরালে থেকে শুনেছিল দুই বোন। সব শুনে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল চিন্ময়ী।

শুনেছিল মহেন্দ্র। ব্রজকে প্রশ্ন করেছিল, একথা বাবা মশায় জানেন ?

না।

জানেন না তিনি ? কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল মহেন্দ্রর। ব্রজর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল। মনে হয়েছিল ব্রজ বোধহয় মিথ্যা বলছে।

ব্রজ বলেছিল, জানে না অনেকেই। আমিও জানতে পারিনি প্রথমটায়। ছোট মশায় খুব সাবধানে যাতায়াত করেন। আর···

কী ?

সেই ফকিরটা। নূরকুৎব্ আলম ?

হ্যাঁ, তার সঙ্গেও যেন যোগাযোগ হয়েছে ছোট মশায়ের। কদিন নজর রেখে দেখেছি, কী সব কথা বলেন ওরা।

কোথায় ?

বলেন পথেই। যেন হঠাৎ দেখা হয়ে যায় দুজনের। যেন কথা বলতে হয় বলেই বলেন। কিন্তু আমার সন্দেহ তা নয়। ওই ফকিরটাই যত নষ্টের মূলে।

একথা বাবা মশায়কে জানাওনি কেন তুমি ?

জানাবো বলে ক'বার ভেবেছি। বলেছিল ব্রজ। ক'বার জানাতেও গেছি। কিন্তু জানানো সম্ভব হয়নি। মনে হয়েছে, এসব কথা জানানো উচিত হবে না। সেইজন্যেই ভাতুড়িয়ায় চলে এসেছি। কথাটা তোমাকে বলবো ভেবেছিলাম, পারলাম না।

চিন্তা করেছিল মহেন্দ্র। দিন রাত্রি অষ্টপ্রহর একই চিন্তা তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। কী করবে সে ? কী করতে পারে ? কী করা তার কর্তব্য ?

মৃণ্ময়ী জানতে চেয়েছিল, কী ভাবছো ?

ভাবছি! ম্লান একটু হাসি ফুটেছিল মহেন্দ্রর ওষ্ঠে। বলেছিল, ভাবছি না কিছুই, একটা জিনিষ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কী ?

কালো মেঘ। ঝড় বইছে। সব কিছু ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দেবে। একটু চুপ করেছিল মহেন্দ্র। বলেছিল, আর হয়তো সেদিন ফিরে আসবে না মৃণ্ময়ী। শনির দৃষ্টি পড়েছে আমাদের ওপর। আমরা হয়তো…

না, না। ভয় পেয়েছিল মৃণ্ময়ী। মহেন্দ্রর মুখটা চেপে ধরেছিল। বলেছিল, তুমি পার না ?

কী পারি না ? জানতে চেয়েছিল মহেন্দ্র।

ওঁকে ফেরাতে।

কী হবে ? ফিরিয়ে কী কোন লাভ আছে ?

কেন নেই ?

আজ সে…

না, না। বাধা দিয়েছিল মৃণ্ময়ী। বুঝিয়েছিল যেন। বলেছিল, ভুল সকলেই করে। তোমার দাদা বলে বলছি না। ওঁকে ফিরিয়ে আনা তোমার কর্তব্য।

সে যদি না ফেরে ?

তবু তোমার চেষ্টা করা উচিত। মৃণ্ময়ী বলেছিল, দিদির জন্যে নয়, মায়ের কথাটা একবার ভাব দেখি। তোমরা পুরুষ, দেখতে পাচ্ছ না। কিন্তু তাঁর মনে যে কী ঝড় বহে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি। আর বাবা যখন জানতে পারবেন ?

মহেন্দ্রও ভেবেছিল সে কথা। ব্রজর কথাটা সত্য বলেই মেনে নিয়েছিল সে। কিন্তু যেদিন তিনি জানতে পারবেন, সেদিনের কথাটা চিন্তা করতে পারেননি।

পরদিনই পাণ্ডুয়া যাত্রার আয়োজন করেছিল মহেন্দ্র। ব্রজও সঙ্গে যাবে। বিদায় নিয়েছিল মায়ের কাছে। সত্যবতী পুত্রের শির চুম্বন করে আশীর্বাদ জানিয়েছিল। বিদায় নিয়েছিল মৃণ্ময়ীর কাছে। চিণ্ময়ীর কাছে যেতে পারেনি। কিন্তু সে-ই তার পথ রোধ করেছিল।

বলল, তোমাকে একটা কথা বলার ছিল ঠাকুরপো !

বল বৌঠান।

তুমি পাণ্ডুয়া যাচ্ছ ঠাকুরপো ?

মহেন্দ্র চুপ করেছিল। উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। কারণ, লজ্জায় সে চিন্ময়ীর সঙ্গে দেখা করেনি। প্রতিবার কোথাও যাওয়ার আগে বলে বিদায় নেয়, কিন্তু এবার সে চোরের মত চুপিচুপি যেতে চেয়েছিল। জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের অপরাধ তাকে মর্মাহত করে তুলেছে।

মৃদুকণ্ঠে চিন্ময়ী বলল, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি যদি আমার সংবাদ জানতে চান, বোল, আমি বেশ আনন্দে আছি। কোন দুঃখ নেই আমার।

বৌঠান!

হ্যাঁ, ঠাকুরপো।

না বৌঠান, ও কথা আমি বলতে পারব না। আমি···

মহেন্দ্রর দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠেছিল। ভয় পেয়েছিল চিন্ময়ী। ওর দু'হাত জড়িয়ে দুরন্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সে, না ঠাকুরপো না, এমন ভুল তুমি কোর না। তিনি আছেন এইটুকুই তো আজকে আমার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। হাতের শাঁখা, সিঁথির সিঁন্দুরই তো নারীর একমাত্র সম্বল। এইটুকুই আমার অক্ষয় হয়ে থাক ঠাকুরপো, আর কিছু চাই না। কিছু না !

দশ

যদুর ক্ষীণ কণ্ঠটা ক্ষণিকের জন্যে শোনা গেল, আপনি বিশ্বাস করুন বাবা! আমি এর কিছুই···

বিশ্বাস! যেন গর্জে উঠলেন গণেশ নারায়ণ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করলো তাঁর, সত্যই আমি বিশ্বাস করেছিলাম যদু। তোমাকে বিশ্বাস করে ভুল করেছিলাম আমি। সেদিন তুমি আমাকে ভুল বুঝিয়েছিলে। আমার ভুল বোঝার সুযোগে চরম সর্বনাশ করেছো। দরবেশ নূরকুৎব আলমকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য সেদিন আমি বুঝতে পারিনি। আজ পারছি।

কিন্তু না, কিছুই বললেন না তিনি। সেদিন পুত্রের কথা বিশ্বাস করেছিলেন তিনি। আজও সে বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটলো না তাঁর। ওর দোষ কী? সেদিন তিনি যদি জঘন্য উপায় অবলম্বন করতেন, সত্যই বদনাম হ'ত তাঁর। কিন্তু আজ কী করবেন তিনি?

জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কী সসৈন্যে বাংলার দিকে ছুটে আসছেন। ইব্রাহিম শর্কীকে বাংলা আক্রমণে অনুরোধ জানিয়েছেন নূরকুৎব্ আলম। ত্রিহুতরাজ বন্ধু শিবসিংহের পত্রে সব কিছু অবগত হয়েছেন তিনি। শিবসিংহ ইব্রাহিম শর্কীর কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। তাঁর সুদৃঢ় দুর্গ লেহরা আজ শত্রুর অধিকারে। পলায়নের পূর্বে বন্ধুকে সাবধান করে দিয়েছিলেন তিনি। সাবধান করেছিলেন আগেও। কিন্তু যে পত্রবাহককে তিনি পাঠিয়েছিলেন, সে ত্রিহুতে ফিরে যায়নি।

পত্রবাহকের নিখোঁজে বজ্রাহতের মত অনেকক্ষণ নীরব নিস্পন্দ-

ভাবে বসেছিলেন গণেশ নারায়ণ। তাঁর সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কিছুই বুঝতে পারেন নি তিনি। বন্ধু শিব সিংহের পরাজয়ে যত না দুঃখ পেয়েছিলেন, তার চেয়েও আশ্চর্য হয়েছিলেন তাঁর পত্র এবং পত্রবাহকের সংবাদ না পাওয়ায়। বুঝতে পেরেছিলেন ষড়যন্ত্র। নিশ্চয়ই এমন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি আছে যে ইতিপূর্বে শিবসিংহের পত্র এবং পত্রবাহক উভয়কেই গোপন করেছে। হয়তো হত্যা করেছে হতভাগ্য পত্র-বাহককে।

একাকী বসেছিলেন গণেশ নারায়ণ। নিজেকে কেমন যেন দুর্বল বলে বোধ হয়েছিল তাঁর। বাংলার ঘোর দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে জেনেও চাঞ্চল্য জাগেনি মনে। ইব্রাহিম শর্কীকে যে বাধা দেবেন, তেমন উৎসাহ বোধ করেননি তিনি।

অনেকক্ষণ পরে যদু এসে প্রবেশ করলো কক্ষে। পিতাকে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে দেখে কাছে এল। জিজ্ঞাসা করলো, কী হয়েছে বাবা? এমন অসময়ে বসে আছেন কেন?

সত্যই অসময়। কোনদিন প্রভাতে এমনভাবে কখনো বসে থাকেন না তিনি। ব্যতিক্রম ঘটেছে আজ। পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে কথা বলতে পারলেন না তিনি। কেবলমাত্র একবার তার মুখের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। এগিয়ে ধরলেন হাতের পত্রখানি।

পিতার কাছ থেকে পত্রখানি নিয়ে পাঠ করল যদু। ক্ষীণ কণ্ঠটা ক্ষণিকের জন্য শোনা গেল তার। পিতাকে সে যেন বিশ্বাস করাতে চায়।

বিশ্বাস! গর্জে উঠলেন গণেশ নারায়ণ। হৃতশক্তি ফিরে পেলেন যেন তিনি। পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আমি যুদ্ধ করবো।

হ্যাঁ বাবা। বলল যদু। আর যদি সম্ভব হয় নূরকুৎব্ আলমকে ধরে তার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেব।

যদি সম্ভব হয়? আবার যেন তীক্ষ্ণ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বরটা।

যদু কিন্তু সহজ হয়েই বলল, কদিন হল তাঁকে পাণ্ডুয়ায় যেন দেখা যাচ্ছে না। হয়ত আগে থেকেই সাবধান হয়েছেন তিনি।

আমাদের অসাবধানতার ফল।

এঁ্যা। এবার বেশ যেন চমকে উঠল যদু।

কঠিন হলেন গণেশ নারায়ণ। আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, মহেন্দ্রকে পাণ্ডুয়ায় আসতে নির্দেশ পাঠাচ্ছি আমি। তুমি এক সহস্র সৈন্য নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব ভাতুড়িয়ার দিকে যাত্রা কর। ভাতুড়িয়া রক্ষার দায়িত্ব আমি তোমাকে দিলাম।

কিন্তু·

বল।

আমাকে ভাতুড়িয়া পাঠাচ্ছেন কেন? মহেন্দ্র তো সেখানে আছে?

আছে, কিন্তু তাকেই আমার প্রয়োজন।

আমি কী···

কথাটা শেষ করতে পারল না যদু। বাধা দিলেন তিনি। বললেন, অনুপযুক্ত তুমি নও। আর অনুপযুক্ত নও বলেই তোমাকে আমি ভাতুড়িয়া পাঠাচ্ছি। ভাতুড়িয়া রক্ষার দায়িত্ব আমি তোমাকে দিলাম। আমার ইচ্ছা, তুমি আজই ভাতুড়িয়া যাত্রা কর।

পিতার আদেশ মেনে নিল যদু। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে বাধ্য হল যেন। সেইদিনই সহস্র সৈন্য নিয়ে ভাতুড়িয়ার পথে যাত্রা করলো সে। পুত্রকে বিদায় জানালেন গণেশ নারায়ণ। যদুর চলে যাওয়া পথের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলেন। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর।

প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র তাঁর। শিক্ষায় দীক্ষায় জ্ঞানে গুণে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে দিন দিন। আনন্দিত হয়েছেন তিনি। পুত্র গর্বে পূর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর পিতৃহৃদয়। কিন্তু···

ভাবতে পারলেন না তিনি। যদু এ কী করলো? কেমন করে সে বিস্মৃত হল শিক্ষা দীক্ষা বংশ মর্যাদা। নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান হয়ে সামান্য এক নারীর মোহে আজন্মের সংস্কারকে বিসর্জন দিল?

কেমন করে? কেমন করে ভাবতে পারলেন না তিনি। তাঁর চিন্তাশক্তি কেমন যেন অবশ শিথিল হয়ে গেল। নিজেকে তিনি অসহায় বোধ করলেন।

হারেমের এক যবনীর মোহে পুত্র যে আকৃষ্ট হয়েছে, গোপনে শুরু হয়েছে সেখানে তার যাতায়াত, একথা অনেকে জানতেন না, তিনি জানতে পেরেছিলেন ঠিকই। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয় নি যদুর পক্ষে। যদিও প্রথমে তিনি শুধুমাত্র সন্দেহ করেছিলেন। হঠাৎই কেমন যেন সন্দেহ জেগেছিল তাঁর। গোপনে অনুসন্ধান করে সত্যের প্রকাশ ঘটলো। মরমে মরে গেলেন তিনি। সমস্ত সত্বা তাঁর তীব্র ঘৃণায় রি-রি করে উঠেছিল। আক্রোশ জেগেছিল মনে। ইচ্ছা হয়েছিল পুত্রকে ডেকে শাসন করেন। নয় তো বিচার করে শাস্তি দেন। কিন্তু কিছুই পারেন নি। পুত্রের অধঃপতন পিতার বুকে যতই শেল হানুক, সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে। উপায় চিন্তা করেছিলেন। কেমন করে তাকে সৎ পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। মনে পড়েছিল পুত্রবধূকে। দুঃখিনী মেয়েটার জন্যে বেদনায় ভরে গিয়েছিল তাঁর অন্তরটা। কিন্তু নিরুপায় অসহায়-তায় ছটফট করা ভিন্ন আর কোন পথ খুঁজে পাননি তিনি।

না, না, পথ খুঁজে পেলেন। বন্ধু শিবসিংহের পত্রখানি হাতে পাওয়ার পরই চকিতে একটি কথা মনে পড়েছিল তাঁর। যে কোন উপায়েই হ'ক যদুকে ভাতুড়িয়া পাঠাতে হবে। মোহমুক্ত করতে হবে তাকে।

আর নিশ্চিন্তে তিনি যে বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না, এ চিন্তাটুকু সিংহাসনে আরোহণের পর মুহূর্তেই তাঁর মনে

হয়েছিল। তিনি জানতেন, দুশো বছরের মুসলমান শাসনের অবসানে কোন হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নয় নির্বিবাদে রাজ্য পরিচালনা করা। আর তাঁর আশঙ্কাটা যে মিথ্যা নয়, প্রমাণিত হতে বিশেষ দেরি হল না। দেশটা একদিন হিন্দুর ছিল। কিন্তু দুশো বছর পূর্বে যে দিন মুসলমান কর্তৃক প্রথম বিজীত হ'ল দেশটা, সেদিন থেকে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানও স্থান পেল দেশের মাটিতে। আজ মুসলমানের সংখ্যা বড় কম নয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ বিরোধিতা শুরু করলো তাঁর। তিনি তাদের দমন করলেন। শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন দরবেশ নূরকুৎব্ আলমকে। বাধা দিয়েছিল যদু। কিন্তু সেদিন পুত্রের বাধাটুকু যদি মেনে না নিতেন, তাহলে হয় তো এতো শীঘ্র ইব্রাহিম শর্কী বাংলা আক্রমণে এগিয়ে আসতেন না।

কিন্তু এসেছেন যখন তিনিও প্রস্তুত। বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় তিনিও দেবেন। জয় পরাজয় ভাগ্য নির্ভর। যদি পরাজিত হন, সে পরাজয়কে তিনি হাসিমুখেই মেনে নেবেন। তবু বিনা বাধায় আপন অধিকার তিনি ত্যাগ করবেন না।

বৃদ্ধ নায়েবের আহ্বানে সম্বিত ফিরে পেলেন তিনি। নায়েব ডাকলেন, মহারাজ!

তিনি নীরবে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন। কথা বললেন না।

কি ভাবছেন মহারাজ?

ভাবছি! হাসলেন তিনি। যেন উৎফুল্ল দেখাল তাঁকে। বললেন, ভাবছি, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অপার করুণার কথা। সত্যই তিনি করুণাময়।

আশ্চর্য হলেন বৃদ্ধ নায়েব। মনে হল, তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন! দ্বারে শত্রু, কিন্তু নির্বিকার গণেশ নারায়ণ। মুখখানি প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ। মানুষ সুখী না হলে এমন প্রসন্নতা দেখা যায় না। কিন্তু এই প্রসন্নতার কারণটুকু অনুমান করতে পারলেন না তিনি। তাঁর যেন মনে হল, মহারাজের এই প্রসন্নতা হয়তো সত্য নয়। নয়তো

শত্রু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অচেতন। কিন্তু তাই বা কেমন করে হয়। গণেশ নারায়ণকে তিনি দীর্ঘ দিন দেখেছেন। অমন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী, কুশাগ্র বুদ্ধি, কুটনীতিজ্ঞ মানুষ জীবনে এক গণেশ নারায়ণ ভিন্ন দ্বিতীয় কেউ দৃষ্টিপথে আসেননি তাঁর। স্বয়ং বৃদ্ধ তিনি, তবু তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। বললেন, আসন্ন যুদ্ধের কথা কিছু চিন্তা করেছেন মহারাজ ?

চিন্তা! বৃদ্ধ নায়েবের মুখের দিকে চাইলেন তিনি। বৃদ্ধের ভীত ভাবটা লক্ষ্য করলেন। বললেন, এতে চিন্তার কী আছে নায়েব মশায়। আমি তো চিন্তার কোন কারণই দেখছি না।

চিন্তার কারণ নেই? বিস্ময়ের যেন শেষ রইলো না বৃদ্ধ নায়েবের।

না, নায়েব মশায়। হাসলেন তিনি। তেমনি প্রসন্ন হাসি। বললেন, আক্রমণকারীকে আমরা সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে বাধা দেব। দেহের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করবো।

কিন্তু···। কী যেন বলতে চাইলেন তিনি।

বাধা দিলেন গণেশ নারায়ণ। দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, জৌনপুরের স্থলতান ইব্রাহিম শর্কী যদি ভেবে থাকেন দুশো বছর আগে গখতিয়ারুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী যে ভাবে নবদ্বীপ জয় করেছিলেন, সেইভাবে তিনিও পাণ্ডুয়া অধিকার করবেন, তাহলে কিন্তু ভীষণ ভুল করবেন তিনি। বৃদ্ধ অথর্ব মহারাজ লক্ষ্মণ সেন হয়তো বিনা বাধায় স্থলতানকে নবদ্বীপ অধিকার করতে দিয়েছিলেন। কথাটা হয়তো তা নয়। বহুদিন যুদ্ধহীন অলস সৈন্যদের নিবুর্দ্ধিতাই বখ্‌তিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ অধিকার সহজ করেছিল। কিন্তু স্থলতান ইব্রাহিম শর্কীর পাণ্ডুয়া অধিকার সহজ হবে না। আমিও বৃদ্ধ হয়েছি কিন্তু বেঁচে আছি নায়েব মশায়।

বৃদ্ধ নায়েব কথা বলতে পারলেন না আর। তাঁর মনে হল, চিন্তাটা কত মিথ্যা, ভুল।

সেদিনই সন্ধ্যায় পাণ্ডুয়া এসে উপস্থিত হল মহেন্দ্র আর ব্রজ। আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ শুনলো তারা। জানতে পারল যদু সসৈন্য ভাতুড়িয়ার পথে যাত্রা করেছে। মহারাজা তাকে ভাতুড়িয়া রক্ষার দায়িত্বভার দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এ আপনি কী করছেন বাবা? কথাটা না বলে পারল না মহেন্দ্র।

একটু আশ্চর্য হলেন গণেশ নারায়ণ। পুত্রের মুখের দিকে চাইলেন। বললেন, কেন মহেন্দ্র?

একটু ইতঃস্তত করল মহেন্দ্র। ভাবল কথাটা বলা তার উচিত হয়নি। হয়তো মনে দুঃখ পাবেন পিতা। তবু যেন না বলে পারল না সে। বলল, এসময় দাদাকে রাজধানী ত্যাগের অনুমতি না দিলেই পারতেন।

কেন?

দাদা এসময় কাছে থাকলে···

বাধা দিলেন তিনি। বললেন, আমিও সেকথা চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু অনেক চিন্তার পর তাকে ভাতুড়িয়া পাঠানোই যুক্তিসঙ্গত মনে করলাম।

কনিষ্ঠ পুত্রের কাছে জেষ্ঠ্য পুত্রকে ভাতুড়িয়া পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য গোপন করলেন তিনি। মহেন্দ্রও যেন বুঝতে পারল পিতার মনোভাব। তার মনে হল ব্রজ যা বলেছে তা সত্য নয়। পিতার তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব হয়নি যদুর পক্ষে। নিশ্চয়ই তিনি জেনেছেন। জেনেই এ সাবধানতাটুকু অবলম্বন করেছেন। কিন্তু যতটুকু তিনি জানেন সেটুকু জিজ্ঞাসা করতে পারল না সে। পিতা কী জানেন দরবেশ নূরকুৎব্ আলমের সঙ্গে যদুর যোগাযোগের

কথা। মহেন্দ্রর দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি জানেন না। যদি জানতেন, তাহলে নিশ্চয়ই এ সময় তাকে রাজধানী ত্যাগের অনুমতি তিনি দিতেন না। আর তার অনুমান যদি মিথ্যা না হয়, তাহলে যদু নিশ্চয় ভাতুড়িয়া ফিরে যাবে না। নিশ্চয়ই সে···

না, না! কথাটা চিন্তা করতে পারল না মহেন্দ্র। কষ্ট হল তার।

গণেশ নারায়ণও অনেকক্ষণ মহেন্দ্রর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তটা শুনে ও যেন চমকে উঠেছিল। বাধা দিয়েছিল। প্রশ্নের উত্তরে যে যুক্তি দেখিয়েছিল তা সত্য নয় বলেই মনে হল তাঁর। বললেন, আমি তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম মহেন্দ্র। তোমাকে এখানে আনবার জন্য পত্র দিয়েছিলাম।

পথে পত্র বাহকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। বলল মহেন্দ্র। আমি আপনার পত্র পেয়েছি। কিন্তু এখানে পৌঁছবার পূর্বে প্রকৃত কারণ জানতে পারিনি।

সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর বাংলা আক্রমণের সংবাদ এত আগে আমার পক্ষেও জানা সম্ভব হত না, যদি না আমি ত্রিহুতরাজ বন্ধু শিবসিংহের পত্র না পেতাম। সুলতানের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছেন তিনি। তবে তিনি লিখেছেন, হয়তো এই পলায়ন তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। দিন রাত্রি সুলতানের সৈন্যদল তাঁর পিছনে ছুটছে। শিবসিংহের বৃদ্ধ পিতা দেবসিংহ যোগ দিয়েছেন সুলতানের সঙ্গে। একদিন তাঁকে সিংহাসন থেকে অপসারিত করার প্রতিশোধ হয়তো আজ পুত্রের ওপর নিতে চাইছেন তিনি। দেশের মানুষের কথা একবারও ভাবছেন না। পূর্বাহ্নে সাবধান করে দিয়েছেন তিনি। সুলতান ইব্রাহিম শর্কী তাঁর বাংলা অভিযান আবার শুরু করেছেন।

একটু নীরবে রইলেন গণেশ নারায়ণ। রাতের অন্ধকার

আকাশটার দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন। ম্লান কণ্ঠটা শোনা গেল তাঁর। বললেন, আমি কী করবো?

যুদ্ধ।

কিন্তু…

কী?

সুলতান বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে ছুটে আসছেন। শিবসিংহ জানিয়েছেন, ইব্রাহিম শর্কীর সৈন্যসংখ্যা আনুমানিক পঞ্চাশ সহস্র। মুষ্টিমেয় কয়েক সহস্র সৈন্য ভরসা করে আমরা কী করব? আমাদের কিছু করার সাধ্য হবে না মহেন্দ্র।

কিন্তু মেরে তো মরবো। মৃদুকণ্ঠে বলল মহেন্দ্র।

মিথ্যা মরে লাভ কী?

স্বাধীনতার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

কিন্তু আমরা তো পরাধীনই ছিলাম।

ছিলাম, কিন্তু আজ আমরা স্বাধীন। এই স্বাধীনতাটুকু বুকের রক্ত ঢেলেই অর্জন হয়েছে বাবা। শিহাবুদ্দীনের সৈন্যদের আক্রমণের পূর্বে সে রাত্রে আমার অনুগামী সৈন্যরা প্রতীজ্ঞা করেছিল, মৃত্যু শ্রেয়, তবু ফিরে আসবো না। সত্যই অনেকে ফিরে আসেনি সেদিন। আমিও আসতাম না।

মহেন্দ্র!

এই সত্য বাবা।

হাসলো গণেশ নারায়ণ। মহেন্দ্রর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন তিনি। বললেন, যোগ্য উত্তর তুমি দিয়েছো। এই উত্তরই আমি আশা করেছিলাম তোমার কাছে। একটু নীরব থেকে বললেন, যদুকে বিনা কারণে আমি ভাতুড়িয়ায় পাঠাইনি। কিন্তু কী সে কারণ জানতে চেও না।

মহেন্দ্র চুপ করে রইলো।

জুবেদা!

একি, আপনি! জুবেদার কণ্ঠে বিস্ময়। বলল, আপনি ভাতুড়িয়া যাননি?

ভাতুড়িয়া আমি কোনদিনই যাব না জুবেদা। হাসল যত্থ। ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

আপনার সঙ্গী সৈন্যরা?

তারা আমার নির্দেশমত এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ যেন খেয়াল হল যত্থর। এতো সংবাদ জুবেদা জানলো কেমন করে? প্রশ্ন করলো, কিন্তু জুবেদা, তুমি এতো সংবাদ জানলে কেমন করে?

যত্থর প্রশ্নটা শুনে হাসল জুবেদা। তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে বলল, অনেক সংবাদই আমাকে জানতে হয় কুমার।

তুমি সব সংবাদই রাখ?

আগে রাখতাম না। জুবেদা বলল। আগে কোন সংবাদই রাখতাম না। অবশ্য কোন সংবাদ রাখার প্রয়োজন বোধ করিনি বলে নয়, তখন নিজের কথাটা বড় বেশী ভাবতাম। কষ্ট হ'ত। কী চেয়েছিলাম, আর কী পেলাম তার হিসাব মেলাতাম। মিলতো না। আমার দুর্ভাগ্যটা আমাকে একমুহূর্তের জন্যে শান্তি দিত না। আমি কাঁদতাম। দিন রাত্রি কান্নায় বুক ভাসতো আমার। খোদাকে ডাকতাম, তাঁর দোয়া চাইতাম। আমি সব সময় নিজের কথা বড় বেশী ভাবতাম। লেকিন, একদিন আমার মনে হল, মিথ্যে নিজের কথা ভেবে লাভ কী? কোন লাভ নেই। এ জিন্দেগীটা খতম না হওয়া পর্যন্ত এমনিভাবেই কাটবে আমার, সেদিন থেকেই আস্তে আস্তে নিজের কথাটা চিন্তা করা ছেড়ে দিলাম আমি। দিন রাত্রি বসে থাকি চুপচাপ। কোন কাজ নেই। এক ঘেয়েমী জীবন। কিছু করতে হবে। কিছু না করলে দিন কাটবে কেমন করে? ঠিক এমনি সময় সুলতান

সেফুদ্দীন মারা গেলেন। মসনদে বসলেন নতুন সুলতান শিয়াবুদ্দীন বায়জিদ শাহ। তারপর রাজা গণেশ নারায়ণ। বড় মজার সুলতানীর খেলা। বড় ভাল লাগতো, যখন আমার পেয়ারের বান্দাটা এসে খবর দিত। ওকে জিজ্ঞাসা করি। ওই এসে বলে সব। লেকিন···। হঠাৎ চুপ করে গেল জুবেদা।

যদু বলল, কী হল?

আপনি ফিরে এলেন কেন কুমার?

কেন? একটু যেন অন্যমনস্ক দেখাল যদুকে। জুবেদার মুখের দিকে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। মৃদুকণ্ঠে যেন কতকটা আত্মগত স্বরে বলল, না জুবেদা, আমি পারবো না।

কী পারবেন না?

তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমি পারবো না।

কেন?

কেন? আবার ওকে দেখল সে। প্রশ্ন করলো, তুমি কী জান না? তুমি কী বুঝতে পার না, জুবেদা?

জুবেদা নীরব। সে জানে, এবার কী বলবে কুমার। সে শুনেছে। অনেকবার কথাটা শুনতে হয়েছে তাকে। শুনতে শুনতে কেমন যেন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। বুঝতে পারে কখন বলবে সে কথা। ভালবাসার কথা শুনিয়েছিল সৈফুদ্দীন, শোনাচ্ছে যদু। যেন যে কোন প্রকারেই হোক, বিশ্বাস করাতে চায়। মিথ্যা, মিথ্যা, কথাটা যে কত মিথ্যা, সে তা জানে। জানে ভালবাসার সত্য রূপটা। তাকে ভালবাসার কথা শুনতে হয় তাঁর দেহটার জন্যে। তার যৌবনের স্তুতির ওরা সব স্তবক হতে চায়। অথচ না হলেও কোন ক্ষতি ছিল না। কারণ তার দেহটার একদিন অধিকারী ছিল শাহজাদা সৈফুদ্দীন, আজ রাজা গণেশ নারায়ণের পুত্র যদু। সেতো কোন ইচ্ছায় বাধা দেয়নি কোনদিন। বাধা দেওয়ার অধিকারও তার নেই। নারী ভোগের সামগ্রী, পুরুষ তার ইচ্ছা

মত ভোগ করবে। তবে কেন এই মিথ্যাচার ভালবাসার কাঙাল-পনা?

জুবেদা বুঝতে পারে নি। আজও বুঝতে পারে না। শুধু এইটুকু বোঝে, শাহজাদা সৈফুদ্দীন আর কুমার যত্নতে এতটুকু তফাৎ নেই। একজন হিন্দু অন্যজন মুসলমান, কিন্তু উভয়ের মনের গঠন যেন একই। কিন্তু এ সবের স্বার্থকতা কী? কেন ওরা এমন করে?

আমি তোমাকে দেখবার জন্যে ছুটে এসেছি জুবেদা।

যত্নর কথায় জুবেদা তার মুখের দিকে চাইল। একটু যেন বিস্মিত হল। বলল, স্রেফ আমাকে দেখবার জন্যে ছুটে এসেছেন আপনি?

হ্যাঁ জুবেদা, শুধু তোমাকে দেখবো বলে।

কিন্তু কুমার?

কী জুবেদা?

জুবেদা একটু ইতঃস্তত করলো। চিন্তা করলো কথাটা তার বলা উচিত হবে কি না। অনধিকার চর্চা। তবু সে না বলে পারল না। বলল, যদি গোস্তাগী না নেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি কুমার। আজ দুষমন ছুটে আসছে বাংলার দিকে, এ সময় সব ভুলে আপনি আমার কথা ভাবলেন কী করে?

তোমার কথা ভাবলাম কী করে? যত্ন যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্নটা করলো। মুহূর্তের জন্যে তাকে যেন দ্বিধাগ্রস্থ দেখাল। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, দুষমন আসুক না আসুক, আমার কিছু যায় আসে না জুবেদা।

কুমার।

মহারাজা আমার সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করেন না। যত্ন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হঠাৎ। বলল, তিনি কেন যে এই ব্যবহার আমার সঙ্গে করলেন, আমি জানি না। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে

পারলুম, তিনি আমাকে রাজধানীতে থাকতে দিতে চান না। সেই জন্যই কৌশলে ভাতুড়িয়া পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

সেখানেও তো···

ওকে বাধা দিল যদু। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, না জুবেদা না, এটা সত্য নয়। আমার পিতা হলেও গণেশ নারায়ণকে আমি চিনি। দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে আপন পুত্রের বুকেও তিনি ছুরি চালাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করবেন না। সেই মানুষ আপন পরিবারকে রক্ষার জন্যে সহস্র সৈন্য সঙ্গে দিয়ে আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেন কেন ?

আপন পরিবারকে রক্ষা করাও তো তাঁর কর্তব্য।

কর্তব্য ! যদু জুবেদার মুখের দিকে চাইল। বলল, না জুবেদা, কর্তব্য যে নয় তা আমি বলছি না। কিন্তু আপন স্বার্থের জন্য তিনি কিছু করেন না। সকলের কথা ভুলে নিজের কথা চিন্তা করতে তিনি পারেন না। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজ অবধি তাঁকে শুধু মাত্র আপন স্বার্থের জন্যে কিছু করতে দেখিনি। আজই তার ব্যতিক্রম ঘটলো।

জুবেদা কথা বলল না।

উঠে দাঁড়াল যদু। সে যেন কিছুটা অস্থির। কক্ষের মধ্যে অনেকক্ষণ আপন মনে ঘুরে বেড়াল সে। একসময় কণ্ঠটা শোনা গেল তার। আপন মনেই বলল, আমি তাঁর কাছে অপরাধী।

অপরাধী ?

হ্যাঁ জুবেদা, নিশ্চয়ই অপরাধী। হিন্দু আমি, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান। তুমি মুসলমানী। তিনি যদি জানতে পারতেন···

কী ? জুবেদার কণ্ঠে আর্তনাদ।

যদু সহজ এবার। বলল, আমি নিশ্চয়ই তাঁর চোখে অপরাধী প্রতিপন্ন হতাম। আমার বিচার করতেন তিনি। শাস্তি দিতেন। আর সে শাস্তিটা কী জান, প্রাণদণ্ড।

না, না!

হ্যাঁ জুবেদা তাই। অন্যায়কারীকে আজ পর্যন্ত তিনি কখনো ক্ষমা করেন নি। আমাকেও করতেন না। কিন্তু আমি কোন অন্যায় করি নি।

কুমার।

জানো জুবেদা, হয় তো কিছু আশঙ্কা করেছেন তিনি। আমার প্রতি সন্দেহ জেগেছে তাঁর মনে। ভেবেছেন আমি বোধহয় ভুলের পিছনে ছুটতে চাইছি। আর সেইজন্যেই আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমার ভুলের সংশোধন চান। কিন্তু আমি তো কোন ভুল করিনি জুবেদা। কোন অন্যায় করিনি। আমি তোমাকে আমার একান্ত আপন করে পেতে চাই। কিন্তু···

জুবেদা নীরব। যত্নু চিন্তা করছে। তার অস্থিরতা বাড়ছে। সে যেন হঠাৎ প্রতীজ্ঞা করলো। বলল, আমি প্রতীজ্ঞা করলাম জুবেদা, যে কোন মূল্যে আমি তোমাকে আমার নিজের করে নেব।

কী করে? জানতে চাইল জুবেদা।

যেমন করে পারি।

যদি মহারাজা বাধা দেন?

আমি মানবো না সে বাধা। আমি তাকে বুঝিয়ে দেব, তিনি যা অন্যায় বলে মনে করেন, আমি তা করি না। ধর্ম নয় মানুষ, ভালবাসার মৃত্যু ঘটতে আমি দেব না।

পারবেন?

আমাকে পারতেই হবে জুবেদা। তোমাকে হারিয়ে যেতে আমি দেব না। তোমাকে আমি চাই জুবেদা। যেমন করেই হ'ক, তোমাকে আমি আমার করে নেব।

ছুটে কাছে এল যত্নু। ওকে কাছে টেনে নিল। জড়িয়ে ধরলো বুকে।

নূরকুৎব্ আলম আপন মনেই কবার মাথাটাকে এধার ওধার করলেন। যত্নর চিন্তাচ্ছন্ন মুখখানা দেখলেন। বললেন, সত্যি এ অন্যায়!

দরবেশের মুখের দিকে চোখ তুলে একবার তাকিয়েই মুখটা ঘুরিয়ে নিল যত্ন। কথা বলল না। কথা বলতে ভাল লাগছিল না তার। নিজেকে শুধু ক্লান্ত নয়, অসহায় বোধ করছিল। ক্ষোভ জমছিল বুকে। অন্ধ আক্রোশে যেন ফেটে পড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল তার।

নূরকুৎব্ আলম জানতে চাইলেন, কী করবেন আপনি?

কী করবো? যত্ন বুঝতে পারল না নূরকুৎব আলমের প্রশ্নটা।

ভাতুড়িয়া যাবেন?

না।

তবে?

যত্নও সে কথা ভাবছিল। কী করবে? ভাতুড়িয়া সে যাবে না। অথচ···। তার দুঃখ হচ্ছিল। এখন কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল তার। এই মুহূর্তে সে নিজের ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, না, সে কিছু ভাবতে পারছিল না। তার সমস্ত চিন্তাশক্তি অবশ শিথিল হয়ে যাচ্ছিল। একটা দুরন্ত লোভের ছায়া গ্রাস করছিল তাকে। তার সমস্ত সত্তা, মানুষের মনের শুভ বুদ্ধিটুকু নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। আজন্মের সংস্কার শেষবারের মত তাকে বাধা দিতে চেয়েছিল। সে বাধাটুকু সে মানে নি, হয়তো তা নয়। সে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। সে দরবেশ নূরকুৎব্ আলমের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। তা কেন? উনি তো তার মঙ্গল চান। উনি তার উপকার করবেন বলে কথা দিয়েছেন। রাজা গণেশের সিংহাসন তার হবে। রাজা হবে সে। সরাবের পাত্রটা তুলে নিয়েছে সে মুখে।

পিতা তাকে আর বিশ্বাস করেন না। দোষ তাঁর নয়, তারই।

নিশ্চয়ই তিনি সব দেখেছেন। সেইজন্যেই তিনি সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ভাতুড়িয়ায়। সে যায়নি। সন্ধ্যা ঘনাবার অনেক আগেই সৈন্যদের সেদিনের যাত্রা স্থগিত রাখতে বলেছিল। ছুটে গিয়েছিল পাণ্ডুয়া। গোপনে প্রবেশ করেছিল হারেমে। জুবেদাকে দেখেছিল। ওর নির্বিকার ভাবটা তাকে আঘাত হেনে ছিল। তবু ওকে ছাড়তে ইচ্ছা করেনি। জুবেদা তাকে পাগল করেছে।

অনেক চিন্তা করেছে সে। বহুবার মনে হয়েছে এ পাপ, অন্যায়। দূরে সরে আসতে চেষ্টা করেছে। ব্যর্থ হয়েছে। না, না, পাপ নয়। কোন অন্যায় সে করছে না। ভালবাসায় পাপ নেই।

চিণ্ময়ী!

চিণ্ময়ীর কথা ভেবেছে বৈকী। ক্ষণিকের চিন্তা। চিণ্ময়ী মুছে গেছে। জ্বালা ধরেছে বুকে। শান্তি দিয়েছে জুবেদা। জুবেদাকে ভালবাসে সে। ওর জন্যে সে সব পারে। সব কিছু।

গভীর রাত্রে জুবেদার কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে এসেছিল। আপন শিবিরে প্রবেশ করেই চমকে উঠেছিল। দেখতে পেয়েছিল, দরবেশ নূরকুৎব্ আলমকে। বসে বসে ঢুলছেন তিনি।

তন্দ্রার ঘোরটা কেটে গিয়েছিল তাঁর। তার দিকে চোখ মেলে চেয়েছিলেন। হাসি মুখে মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি কুমার!

আমার জন্যে? অবাক হয়েছিল সে। বলেছিল, কেন?

আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন নূরকুৎব্ আলম। কাছে এসে বলেছিলেন, আপনার জন্যেই আমি এতদূর ছুটে এসেছি। এসেছি অনেক কষ্টে। আমাকে ধরার জন্যে চারিদিকে চর লাগিয়েছেন মহারাজা। যদি ধরতে পারেন কোতল করবেন। তবু এসেছি।

কেন? আবার সেই প্রশ্নটাই করেছিল সে। নূরকুৎব্ আলমকে ধরতে পারলে প্রাণদণ্ড ছাড়া অন্য কোন শাস্তি যে পিতা

দেবেন না তা সে জানে। এও জানে, এই তাঁর উপযুক্ত শাস্তি। লুকিয়ে ছিলেন। অনেক খুঁজেও তাঁকে ধরা যায়নি। পাণ্ডুয়া থেকে নূরকুৎব্ আলম যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেন এসেছেন, সেইটুকুই সে বুঝতে পারে নি।

নূরকুৎব্ আলম বলেছিলেন, আপান বসুন, সব বলছি আপনাকে। সব কথা বলবো বলেই তো প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ছুটে আসা। আপনি নিশ্চয়ই হারেমে গিয়েছিলেন ?

হারেমে গিয়েছিলেন ? যদুর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সে বুঝতে পারেনি একথা জানলেন কেমন করে উনি। সে তো গোপনেই···

হেসেছিলেন নূরকুৎব্ আলম। বলেছিলেন, সব আমি জানি কুমার। আর সব জানি বলেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনি জুবেদাকে পেয়ার করেন ? তাকে চান ?

যদু নীরব। তার মুখে একটিও কথা যোগায় নি। নূরকুৎব্ আলমের মুখের দিকে সে শুধু তাকিয়েছিল।

নূরকুৎব্ আলম বলেছিলেন, তাকে আপনি পাবেন না কুমার।

কেন ?

মহারাজা তাকে হত্যা করবেন।

হত্যা করবেন ?

এতদিন কাজটুকু হয়তো শেষ করতেন। পারেননি শুধু···

যদু আর শুনতে চায়নি। গর্জে উঠেছিল তার কণ্ঠ। অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছিল শিবিরের মধ্যে।

নূরকুৎব্ আলম যেন অপেক্ষায় ছিলেন। বলেছিলেন, আপনি ইব্রাহিম শর্কীর সঙ্গে যোগ দিন।

কেন ? আবার সেই প্রশ্ন।

হেসেছিলেন দরবেশ। বলেছিলেন, আমি আপনাকে বাংলার মসনদে বসাবো।

বাংলার মসনদে ?

হ্যাঁ। সুলতান আসছেন রাজা গণেশকে দমন করতে। আপনার সঙ্গে তাঁর কোন বিরোধ নেই। আমার অনুরোধ তিনি রাখবেন।

মনের শ্লেষটুকু দৃঢ় হতে দেরী হয়নি। সরাবের পাত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। আকণ্ঠ পান করে ভুলতে চেয়েছিল যন্ত্রণা। একটা মানুষের শুভ বুদ্ধি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

নূরকুৎব্ আলম বললেন, আপনি ভাতুড়িয়া যাবেন না। কী করবেন তাহলে ?

কী করবো ? যদু ও যেন হাসতে চাইল।

আমার কথা শুনবেন ? আমি যা বলবো, যে ভাবে আমি চালাবো, চলবেন ? যদি চলেন, বাংলার মসনদ পাবেন। •জুবেদাকে পাবেন। আর···

নেশাচ্ছন্ন চোখে দরবেশ নূরকুৎব্ আলমের মুখের দিকে চাইল যদু। বলতে গেল, সব শুনবে সে। প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। সব চাই তার—সব কিছু—জুবেদাকেও।

কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। মনে হল, কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেছে। কথা বলতে ভুলে গেছে সে।

এগারো

আকাশে সূর্য উঠেছিল। পাখিরা গেয়েছিল প্রভাতী সংগীত। মানুষ মেতে উঠেছিল হাসি-খুশি, আনন্দ-উৎসবে। বহুদিন পরে হিন্দু ফিরে পেয়েছিল তার আপন অধিকার। মন্দিরে বেজে উঠেছিল কাঁসর ঘণ্টা। সন্ধ্যা-প্রদীপ হাতে পল্লীবধূ নির্ভয়ে সন্ধ্যা দিয়েছিল তুলসীমঞ্চে। এতটুকু বুক কাঁপেনি তার। একবারও মনে হয়নি তার এই হয়তো শেষ সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালানো। দুঃখে বেদনায় জল আসেনি তার দুচোখে। সে হেসেছে। হাসি মুখে ভক্তি ভরে বেদীতলে নত করেছে মাথা। কামনা করেছে সংসারের মঙ্গল। সেই সঙ্গে অন্তরের নীরব শ্রদ্ধা জানিয়েছে আর একজনের প্রতি। মানুষ নন, দেবতা—তাঁর উদ্দেশ্যে জানিয়েছে শ্রদ্ধা।

কিন্তু আবার বুক কাঁপলো। আতঙ্কে স্তব্ধ হল হৃদয় স্পন্দন। আর্তনাদ ধ্বনতি হল কণ্ঠে। এ তুমি কী করলে প্রভু! এ তোমার কী পরীক্ষা? হে বিপদহারি মধুসূদন। হিন্দুর জীবন নিয়ে কেন তোমার এ ছিনিমিনি খেলা? শরণাগতের রক্ষায় কেন তুমি আজ উদাসীন?

কেন? কেন? মানুষের আর্তকণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হল, কেন, কেন?

উত্তর পেল না তারা। নিষ্ফল হল তাদের প্রাণের আকুতি। দুষ্ট রাহুর মত একদিন তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে ছুটে এলেন সুলতান ইব্রাহিম শর্কী। ধ্বংস হল কত শত গ্রাম নগর জনপদ। মৃত্যুর আর্তনাদে পূর্ণ হল বাতাস। অসহায় নারীর ক্রন্দনে ধ্বনিত হল অভিশাপ।

বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা। পাণ্ডুয়ার আকাশ বাতাস প্রান্তর রক্ত আর আর্তনাদে ভরে গেল। কামানের গোলার আঘাতে গণেশ নারায়ণের সৈন্যদল বারবার ছিন্নভিন্ন হল। ওরা শুধু মরছে আর মরছে। মৃতের পাহাড় জমছে শুধু। সেই সঙ্গে সংবাদ আসছে নিত্য নতুন। সুলতানের সৈন্যদল শুধু যুদ্ধ করছে না, রাতের অন্ধকারে গ্রামবাসীদের ঘরে ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হত্যা লুণ্ঠন আর নারীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তারা। সুলতানের আদেশ। সে আদেশ তারা পালন করছে পৈশাচিক উল্লাসে।

গর্জে উঠল মহেন্দ্র। গণেশ নারায়ণ তার দিকে চাইলেন। কেমন যেন অসহায় দেখাল তাঁকে। গলাটা কেঁপে উঠল তাঁর। ম্লান কণ্ঠে বললেন, আমি পারলাম না।

পিতার মুখের দিকে তাকাল মহেন্দ্র। কী যেন বলতে গেল সে। পারল না।

সেই রাত্রেই দূত এল গণেশ নারায়ণের কাছে। নিয়ে এল দরবেশ নূরকুৎব্ আলমের পত্র। মহারাজাকে পরাজয় স্বীকারের উপদেশ দিয়েছেন দরবেশ। তা যদি তিনি না করেন, বাংলার একটি মানুষকেও রক্ষা করা সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে।

পরাজয়? না, কখনো নয়। আবার গর্জে উঠল তাঁর কণ্ঠ। হৃতশক্তি ফিরে পেলেন যেন তিনি। দূতকে বলেছিলেন, তাঁকে গিয়ে বোল, দাসত্বের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

তখনও তিনি জানতেন না, পরদিন কী বিস্ময় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। বিস্ময় নয় আঘাত। আঘাত পেলেন তিনি। দেখলেন, সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর সৈন্যবাহিনীর মাঝে যদুর পতাকা শোভা পাচ্ছে। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যদু। স্বদেশের স্বাধীনতা, অসংখ্য মানুষের কথা ভুলে গিয়ে আপন স্বার্থকে সে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বেইমানী করে যোগ দিয়েছে সুলতানের সঙ্গে।

মরমে মরে গেলেন তিনি। লজ্জায় নত হল মাথা। ভাবলেন,

আর নয়, ঘরের শত্রু যেখানে মুসলমানের পক্ষালম্বন করেছে, সেখানে জয়ের আশা মিথ্যা। সাধ্য কী সফলতা লাভ করে।

তবু যুদ্ধ বন্ধ হল না। যুদ্ধ চললো সারা দিনই। কিন্তু সৈন্যদের আক্রমণ করতে নিষেধ করলেন তিনি। সরে দাঁড়ালেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। একদিন কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন। ইব্রাহিম শর্কী গণেশ নারায়ণ আর মহেন্দ্রর অনেক খোঁজ করলেন, কিন্তু কোন সন্ধানই আর পাওয়া গেল না তাঁদের।

সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হল আকাশ বাতাস। যদু নারায়ণ নতজানু হয়ে সেলাম জানাল বিজয়ী সুলতানকে।

ভাতুড়িয়ায় যখন সে সংবাদ পৌঁছাল, কান্নার রোল উঠেছে প্রাসাদে। চিন্ময়ী মৃণ্ময়ী দুজনেই কাঁদল। নির্বিকার শুধু সত্যবতী একা। হাসি মুখে মেনে নিল দুঃসংবাদ। পুত্রবধূদের বলল, কাঁদিস নি মা, তোরা চুপ কর। কিন্তু কাকে চুপ করাবে সত্যবতী। সাধ্য কী তার একার পক্ষে সকলকে চুপ করানো! শুধু পুত্রবধূরা নয়, আত্মীয় পরিজন, দাসদাসী সকলেই কাঁদছে। বুকখানা ফেটে যাচ্ছিল সত্যবতীর নিজেরও। বারবার অব্যক্ত একটা কান্নার কুণ্ডলী বুকের মধ্যে গুমরে উঠছিল। কিন্তু কাঁদলে তো চলবে না। অসীম ধৈর্য্যে অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করলো সত্যবতী। বুঝতে পারল সামনে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সে বিপদের মুখোমুখী হতে হবে।

ব্রজকে জিজ্ঞাসা করল, এ সংবাদ সত্য ব্রজ?

মাথা নীচু করে বলল ব্রজ, হ্যাঁ মা, সত্যই ছোট মশায় সুলতানের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

বুকখানা ভেঙে গেল সত্যবতীর। মাতৃহৃদয়টা দুরন্ত লজ্জায় মুখ থুবড়ে পড়লো যেন। পুত্র তার—যে পুত্রকে দশমাস দশদিন

গর্ভে লালন করেছে। কত স্বপ্ন দেখেছে। শিশু ছিল তার নয়নের মনি। কিন্তু কেন? কেন এমন করলো যদু! কিসের আশায় সে মিথ্যার পিছনে ছুটে গেল? এত বড় ভুল করলো! ভাবতে পারল না। নিজের প্রতি ঘৃণা জাগছিল তার। যদুর জননী, এ পরিচয় অসহ্য বোধ করছিল।

স্বামীর কথা মনে পড়লো সত্যবতীর। নির্লোভ এক পুরুষ ভাতুড়িয়ার সামান্য এক ভূ-স্বামী ছিলেন। অথচ কী না করতে পারতেন তিনি। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ছিলেন সহায়। ইচ্ছা করলে অনেক ভূ-স্বামীকে তিনি পথের ভিখারী করতে পারতেন। বিনা বাধায় গ্রাস করতে পারতেন তাদের ভূ-সম্পত্তি। কিন্তু তা তিনি করেননি। লোভকে জয় করেছিলেন। খুশি ছিলেন আপন অধিকারে। বলতেন, সত্যবতী আমরা আপন অধিকারে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। জীবন স্বপ্ন দেখে। কামনা জাগায় মন। লোভের ছায়া গ্রাস করে আমাদের সমস্ত সত্ত্বা। আমরা পাগল হয়ে উঠি। আমরা আমাদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করি। কিন্তু শান্তি পাই কী? পাই না। অশান্তি আর আত্মদাহে দিবারাত্র ক্ষতবিক্ষত হই। অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করি। কামনা করি আত্মসুখ। কিন্তু জান, যে জীবন অশান্তিময় সেখানে সুখ মূল্যহীন। আমি সুখের চেয়েও শান্তি কামনা করি। আমি মানুষকে ভালবাসি সত্যবতী। সকলের মঙ্গল কামনা করি।

আরো কত কথা মনে পড়লো সত্যবতীর। কত শত টুকরো স্মৃতি। মানুষের মঙ্গলের জন্যই একদিন জীবনকে উৎসর্গ করলেন তিনি। শপথ নিলেন মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনার। ত্যাগ করলেন সুলতানের আমির পদ। বললেন, আপন স্বার্থ ত্যাগ না করলে বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে কিছু করা সম্ভব নয়। আমি এতদিন ভুল করেছিলাম। আমি বুঝতে পারিনি, ভিক্ষায় অধিকার

অর্জন করা সম্ভব নয়। হিন্দুর প্রতি মুসলমানের এই অত্যাচার বিচারপ্রার্থী রূপে বন্ধ করা যাবে না। সত্যবতী, ভিখারীকে ভিক্ষা দেয় মানুষ দয়া করে! আমরা তো ভিখারী নই। এ দেশ আমাদের। এ দেশের মাটির অধিকারী আমরা। বিদেশী শাসকের কৃপা-প্রার্থীরূপে কেন তাঁর দয়া ভিক্ষা করবো? মাথা নত করে সহ্য করবো অন্যায় অত্যাচার?

গর্জে উঠলেন তিনি। ডাক দিলেন নিপীড়িত নির্যাতীত মানুষগুলোকে। বাংলার ঘুমন্ত যুবশক্তিকে জাগিয়ে তুললেন। বললেন, আর কান্না নয়। জয় করো ভয়। হাতে তুলে নাও অস্ত্র। মরেছো, মরবে, কিন্তু মরার আগে মেরে মরো।

ব্যর্থ হল না সে আহ্বান। দলে দলে মানুষ এল। হাতে তুলে নিল অস্ত্র। শপথ নিল নতুন জীবনের। মৃত্যু নয় জীবন। জীবন দেবে কিন্তু বিনা রক্তপাতে নয়। অত্যাচারীর বুকের রক্তে পূর্ণ করবে তাদের প্রতীজ্ঞা।

তারপর!

এলো সেদিন। তুশো বছরের অনেক অন্যায় অত্যাচার আর পাপের ঘটলো পরিসমাপ্তি। শেষ হল বাংলার বুক থেকে তুঃস্বপ্নের কাল। শত সহস্র হিন্দুর কণ্ঠ গর্জে উঠল বজ্র নির্ঘোষে। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর শব্দে পূর্ণ হল বাংলার আকাশ বাতাস। তুরন্ত উল্লাসে পাগল হল মানুষ। সেই উল্লাস শেষে হিংস্রতায় রূপ নিচ্ছিল। শুরু হচ্ছিল হানাহানি! কিন্তু কঠিন হলেন তিনি। কঠিন কণ্ঠে জানালেন তাঁর আদেশ। ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন স্বাধীনতালোভী মানুষগুলোকে। বললেন, ভুল করছো তোমরা। ওরা মুসলমান সত্য, ওরা বিধর্মী, কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন ওরাও তোমার ভাই বন্ধু আত্মীয়। মানুষ তো মানুষের শত্রু নয় বন্ধু। ওরা তোমাদের উপর অত্যাচার করেছে, তোমাদের ঘর জ্বালিয়েছে, তোমাদের বুকে ছুরি চালিয়েছে, ঘরের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি

খেলেছে ? সত্য, সব সত্য। তোমরা যা বলছো তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। তোমাদের সব অভিযোগ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু তার আগে, ওদের বুকে ছুরি চালাবার আগে, একবার চিন্তা করো, যাদের বুকের রক্তে তোমার মাটির বুক সিক্ত করতে যাচ্ছ, তারা কী কোনদিন তোমাদের ভাই বন্ধু আত্মীয় ছিল না। একবার চিন্তা করে দেখ, তোমাদের মা ভগ্নীর অসম্মানে যে বেদনা তোমরা একদিন পেয়েছিলে, সে বেদনা কী ওরা পাবে না ? একবার স্মরণ করে দেখ, তোমাদের ধর্ম কী মানুষের ওপর অত্যাচার করতে বলেছে। বলেনি ওদের ধর্মও। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মোল্লা দরবেশ আর ক্ষমতাসীন সুলতান ধর্মের নামে অধর্ম প্রচার করেছে। তারাই ওদের বুঝিয়েছে হিন্দুর ধর্ম, তার ঘরের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেললে খোদা খুশি হবেন। বেহেস্তের পথ আনন্দে ভরে উঠবে। ভুল বুঝেছে। ওরা নির্দোষী। ওরাও বাঁচতে চায়। সুখ শান্তি কামনা করে। তবে কেন তোমরা তা হতে দেবে না ?

তাঁর কঠিন আদেশ অমান্য করার সাহস কারো হয়নি। ধর্মীয় গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় দেননি তিনি। একমাত্র বুলি ইসলাম বিপন্ন বলে যে সব দরবেশের দল হানাহানি করতে চেয়েছিল, তাদের তিনি কঠোরভাবে দমন করেছিলেন। ফিরে এসেছিল শান্তি।

কিন্তু অশান্তির আগুন এত তাড়াতাড়ি জ্বলে উঠবে ভাবতে পারেনি সত্যবতী। সুলতান ইব্রাহিম শর্কী আজ অধিকার করেছেন বাংলা দেশ। হিন্দুর বিজয় পতাকাকে হয়তো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ভাগীরথীর জলে। আপন স্বার্থের জন্যে পুত্র হয়েছে মুসলমানের গোলাম। কিন্তু কেন ?

মৃদুকণ্ঠে ব্রজ ডাকলেন, মা!

আচ্ছা ব্রজ, যদু এমন কেন করল বলতে পারিস ? কী চেয়েছিল সে ? কদিন পরে সেই তো রাজা হত ?

জানি না মা। মিথ্যা কথা বলল ব্রজ।

সত্যিই জানিস না? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল সত্যবতী। বলল, জানিস ব্রজ। সব জানিস তুই। আমি জানি, তোর চোখকে কেউ কোনদিন ফাঁকি দিতে পারে না।

মা! ব্রজ যেন আর্তনাদ করে উঠল।

ম্লান একটু হাসির রেখা সত্যবতীর ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটেই আবার মিলিয়ে গেল। ধীর কণ্ঠে বলল, আমিও আশঙ্কা করেছিলাম ব্রজ। উনি আমাকে পত্রে আভাষ দিয়েছিলেন। আর যেদিন যদু ভাতুড়িয়ার পথে যাত্রা করেও এখানে এসে পৌঁছাল না, সে দিনই আমার মনের আশঙ্কাটা সত্য বলে মনে হয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলুম, নিশ্চয়ই কোন মায়াবিনীর ফাঁদে পা দিয়েছে সে। হয়তো···। হঠাৎ চুপ করে গেল সত্যবতী। একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাসা করল, উনি কোথায় গেছেন, তোকে কিছু বলে গেছেন ব্রজ?

না মা, তা কিছু বলে যাননি। আর বলেই বা যাবেন কী করে? স্থলতানের সৈন্যরা তাঁর সন্ধানে ফিরছে। তবে মন হয়, পূর্ব বাংলার দিকেই গেছেন তিনি।

আর মহেন?

মহেন দাদা যেতে চায়নি, তাকে তিনি একরকম জোর করে নিয়ে গেছেন। আমাকে বলে গেলেন আপনাদের দেখতে। অনেক কষ্টে ভাতুড়িয়া এসেছি আমি।

কেন?

স্থলতানের সৈন্যরা পথ ঘাট আগলে বসে আছে। হয়তো···। ব্রজ চুপ করে গেল।

সত্যবতী ডাকলো, ব্রজ!

ব্রজর কণ্ঠটা শোনা গেল। সে বলল, পারবো কী না জানি না মা। আমি চেষ্টা করবো। যদি না পারি, প্রাসাদটায় আগুন লাগিয়ে দেব।

আগুন লাগিয়ে দিবি?

হ্যাঁ মা, তাই দেব। তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। বলল, ব্রজ বাউরী ওদের এখানে ঢুকতে দেবে না।

পারবি তুই? হাত কাঁপবে না তোর আমাদের পুড়িয়ে মারতে? জানিস কত নারী শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা আছে এ প্রাসাদে। অসহায় মানুষ-গুলোকে পুড়িয়ে মারতে হাত উঠবে তোর?

মা! ব্রজ যেন আর্তনাদ করে উঠল।

হাসল সত্যবতী। বলল, মুখে বললেও কাজে তুই পারবি না ব্রজ। আমি যে তোকে চিনি।

ব্রজর মুখে কোন কথা নেই। অসহায় দৃষ্টিতে একবার সত্যবতীর মুখের দিকে চেয়েই মাথাটা নত করে নিল সে।

একটু পরে সত্যবতী ডাকল, ব্রজ!

মা!

আমি যে কিছু···

বাধা দিল ব্রজ। আচমকা প্রশ্ন করল, আপনি পারবেন?

কী? সত্যবতীর গলাটা কেঁপে উঠল।

আমি যা বলেছি?

তুই যা বললি? নিজের মনেই কথাটা ক'বার উচ্চারণ করলেন সত্যবতী। অনেকক্ষণ চিন্তা করলো নীরবে। একসময় বলল, যা অসম্ভব, পারবো না বলে মনে হচ্ছে, তাও আমাদের পারতে হবে। একটি বিধর্মীর ছায়াও যেন এ প্রাসাদে না পড়ে ব্রজ।

মা!

সৈন্য যা আছে তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সুলতানের সৈন্যরা যদি প্রাসাদ আক্রমণ করে, রক্ষা করা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু তুই তাদের গিয়ে বল, আমার আদেশ, শুধু সুলতানের সৈন্য নয়, যদুও যেন এ প্রাসাদে প্রবেশ করতে না পারে।

আমি সে কথা তাদের বলেছি মা।

কী বলে তারা?

জীবন থাকতে তারা এ প্রাসাদে কাউকে প্রবেশ করতে দেবে না। ছোট মশায়ের বিশ্বাসঘাতকতায় মহারাজা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছেন, সেই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ তারা নেবেই।

সত্যবতী কথা বললে না। যদু পুত্র নয়, বিশ্বাসঘাতক। কথাটা মনে হতে কষ্ট হল। তবু মিথ্যা নয়। যদু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে বেইমান!

বারো

আমি কী? আমি কে?

ছোট্ট দুটি প্রশ্ন। উত্তর সহজ। সে জানে, সে কী—কে? বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মহারাজা গণেশ নারায়ণের সঙ্গে। আমি কী? এ প্রশ্ন তার নিজস্ব হলেও উত্তর দিচ্ছে সকলে। সে বিশ্বাসঘাতক। সকলে তাকে বিশ্বাসঘাতক ভিন্ন আর কিছু ভাবছে না। সেও জানে, সত্যই সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করতো, তাহলে হয়তো ইব্রাহিম শর্কী জৌনপুর থেকে বাংলায় ছুটে আসতেন না। দরবেশ নূরকুৎব্ আলমের প্রাণ রক্ষাই তাকে বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করেছে। কিন্তু সত্যই সে এ সবের কিছু জানতো না। অন্ধ হয়েছিল মোহে। জুবেদা তাকে পাগল করেছিল। ওর জন্যেই দরবেশের প্রাণরক্ষা করেছিল সে। কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ দিয়েছিল। নূরকুৎব্ আলমের জন্যেই জুবেদাকে পেয়েছিল সে।

কিন্তু···

ভাবলো যদু। না, না, যদু নয়, জালালুদ্দীন। সুলতান জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ। যদু আজ জালালুদ্দীন হয়েছে। আমি কে? আমি জালালুদ্দীন। সুলতান ইব্রাহীম শর্কীর অশেষ করুণা। তিনি তাকে বাংলার মসনদটা দিয়ে গেছেন। উপকারের পুরস্কার। মিথ্যা হয়নি দরবেশ নূরকুৎব আলমের আশা দেওয়া। কিন্তু···

আবার সেই যন্ত্রণাবোধ। যদুর অন্তরাত্মা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতে চাইলো। সরাবের নেশাটা আজ আর তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না। দিন রাত্রি সব সময় সরাব খাচ্ছে। কিন্তু নেশা হচ্ছে না। দুঃস্বপ্ন, অভিশাপ। সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে।

নূরকুৎব্ আলম একদিন বলেছিলেন, এ আপনি কী করছেন জাহাঁপনা!

জাহাঁপনা! কথাটা শোনা মাত্র ভীষণ হাসি পেয়েছিল তার। অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়তে ইচ্ছা করেছিল। নতুন পরিচয় তার। বাংলার সুলতান সে। সে আজ কারো কাছে মালেক, কেউ বলে জাহাঁপনা। একদিন কুমার ছিল। বেশী দিন নয়। একটা মাসও পূর্ণ হয়নি এখনো। সকলেই তাকে কুমার বলে সম্বোধন করতো। রাজা গণেশের পুত্র সে।

এর নামই কী সৌভাগ্য? অযাচিতভাবে ধরা দিয়েছে তাকে। বাংলার সুলতান বানিয়েছে। কিন্তু···। না, না, এমন সৌভাগ্য সে কামনা করেনি। সুলতান হতে সে চায়নি। সে চেয়েছিল···। কী চেয়েছিল? কী চেয়েছিল সে? একটা নারীকে। রূপ যৌবনে ভরা একটা নারীদেহ। কিন্তু চেয়েছিল কী? এক নিষ্ঠাবান হিন্দু-ব্রাহ্মণ সন্তান সে? না, না, ব্রাহ্মণ নয়, চণ্ডাল। না, না, তাও নয়। চণ্ডালও তো মানুষ। একটা পশু কামনা করেছিল নারী দেহ। ক্ষুধার তাড়নায় অন্ধ হয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল সব কিছু। নারীর মোহিনী রূপ, তার যৌবন তাকে ভুলিয়েছিল। মনে হয়েছিল ভালবাসা। জুবেদাকে সে ভালবাসে। মিথ্যা, মিথ্যা। সে ভালবাসে, না শুধুমাত্র দেহের ক্ষুধা। জুবেদার নগ্ন দেহটা তাকে পশুত্বে পরিণত করেছিল। লোভে অন্ধ হয়ে ত্যাগ করলো আপন ধর্ম। সুলতান হবে সে। শুধু জুবেদা নয়, আরো অসংখ্য নারী। হারেমের সমস্ত নারী আসবে তার অধিকারে।

জুবেদা বলেছিল, আপনি ভুল করছেন কুমার। এই ভুলের পথ আপনি ত্যাগ করুন।

সেদিন জুবেদার কথাটা শুনে মনে আঘাত পেয়েছিল সে। ওর অসহ্য বোধ হয়েছিল। কিন্তু আজ বুঝতে পারে, ও সত্য কথাই বলেছিল। সত্যই ভুল করেছে সে।

জুবেদা আজ কোথায়? কতদূরে?

সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর হারেমে নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে এতদিনে। সুলতান নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে কামনা-মদির রাত্রি যাপনে মত্ত। আর জুবেদাও নিশ্চয়ই বিনা দ্বিধায় অসঙ্কোচে নিজেকে সমর্পন করেছে সুলতানের বাহুবন্ধনে।

অসহ্য, অসহ্য। এ সত্যি নয়, সত্যি হতে পারে না। জুবেদা নিশ্চয়ই···। কিন্তু তাই বা কেমন করে সম্ভব? জুবেদার সাধ্য কী বাধা দেয়। সে বাধ্য।

জুবেদা একদিন তার অতীতের কথা বলতে গিয়ে বলেছিল, স্বপ্ন আমিও দেখেছিলাম কুমার। ঘর চেয়েছিলাম। একখানা ছোট্ট নীড়। পেলাম না। আমরা যা চাই, কামনা করি, পাই না! যা চাইনি, তাই পেলাম।

ওর মুখখানা ম্লান দেখিয়েছিল। ছলছল করে উঠেছিল দু'খানি হরিণ-কালো আঁখি। উদ্গত অশ্রু দমন করে বলেছিল, কী চেয়েছিলাম আর কী চাই নি আজ আর চিন্তা করি না। নিজের কথা ভাবতে আমি ভুলে গেছি। কী হবে মিথ্যা ভেবে!

সেগুলো প্রথম আলাপের দিন। বেগম সাহেবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে ওকে দেখেছিল। আলাপ করেছিল একদিন। মনের দ্বার মুক্ত করে দিয়েছিল জুবেদা। শুনে ব্যথা জেগেছিল মনে। দুঃখ পেয়েছিল ওর কথা ভেবে। আর সুযোগসন্ধানী পশুটা একদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অতর্কিতে। মনে হয়েছিল বাধা পাবে। পায়নি। ধরা দিয়েছিল ও। আর একদিন কথায় কথায় বলেছিল, একটা কসবীর বাধা দেওয়ার সাধ্য কী? আপনার পিতা আমাদের রক্ষক। আপনি তাঁর পুত্র।

কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি জুবেদা। ককিয়ে উঠেছিল সে।

জুবেদার ওষ্ঠে হাসির রেখা দেখা দিয়েছিল। বলেছিল, আমাদের

সকলেই ভালবাসে কুমার। শাহজাদা সৈফুদ্দীন ভালবাসতেন, সাধ্য ছিল না সুলতান শিহাবুদ্দীনের। আপনিও ভালবাসেন।

আর তুমি?

আমি! জুবেদা চিন্তা করেছিল। তার মুখের দিকে চেয়েছিল। একসময় বলেছিল, আমিও ভেবেছি ক'বার, বুঝতে পারি না।

না, না, মিথ্যা! মিথ্যা কথা বলেছিল জুবেদা। নিশ্চয়ই সে তাকে ভালবেসে ছিল। ভাল যদি না বাসবে তাহলে সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর সঙ্গে জৌনপুর যাত্রার পূর্বে অমন করে কাঁদবে কেন? বান্দাটা বলেছিল সব। জুবেদা বিবি কদিন শুধু কেঁদেছে দিনরাত। মুখে তোলেনি আহার।

হয়তো তা নয়। বান্দাটা মিথ্যা বলেছে। নতুন সুলতানের মন রাখতে চেয়েছে। জুবেদা কাঁদেনি, নিশ্চয়ই কাঁদেনি সে। কিন্তু ভুল করেছে সে। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে পিতার সঙ্গে। অথচ যার জন্যে এই ভুল করা, অন্যায় আর পাপের পঙ্কে ডুবে গেল, তাকে পেল না।

তাই হয়। হয়তো এই নিয়ম। বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র শাস্তি। আর এ শাস্তি যে কী মর্মান্তিক, আজ সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। সে পথ খুঁজছে আলোর, সে মুক্তি চায়।

নূরকুৎব্ আলম বলেছিলেন, জাহাঁপনা, যদি গোস্তাগী ক্ষমা করেন, একটা কথা বলি।

জানতে চেয়েছিল সে। যদিও বিনয়ের অবতার দরবেশের প্রতিটি আদেশই আজ সে মানতে বাধ্য, কিন্তু উনি প্রতিটি বিষয়েই তাকে অনুরোধ করেন। আর অনুরোধটা শুনে চমকে উঠেছিল সে। চিণ্ময়ী আর শ্যামসুন্দরকে ভাতুড়িয়া থেকে আনতে বলেছিলেন তিনি।

চিণ্ময়ী! নামটা ভুলেছিল অনেকদিন! জুবেদার মোহে অন্ধ মনটা একবারও তার নাম উচ্চারণ করেনি। চিণ্ময়ী হারিয়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির অন্ধকারে।

নূরকুৎব্ আলমের কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল। নিজেকে অসহায় বোধ করেছিল। কথা বলতে পারেনি।

দরবেশ বলেছিলেন, তাঁদের কী নিয়ে আসবেন না ?

নিয়ে আসবো ? প্রশ্নটা নিজেকেই নিজে করেছিল। চিণ্ময়ী নিশ্চয়ই আসবে না। কার কাছে আসবে ? কে সে ?

আচ্ছা ধর্মটাই কী সব ? মানুষের কোন মূল্য নেই। যদু নারায়ণের দেহ মন সবই তো সেই আগের মতই আছে। আছে কী ? হয়তো সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের পরিবর্তন তো স্বাভাবিক। ভুল করেছিল। না, না, ভুল কেন, ভাগ্য ! তার ভাগ্যে যা ছিল তাই হয়েছে। মানুষটা আগের মতই আছে, ত্যাগ করেছে শুধু ধর্ম। প্রতিটি ধর্মের মর্ম কথা তো সেই একই। তবে কেন চিণ্ময়ী আসবে না ?

সত্যই চিণ্ময়ী এল না। শুধু চিণ্ময়ী নয়, ভাতুড়িয়ার প্রতিটি মানুষ তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিল। চিরদিন যে গৃহ তার আপন ছিল, সে গৃহদ্বার রুদ্ধ হল তার সামনে। ব্রজ বাউরী মুখের ওপর বলল, মুসলমানের স্থান নেই এখানে।

মুসলমান, মুসলমান ! যদু আজ জালালুদ্দিন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে সে। বেশ করেছে। ধর্ম মানুষের প্রাণের সম্পদ। ইসলাম ধর্ম তার প্রাণ।

নূরকুৎব্ আলম বললেন, আপনি সুলতান !

সুলতান জালালুদ্দীন দরবেশের মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন, আপনার অসাধ্য কিছু নেই, আপনি সব পারেন। বাংলার সুলতানকে যারা অপমান করতে সাহসী হয়, তাদের শাস্তি দিন।

শাস্তি দেব ?

নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন। দোষীদের শাস্তি দেওয়াই কর্তব্য। প্রাসাদের প্রতিটি নারী পুরুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার আদেশ দিন আপনি।

কেউ বাদ যাবে না ?

না। ন্যায্য বিচার করুন আপনি। অপমানের প্রতিশোধ নিন। যারা আপনাকে ঘৃণা অবজ্ঞায় প্রাসাদে প্রবেশ করতে দিল না, তাদের উপস্থিত করুন আপনার সামনে।

তারপর ?

তাদের বুঝিয়ে দিন, রাজ্যটা হিন্দুর নয়, মুসলমানের। মুসলমান সুলতানকে অপমান করার স্পর্ধা দূর হক হিন্দুর।

বেশ, তাই হোক। সৈন্যদের আদেশ দিন, ভাতুড়িয়া প্রাসাদ থেকে সকলকে ধরে আনুক এই মুহূর্তে। সুলতান জালালুদ্দীন বিচার করবে তাদের।

আনন্দে দুই চোখ চক্‌চক্ করে উঠেছিল নূরকুৎব্ আলমের। সত্য সত্যই তিনি আদেশ জানাতে যাচ্ছিলেন সেনাপতিকে।

বাধা দিয়েছিল সে। বলেছিল, একটু দাঁড়ান ফকির সাহাব।

দাঁড়িয়ে ছিলেন নূরকুৎব্ আলম। জালালুদ্দীন নয়, ক্ষণিকের জন্য যদু জেগে উঠেছিল। বলেছিল, ফকির সাহাব, আজ আমি হিন্দু নই, মুসলমান। হিন্দু আজ আমার কাছে কাফের। তাদের অপমান নিশ্চয়ই আমি সহ্য করবো না। আমি তাদের বিচার করবো, শাস্তি দেব। তাদের একমাত্র শাস্তি ধর্মান্তরতি করা। সৈন্যদের আদেশ দিন, যে কোন উপায়েই হ'ক, সকলকে বন্দী করে নিয়ে আসুক। আমি তাদের আমার সামনে শৃঙ্খলিত অবস্থায় দেখতে চাই। আমার সামনে আপনি তাদের কল্‌মা পড়িয়ে মুসলমান বানাবেন ফকির সাহাব।

নিশ্চয়ই জাহাঁপনা! আনন্দে যেন চিৎকার করে উঠেছিলেন নূরকুৎব্ আলম। এ আমার বহুদিনের ইচ্ছা।

আমারও তাই ইচ্ছা ফকির সাহাব। কিন্তু···

কী জাহাঁপনা ?

আচ্ছা ফকির সাহাব, বন্দিনীদের মধ্যে আমার মাও থাকবেন

তো ? আমার গর্ভধারিণী জননী। আচ্ছা ফকির সাহাব, মুসলমান হলে মায়ের ধর্ম হাসতে হাসতেই কেড়ে নিতে পারে, তাই না ?

চিৎকার করে দুই কানে চাপা দিয়েছিলেন নূরকুৎব্ আলম, তোবা, তোবা !

না, নূরকুৎব্ আলম যা চেয়েছিলেন শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। যদু ফিরে এসেছিল পাণ্ডুয়ায়। সুলতান জালালুদ্দীন হিসাব মিলিয়ে ছিল তার জীবনের।

এখন অন্ধকার আকাশটার দিকে চাইল সে। রাত্রি গভীর। মানুষ ঘুমাচ্ছে যে যার ঘরে। ঘুম নেই শুধু তার চোখে। কে জেগে আছে ? যদু না সুলতান জালালুদ্দীন ? কে ?

আমি কে ? যদু। না, না, আমি জালালুদ্দীন। আমি সুলতান। বাংলার মসনদ আমার। আমি বাংলার অসংখ্য মানুষের ভাগ্যবিধাতা। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, মালেক।

আমি কী করিনি ? কী করেছি ? হিন্দু-ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান হয়ে স্বেচ্ছায় আপন ধর্ম বিসর্জন দিয়েছি। একটা মানুষের আজন্মের বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছি। যে হিন্দু দীর্ঘ দুশো বছরের অনেক অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, মুক্তির মন্ত্রে গেয়ে উঠেছিল জীবনের জয় গান, তাদের সেই মুক্তির উচ্চকণ্ঠকে আমি চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়েছি। আমিও একদিন তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলাম, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু সত্য সত্যই যখন দুঃস্বপ্নের রাত্রি প্রভাত হল, উজ্জ্বল সূর্যকিরণে আলোকিত হল বিশ্বপ্রকৃতি, সেই আলো গান জীবনের দুরন্ত প্রাণস্পন্দন অসহ্যবোধ হল আমার কাছে। আমার নিজের মধ্যে একটা শয়তান জেগে উঠলো হঠাৎ। সেই শয়তানটা নিজের সুখ খুঁজলো, লোভের ছায়া জেগে উঠলো তার মনে, সে শুধু নিজের কথা ভাবলো। আত্মসুখ। অসংখ্য মানুষের কথা তাদের ব্যথা বেদনা দীর্ঘদিনের অশ্রুজল চরম সর্ব-

নাশের পথ থেকে নিবৃত্ত করতে পারল না। হিন্দুর স্বাধীনতার সূর্যকে আমি আবার অস্তাচলের পথে পাঠিয়ে দিলাম।

আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি সুখী। কিন্তু আমি অসহায়। আমি কি করেছি বুঝতে পারছি না। আমি চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছি। ওরা বোঝাচ্ছে, আমি ঠিক করেছি। কিন্তু তাই কী?

কী জানি—কি জানি, আমি জানি না। আমি বুঝতে পারছি না। অসহ্য আত্মদাহ। আমার একজনও বন্ধু নেই আজ। আমি একা। সম্পূর্ণ একা আজ আমি। দিনে রাতে এক মুহূর্তের জন্যে শান্তি নেই। ভয়, ভয়, আর ভয়। ভয়ের ছায়াটা সব সময় আমাকে ঘিরে থাকে। অথচ অসহায় নই। সৈন্য সামন্ত অস্ত্র সব আছে আমার। আমার শত্রুতা করতে যে এগিয়ে আসবে, সাহসী হবে, আমি তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সাধ্য রাখি। সব সত্য, সবই বুঝি। তবু ভয় কাটে না মনের। আমার মনটাই আজ আমাকে অসহায় দুর্বল করে তুলছে। পথে বেরুলে একটা বাচ্চা ছেলেও আঙ্গুল তুলে দেখায়, তবু আমি ভয় পাই। অসহ্য রাগে আমার সর্বশরীর জ্বালা করে ওঠে। ইচ্ছা করে…। না, ইচ্ছাটাকে অনেক কষ্টে আমি দমন করি। কেন না, আমার মধ্যে সামান্য মনুষত্ব বোধটুকু বোধহয় এখনো অবশিষ্ট আছে।

অথচ একদিন আমি বিবেক বুদ্ধি মনুষত্ব হারিয়েছিলাম। আমি ভুল করেছিলাম। যদিও বাধা দিয়েছিল জুবেদা। বুঝিয়ে ছিল! আমার মনের মধ্যে যে শয়তানটার বাসা, একটা কামাতুর পশু কোন বাধা মানতে চায়নি। নরকে নামতে দ্বিধা করেনি এতটুকু।

এই যে যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণা আমার কাছে মাঝে মাঝে অসহ্য বোধহয়। মনে হয়, আমি পাগল হয়ে গেছি। আমি মুক্তি চাই। সকলেই রাত্রে ঘুমায়, আমি ঘুমোতে পারি না। প্রতি রাত্রে আমি নরক যন্ত্রণা ভোগ করি।

এই কোই হ্যায়! আমি চিৎকার করে উঠি। বান্দাটা ছুটে আসে। আমার জন্যে জেগে থাকে ও। আমরা দুজন জেগে থাকি। অথচ আমি জানি, বুঝতে পারি, একটু ঘুমের জন্যে ওর প্রাণটা ছটফট করে মরে। পারে না আমার ভয়ে। আমি সুলতান, ও আমার গোলাম। আমি জেগে থাকলে ওর ঘুমাবার অধিকার নেই।

ওকে জিজ্ঞাসা করি, তোর ঘুম পায় না ?

ভয় পায় ও। মুখখানা শুকিয়ে ওঠে। একটা জোয়ান খোজা। বিরাট শরীরের অধিকারি। কিন্তু কাঁপতে থাকে ভয় পাওয়া জানোয়ারের মত।

বলি, ভয় নেই তোর, তুই সত্যি কথা বল। ঘুম পায় না তোর ? রাতে ঘুমাতে ইচ্ছা করে না ? তুই ঘুমাস না কেন ?

ও তবু ভয়ে কাঁপে। কথা বলতে পারে না।

ওকে হুকুম দিই, তোর ঘুম পেলে তুই ঘুমাস। আমার জন্যে তোকে জেগে থাকতে হবে না। তোকে আমি রাত্রে ডাকবো না কোনদিন।

সত্যিই আমি ডাকি না ওকে। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারি, ও ঘুমায় না। ঘুমাতে পারে না। কারণ, আমি যে সুলতান। সুলতান জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ সারারাত জেগে থাকবে, অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করবে, আর নিশ্চিন্তে ঘুমাবে বান্দাটা তা কখনো হয় নাকি ?

হয় না। হতে পারে না। আমি ভুলতে পারিনি কিছুই। ভুলতে পারিনি বলেই যন্ত্রণায় ছটফট করি। সারারাত ঘুমাতে পারি না। পিতাকে মনে পড়ে, ভাইকেও। তারা কোথায় জানি না। আমার স্ত্রী, পুত্র, মা। চিণ্ময়ী আমাকে ভালবাসতো। একটা পশুকে ভালবাসতো সে। আজ ঘৃণা করে কি না, মাঝে মাঝে জানতে বড় ইচ্ছা করে। কিন্তু উপায় নেই। সুলতান হয়েও আমি পারিনি।

ভাতুড়িয়া প্রাসাদে প্রবেশের পথ আমার কাছে চিররুদ্ধ। একটা শয়তানের আদেশ তারা অমান্য করেছে। জানিয়েছে, বিনা যুদ্ধে সেখানে প্রবেশের অধিকার আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর আমি সে অধিকার অর্জন করলেও বন্দীত্ব স্বীকার তারা করবে না। আমি জানি, মৃত্যুকে তারা ভয় পায় না। যতটা ভয় পায় বিধর্মীর ছায়া মাড়াতে।

বিধর্মী, বিধর্মী। আমি বিধর্মী। হিন্দু-ব্রাহ্মণ সন্তান যদু নারায়ণ আজ বিধর্মী। বিপদহারী মধুসূদন নয়, আজ সে খোদার সেবক। মেহেরবান খোদা তাকে সৌভাগ্য এনে দিয়েছেন। তুচ্ছ হয়ে গেছে আজন্মের ধর্মসংস্কার। সামান্য ধর্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলার সুলতানী তো কম নয়। সুলতান ইব্রাহিম শর্কী সত্যই মহানুভব। তিনি আমাকে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত করে বিনা দ্বিধায় মসনদটা হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেছেন জুবেদাকে। কিন্তু সুলতানতো অভাবী নয়। সুলতানের ইচ্ছার মূল্য অনেক।

কিন্তু তবু আমি ঘুমাতে পারছি না। আমি আজ ঘুমাতে চাই। ক্লান্তিতে আমার চোখের পাতা বুজে আসছে, তবু ঘুম নামছে না আমার চোখে। কেন, কেন আমি ঘুমাতে পারছি না। কেন?

কেন? তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জ্বলে উঠল মহেন্দ্রর কণ্ঠটা। কৌতুকে চক্‌চক্ করে উঠল তার দুই চোখ। অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়তে চাইছিল তার দেহটা। কিন্তু নিজেকে সংযত করলো সে। কঠিন কণ্ঠে বলল, এই 'কেন'র উত্তর আমি ইচ্ছা করলে নাও দিতে পারি জালালুদ্দীন।

জালালুদ্দীন! সে কী স্বপ্ন দেখছে। মহেন্দ্র তার ভাই। মহেন্দ্র তাকে জালালুদ্দীন বলে সম্বোধন করছে! সে যেন বিশ্বাস করতে পারল না কথাটা। মনে হল, ভুল শুনেছে। তবু বুকটা তার বেদনায় মুচড়ে উঠল। অপরাধী কণ্ঠে ডাকল, মহেন্দ্র, মহেন!

তীক্ষ্ণ হল মহেন্দ্র। কঠিন দৃষ্টিতে যদুর মুখের দিকে চাইল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আমার নাম ধরে ডাকবার অধিকার আপনার নেই।

নেই?

না। মহেন্দ্র কঠিন। বলল, আপনি আমার বন্দী। একজন বন্দী তাঁর অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করুক, এ আমি চাই না।

তুই এসব কী বলছিস মহেন্দ্র? তীব্রকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল যদু।

আমি যা বলছি, এটাই নিয়ম এবং রীতি। আপনি যে বাংলার সুলতান জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ, আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু এখন আপনি আমার হাতে বন্দী। বন্দী হলেও যে মর্যাদা আমি আপনাকে দিয়েছি, আশা করি, আমিও তেমনিই ব্যবহার আশা করবো আপনার কাছে। এখন যে সম্বোধনে আপনি আমাকে ডাকছেন, বন্দী হওয়ার আগে যদি ডাকতেন, আমি মেনে নিতাম,

কিন্তু এখন নয়। কারণ এই মুহূর্তে আপনার কোন অধিকার নেই। সামান্য একজন বন্দী ভিন্ন কেউ নন আপনি। আপনার মসনদ, প্রাসাদ সমস্ত এখন মহারাজ গণেশ নারায়ণের অধিকারে। আপনাকে রক্ষা করার জন্য আপনার সৈন্যদের যারাই এগিয়ে এসেছে, প্রাণ দিয়েছে তারা। আপনার প্রধান মন্ত্রণাদাতা নূরকুৎব্ আলমও বন্দী হয়েছেন। আর আজকের রাত্রি শেষে প্রভাতের আলোয় আবার বাংলার আকাশে উঠবে হিন্দুর জয় পতাকা।

এ অন্যায়!

অন্যায়! গর্জে উঠল মহেন্দ্রর কণ্ঠ। বলল, ন্যায় অন্যায়ের পাঠ আপনার কাছে নেব না সুলতান। যিনি অন্যায় আর অসত্য ভিন্ন জীবনে কিছু করেন নি, ন্যায় অন্যায় বলার অধিকারও তাঁর নেই।

আমার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবে?

আমি হলে দিতাম। একটা বেইমানকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করতাম না। কিন্তু মহারাজা তেমন অধিকার আমায় দেননি। আমায় তিনি আদেশ দিয়েছেন, আপনাকে শৃঙ্খলিত করার। সে আদেশ আমি পালন করেছি। বিচার করবেন তিনি।

একজন কাফের?

কাফের হলেও এখন তিনি আপনার ভাগ্যবিধাতা। তিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতেও পারেন। ইচ্ছা করলে কারাগারেও নিক্ষেপ করতে পারেন।

কিন্তু পরিণাম?

সেটা আমরা চিন্তা করবো।

কিন্তু আমিও যে চিন্তা না করে পারছি না?

আপনার পরিণাম আপনি চিন্তা করুন। খোদাকে ডাকুন।

শৃঙ্খলিত যদু গর্জে উঠল নিষ্ফল আক্রোশে। সাধ্য কী তার বন্ধন মুক্ত হয়।

রাতটা শেষ হয়ে আসছে। আলোর ইসারা জাগছে যেন আকাশের পূর্ব কোণে। পাখির ডাক হয়তো একটু পরেই শোনা যাবে।

যদু ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকদিন পরে সুলতান জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের চোখে ঘুম নেমেছিল। স্বপ্ন দেখেছিল। ঐশ্বর্যের স্বপ্ন! সৌভাগ্যের স্বপ্ন। কিন্তু কঠিন আঘাতে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। যন্ত্রণায় উঠে বসলো সে। কারা যেন তার দেহটা নিয়ে টানাটানি করছিল। দেখেছিল তার হাত পা শৃঙ্খলিত। কেন, সে শৃঙ্খলিত হল কেন?

আমাকে শৃঙ্খলিত করল কে? সে চিৎকার করে উঠেছিল।

আপনি আমার বন্দী জাহাঁপনা।

বন্দী! আমি বন্দী! তুমি কে, আমাকে বন্দী করলে? কেন বন্দী করলে? কী করেছি আমি তোমার?

কী করেননি তাই বলুন?

কী করেছি? বুঝতে পারেনি সে। বোকার মত প্রশ্ন করেছিল। জানতে চেয়েছিল তার অপরাধ! কেন তাকে বন্দী করা হল।

কী করেছেন, সে কথা যথা সময়েই জানতে পারবেন। আর কী করেননি, সে কথাটা বুকে হাত দিন, নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন একবার।

তুমি মহেন্দ্র, একথা বলছো? আমার ভাই হয়ে একথা আমার মুখের ওপর বলতে পারলে?

কে বললে আমি আপনার ভাই? আমি মহারাজা গণেশ নারায়ণের পুত্র কুমার মহেন্দ্র দেব।

আমার ভাই নও?

একদিন ছিলাম, আজ নই।

রক্তের সম্পর্ক মুছে ফেলতে চাও এমনি ভাবে?

রক্তের সম্পর্ক! হেসেছিল মহেন্দ্র। মুসলমান সুলতানের মুখে রক্তের সম্পর্কের কথাটা বড় বেমানান শোনাল। কারণ যেখানে স্বার্থ, সেখানে রক্তের সম্পর্কটা মুছে ফেলতে এতটুকু দ্বিধা করে না তারা। অতীতের দিকে ফিরে চান, দেখবেন, কত সত্য কথা। আগামী দিনের ভবিষ্যতেও এই সত্যটা ভয়াবহরূপ নেবে। একমাত্র সত্য আপন স্বার্থ। হিন্দু ঘৃণা করে সেই স্বার্থপরদের।

আমাকে তুমি ঘৃণা কর?

করি।

কেন?

প্রশ্ন করেছিল যদু। মহেন্দ্র বলতে পারেনি। নিজেকে কঠিন করেছিল সে। আঘাত হেনেছিল অন্য ভাবে। তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। মাথায় আগুন জ্বলছিল। চিণ্ময়ীর আত্মহত্যার কথাটা যতবার তার মনে পড়েছে, ততবারই সে অস্থির হয়ে উঠেছে। বৌঠানের মৃত্যুর জন্যে একমাত্র দায়ী যদু।

স্বার্থ! হীন, স্বার্থপর একটা মানুষ। মহেন্দ্রর ভাই বলে ভাবতে লজ্জা করছে। সে ভেবে পাচ্ছে না, এমনটা কী করে সম্ভব হল! দিন্দেশপ্রসিদ্ধ উদয়ণ আচার্যের বংশধর, মহাপ্রাণ গণেশের পুত্র আপন স্বার্থের জন্যে কী করে ধর্মত্যাগ করতে পারল! মিথ্যা, ধর্ম সংস্কার রক্তধারা। লোভ, স্বার্থপরতাই একমাত্র সত্য। স্বার্থের কাছে মানুষের বিবেক বুদ্ধি মনুষত্ব মূল্যহীন।

এখন শৃঙ্খলিত যদুর মুখের দিকে তাকাল মহেন্দ্র। সুলতান জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ। অঙ্গে বহুমূল্য পরিচ্ছদ। ঐশ্বর্যের আবরণে মোড়া একটা মানুষ। ম্লান, বিষণ্ণ।

ভুল মানুষই করে, সংশোধনও। জালালুদ্দীন কী তার ভুলের সংশোধনে প্রস্তুত? না, এ তার ভুল নয়? সে যা করেছে স্ব ইচ্ছায়, বিদ্বেষ বসে। আজন্মের ধর্মসংস্কার ত্যাগ করতে কী একটুও বুক কাঁপেনি, ব্যথা জাগেনি, হাহাকার করে ওঠেনি মনটা?

আপনি কী স্ব ইচ্ছায় আপনার ধর্মত্যাগ করেছেন ?

এ প্রশ্নের কোন প্রয়োজন আছে কী ?

আমার জানতে বড় ইচ্ছা করছে।

কেন ?

'কেন'র উত্তর মহেন্দ্র দিতে পারল না। নীরব রইলো সে।

হাসল জালালুদ্দীন। বলল, অনাবশ্যক কৌতূহল ভাল নয় কুমার মহেন্দ্র দেব। ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন উত্থাপন বন্দী হলেও প্রতিবাদ করবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে ?

আছে।

তবে ? কোন্ অধিকারে আপনি এসব প্রশ্ন আমাকে করছেন ?

করবো না ?

না।

মহেন্দ্র চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। একমুহূর্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জালালুদ্দীনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটু ম্লান হাসি ফুটলো তার মুখে। বলল, শুধু প্রশ্ন করা নয়, আপনাকে এভাবে বন্দীও হয়তো করতাম না আমি। হিন্দুর বহুদিনের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বেইমানীর ছুরিকাঘাত করে আপনি হয়তো সুখে এবং শান্তিতেই মসনদে বসে বিধর্মীয় শাসন চালাতেন। কিন্তু সম্ভব হল না তা। মহারাজা আমাকে একবার দুর্বল কণ্ঠে নিষেধ করেছিলেন। কারণ লজ্জায় তিনি আজ মাথা তুলতে পারেন না। তাঁর মুখখানা আজ অপমানের কালিমায় লিপ্ত। তাঁর বুকখানা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে আঘাতে। তিনি ভাবতে পারছেন না, তাঁর ঔরসে একটা শয়তানের জন্ম হল কেমন করে ? তিনি···

খবরদার ! যেন গর্জে উঠল জালালুদ্দীন।

মহেন্দ্র মরিয়া। বুকটা ফেটে যাচ্ছিল তার। পিতার সেই বলিষ্ঠ দেহ আজ ক্ষীণ, দুর্বল। জীবনীশক্তি নিঃশেষিত। তিনি যেন শেষ হয়ে গেছেন। আশক্ত দুর্বল পঙ্গু একটা মানুষ সীমাহীন

আঘাত সহ্য করে অসহ্য যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছেন। বিধ্বংসী ভূমিকম্প তাঁর আশা আকাঙ্খা স্বপ্ন সাধনা চুরমার করে দিয়েছে। পুত্রের বিরুদ্ধাচরণে যত না আঘাত পেয়েছিলেন, তার শতগুণ আঘাত পেয়েছেন ধর্মান্তরিত হওয়ায়। বাজে-পোড়া একটি মহীরুহ যেন মৃত্যুর দিন গুণছেন সব কিছু ভুলে থাকার আপ্রাণ চেষ্টায়। ব্যর্থ হয়ে ছট্‌ফট্ করছেন। তবু নীরব।

ফিরে এসেছিলেন ভাতুড়িয়ায়। ইচ্ছা ছিল, সকলকে সঙ্গে নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করবেন। কোথায় যাবেন জানেন না। বলেছিলেন শুধু, বাংলায় আর নয়। বাংলার আকাশ বাতাস তাঁর কাছে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন।

ভাতুড়িয়ায় পৌঁছে পেলেন পুত্রবধূর মৃত্যুসংবাদ। সব অপমান লজ্জার হাত থেকে মুক্তি নিয়েছে চিণ্ময়ী। কাঁদেন নি তিনি। চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল তাঁর।

সে জিজ্ঞাসা করেছিল, কী করবেন?

কী করবো? তিনিও যেন জানতে চেয়েছিলেন সে কথা।

আপনি যা বলেছেন?

না। যেন গর্জে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠ।

তবে?

প্রতিকার।

কেমন করে?

জানি না। অসহায় শুনিয়েছিল তাঁর কণ্ঠটা। বলেছিলেন, আমি ভুল করতে যাচ্ছিলাম। ভুলতে বসেছিলাম ন্যায়নীতি। পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে প্রশ্রয় দিতে যাচ্ছিলাম অন্যায়কে। একটা চিণ্ময়ী চলে গিয়ে আমার চোখ খুলে দিয়েছে। হাজার হাজার চিণ্ময়ী যে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। অনেক দুঃখ অপমান লাঞ্ছনা তারা সহ্য করছে। আমি তাদের মনে ক্ষণিকের জন্য হলেও আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছিলাম। সে শিখাকে আবার জ্বালিয়ে

তুলতে হবে। ভুলতে হবে স্নেহ ভালবাসা মমতা। যত্ন নয়, জালালুদ্দীন। ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে না। বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতেই হবে। আর তুমিই…

না, না! আর্তনাদ করে উঠেছিল সে।

পারবে না? দুই চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল তাঁর। বলেছিলেন, আপন স্বার্থের জন্যে যে জাতির সর্বনাশ করেছে, শুধু মাত্র ভাই বলে তাকে ক্ষমা করবে?

কিন্তু…

কঠিন হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, রক্তের সম্পর্ক কিছু নয় মহেন্দ্র। সে যদি সে-সম্পর্ক অস্বীকার করে, তাহলে তুমি পারবে না কেন? বেইমান কারো ভাই বন্ধু পুত্র কিংবা আত্মীয় নয়। বেইমানের একমাত্র পরিচয় বেইমান। সে বেইমানী করেছে। সর্বনাশ করেছে জাতির। ক্ষমার প্রশ্ন এখানে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া।

দুর্বলতাকে আর প্রশ্রয় দেয়নি মহেন্দ্র। সৈন্যসংখ্যা অতি তুচ্ছ। অটুট মনোবলে অসাধ্য সাধন করেছে। সঙ্গীদের একজন প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু দশজনের জীবন নিয়েছে। প্রাসাদ অধিকারে সংগ্রামে জয়ী হয়েছে সে। কিন্তু…

সুলতান জালালুদ্দীনের মুখের দিকে চাইল সে। বলল, আমি এতটুকু মিথ্যা বলিনি সুলতান। আমার বৌঠানের আত্মহত্যাতেই আপনার এই পরিণতি।

যত্ন কী পাষাণ হয়ে গেল? হ্যাঁ, ওইতো চোখে জল। সুলতান জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ তাঁর অতীতের বেদনায় কাঁদছে।

মহেন্দ্র চিৎকার করে উঠলো, কে আছো, বন্দীকে কারাগারে নিয়ে যাও!

চোদ্দ

রাজ দরবার।

৮১৯ হিজরার (১৪১৬ খ্রীঃ) প্রথম ভাগ। সবে মাত্র বৈশাখের শুরু। বাংলার মসনদ আবার হিন্দুর অধিকারে। ক্ষণিকের দুঃস্বপ্নের রাত্রি প্রভাত হয়েছে। মানুষের আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস। পাণ্ডুয়ার পথ ঘাট জনারণ্যে পরিণত হয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন মেলা বসেছে। ঘরের কাজ মিটিয়ে আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে এসেছে মানুষ!

দিনটিকে উৎসবের দিন হিসাবে চিহ্নিত করলে হয়তো ভুল হয় না। শুধু পাণ্ডুয়া নয়, বাংলার ঘরে ঘরে চলেছে উৎসবের সাড়া। লতায় পাতায় ফুলে প্রতিটি গৃহ সজ্জিত। দ্বারে মঙ্গল ঘট। চন্দন কুঙ্কুমের ছড়াছড়ি। মানুষ হাসছে, গান গাইছে। বালক বালিকা শিশুর দল মেতেছে খেলায়। কদিন আগেও যে বধূটির চোখে ছিল শঙ্কার ছায়া, অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপতো থরথর, আজ সে নির্ভয়ে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে কাঁখে কলস নিয়ে একাকিনী এগিয়ে চলেছে নদীপথে। সখীর দল রঙ্গ কৌতুকে মেতে উঠেছে নতুন করে। রায়বাঘিনী ননদিনীরা কিছুটা ক্ষুণ্ণ। নিত্যদিনের অযাচিত উপদেশের বন্যা আজ স্তব্ধ।

স্তব্ধ পাণ্ডুয়ার দরবার গৃহ। কারো মুখে কথা নেই। সিংহাসনে স্তব্ধভাবে বসে আছেন মহারাজা গণেশ নারায়ণ। আজ তিনি 'দনুজ মর্দন দেব'। মন্ত্রী আমাত্য সভাসদের দল আপন আপন আসনে উৎকণ্টিতভাবে বসে আছেন। দণ্ডায়মান মহেন্দ্র। পিতার বাম পাশে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে সে।

গণেশ নারায়ণ চিন্তিত। একটু বিচলিতও যেন তিনি। কয়েক

মাস পূর্বের কথা বারবার মনে পড়ছিল তাঁর। কিন্তু সেদিন আজকের মত বিচলিত হননি। সেদিন কঠিন হৃদয়ে বিচার করেছিলেন অপরাধীদের। শাস্তি দিয়েছিলেন। আবার ফিরে এসেছে সেইদিন। কিন্তু আজ মনটাকে সেদিনের মত কঠিন করে তুলতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন। আজ যাদের বিচার তিনি করবেন, তাদের একজন যে বড় স্নেহের ধন তাঁর। পুত্র! পুত্র অপরাধী। বিচারক পিতা।

না, না, তা নয়। এখানে পিতা পুত্র আত্মীয় বন্ধুর স্থান নেই। দরবারের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে তাঁকে। সিংহাসন ন্যায়ের প্রতীক। তিনি বিচারক। বিচার করবেন অপরাধীর। ন্যায় বিচারে শাস্তি দেবেন। এখানে কে পুত্র—কে পিতা? পিতা তো তিনি সকলের। প্রজারা তাঁর পুত্র সমান। আপন স্বার্থে যে সকলের সর্বনাশ করেছে, তাঁকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন না। ক্ষমা করা অন্যায়। সত্য ন্যায় আর ধর্মের অবমাননা করা হবে।

দরবার গৃহে আজ তিলধারণের স্থান নেই। অসংখ্য মানুষ উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করছে ভেতরে-বাইরে। মৃদু গুঞ্জনধ্বনি কানে আসছে তাঁর। মানুষ যেন বিচার দেখতে আসেনি, এসেছে বিচার করতে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই আজ উপস্থিত। তারা দেখতে চায়, ন্যায় সত্য আর ধর্মের পূজারী বলে যিনি পরিচিত, তাঁকে। একদিন অপরাধী মুসলমানদের যিনি কঠিনভাবে দণ্ড দিয়েছেন, আজ আপন পুত্রের বিচারে তেমন দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করতে পারেন কী না?

পরীক্ষা! শুধুমাত্র কঠিন নয়, এ যেন জীবনের অগ্নিপরীক্ষা তাঁর। এ পরীক্ষায় তিনি কী উত্তীর্ণ হতে পারবেন? যদুর মুখের দিকে চেয়ে পারবেন দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করতে?

কেন পারবেন না? মনটাকে কঠিন করতে চাইলেন তিনি। কে যদু? তাঁর পুত্র? আজতো তিনি যদুর বিচার করবেন না, বিচার করবেন জালালুদ্দীনের। সুলতান জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের।

যদু তো মরে গেছে। তাঁর পুত্র যদুর কোন অস্তিত্ব নেই ইহজগতে। অপরাধী জালালুদ্দীনের বিচারক আজ তিনি।

কিন্তু জালালুদ্দীন কোন্ অপরাধে অপরাধী? কী করেছে সে? সুলতান জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের অপরাধের প্রমাণ কোথায়? কয়েক মাসের সুলতানী মানুষের কী ক্ষতি করেছে?

না, জালালুদ্দীন নয়, যদু! আজ যদুর বিচার করবেন। এক নির্লজ্জ স্বার্থান্বেষী হিন্দু কুলাঙ্গারের। যে আপন ধর্ম সংস্কার সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আপন স্বার্থের জন্য মানুষের ক্ষতি করতে এতটুকু দ্বিধা করেনি, তার। বিচার করবেন রাজা গণেশের একজন সেনাপতির। যে তার অধীনস্থ সহস্র সৈন্যকে বাধ্য করিয়েছিল আক্রমণকারীর সঙ্গে যোগ দিতে। বিচার করবেন এক হীন ষড়যন্ত্রকারী বেইমানের। যদু বেইমান। হিন্দুর স্বাধীনতা তারই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বিপন্ন হয়েছিল। আপন স্বার্থের জন্যে দেশটাকে তুলে দিয়েছিল বিদেশী বিধর্মীর হাতে। পুত্র নয়। এক বেইমানের বিচার করবেন তিনি।

কিন্তু ও কে? ওই যে জীর্ণ শীর্ণ ম্লান মূর্তিটা শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাঁর সামনে এসে বিচারপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে, ও কে? যদু না জালালুদ্দীন। চিনতে পারছেন না তিনি। ও মূর্তিটা তাঁর অপরিচিত। কোনদিন দেখেননি ওকে!

গণেশ নারায়ণ পুত্রের মুখের দিকে অনেকক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলেন। মাথা নীচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে যদু। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। কী যেন বলতে গেলেন ওকে। হয়তো নাম ধরে ডাকতে গেলেন। পারলেন না। তাঁর মনে হল, কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। দেহটা শক্তিহীন।

একসময় মৃদুকণ্ঠে মহেন্দ্র ডাকল, মহারাজ!

মহারাজ! মহেন্দ্রর মুখের দিকে নীরবে তাকালেন তিনি। পিতা নন, তিনি মহারাজ! সিংহাসনের অধিকার পুত্রকে দূরে

সরিয়ে নিয়ে গেছে। চিরদিনের পিতৃ সম্বোধনের পরিবর্তে পুত্র ডাকছে মহারাজ বলে।

মহেন্দ্র তেমনি মৃদুকণ্ঠে বলল, বন্দী উপস্থিত, আপনি বিচার করুন মহারাজ!

বন্দী! যদু বন্দী। তাকে বন্দী করার আদেশ তিনিই দিয়েছিলেন। পুত্রবধূর আত্মহত্যা মনটাকে পাষাণে পরিণত করেছিল। না হলে তিনি স্থির করেছিলেন আর নয়। পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতা মন ভেঙ্গে দিয়েছিল তাঁর। যে ধর্ম সমাজ আর মানুষের আপন স্বার্থ ত্যাগ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই ধর্ম সমাজ আর মানুষের কথা ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। ঘৃণা জেগেছিল মনে। তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। দূরে সরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাওয়া হল না। চিন্ময়ীর মৃত্যুটা তাঁকে যেতে দিল না। মেয়েটা যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল তাঁর। পলায়ন মনোবৃত্তিটাকে সে কঠিন কশাঘাত হেনে গেল। পিতৃমনের দুর্বলতাকে ধিক্কার দিয়ে গেল যেন।

মহেন্দ্রকে তিনি আদেশ দিলেন। ক্ষমা নয়, প্রতিশোধ। আপন স্বার্থের জন্যে যে ধর্ম সমাজ বংশমর্যাদাকে বিস্মৃত হয়ে বাংলার মসনদে বসেছে সুলতান হয়ে, যেমন করেই হোক, বন্দী কর তাকে। তিনি তার বিচার করবেন। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেবেন।

শাস্তি! হ্যাঁ, শাস্তি দেবেন তিনি যদুকে। যদু বিশ্বাসঘাতক।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি বন্দীর মুখের দিকে চাইলেন। কঠিন কণ্ঠে বললেন, যে অপরাধ তুমি করেছো, তারজন্য তোমার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত!

প্রাণদণ্ড! চমকে উঠলো যদু। কেঁপে উঠল তার সর্ব শরীর। করুণ আর্তি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। অসহায় দৃষ্টিতে চাইলো পিতার মুখের দিকে। একটি কথাও বলতে পারল না।

কেঁপে উঠল প্রতিটি মানুষ। উৎসুক জনতা যারা বিচার দেখার জন্যে জড়ো হয়েছিল, চমকে উঠল তারাও। পিতা হয়ে পুত্রের মৃত্যুদণ্ডাদেশ উচ্চারণ করতে পারেন, এ তাদের চিন্তার অতীত।

মৃদুকণ্ঠে মহেন্দ্র ডাকল, মহারাজ!

গণেশ নারায়ণ পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন।

মহেন্দ্র বলল, এ আপনি কী বলছেন?

কী বলেছি মহেন্দ্র? জানতে চাইলেন তিনি।

আপনি, আপনি···। কথাটা উচ্চারণ করতে পারল না মহেন্দ্র।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ উচ্চারণ করতে পারলুম কী করে?

হ্যাঁ মহারাজ।

কেন পারবো না?

আপনি···

আমি ওর পিতা! পিতা হয়ে কেমন করে পুত্রের মৃত্যুদণ্ডাদেশ উচ্চারণ করলাম, এইতো? কিন্তু মহেন্দ্র, এখন তো আমি শুধু মাত্র কারো পিতা নই, এখন আমি বিচারক। এই সিংহাসনে বসে ধর্ম ন্যায় ও সত্যের অমর্যাদা করতে আমি পারবো না। দোষীকে তার দণ্ড নিতেই হবে। ক্ষমার প্রশ্ন এখানে ওঠে না।

মহেন্দ্র নীরব। কী বলবে সে! কিছু বলা তার শোভা পায় না।

কিন্তু অনুরোধ জানালেন সভাসদের দল। মৃত্যুদণ্ডাদেশ রোহিতে আবেদন জানালেন তাঁরা। তাঁদের সে অনুরোধ উপেক্ষা করলেন না তিনি। আদেশ দিলেন আজীবন কারাগারে বন্দীত্বের। শুধু তাই নয়, ধর্মান্তরিত হয়ে যে পাপ করেছে, তারও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাকে।

যদুও সে আদেশ নীরবে মেনে নিল। মেনে না নেওয়া ছাড়া কোন উপায়ও নেই তার।

তারপর দীর্ঘ তিনটি বছরের একটানা হিসাব। জয়, জয়, আর জয়। মহারাজা দনুজ মর্দন দেবের জয়পতাকা তিনটি বছরে উত্তর বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ, মধ্য বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ আর দক্ষিণ বঙ্গের আকাশে উড়লো একের পর এক। একের পর এক স্বার্থপর ভূ-স্বামীদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন অধিকার। মানুষ প্রতিষ্ঠিত হল আপন অধিকারে। ভয় আর অত্যাচারের দিন শেষ হল তাদের জীবনে। মানুষের জয়গানে পূর্ণ হল বাংলার আকাশ বাতাস।

পনের

হিন্দুর অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন দরবেশ নূরকুৎব্ আলম। দরবেশদের চক্রান্ত শেষ হল চিরদিনের মত।

বাংলার হিন্দু মুসলমান সমান অধিকারে অধিকারী হ'ল। ভুলতে বাধ্য হল পুরাতন বিবাদ বিসংবাদ। গড়ে উঠল হিন্দুর দেবালয়। সেই সঙ্গে মুসলমানের মসজিদেরও সংস্কার করলেন তিনি। নতুন রূপে গঠন করলেন গৌড়ের ফতেখানের সমাধি-ভবন, আর পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদ। আদিনা মসজিদের সংস্কার করে রূপ দিলেন কাছারি বাড়িতে।

আর এমনি দিনে। তাঁর সুশাসনে মানুষের ঘরে যখন শান্তি বিরাজ করছে, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাংলার ঘরে ঘরে যখন আনন্দের হাট, তখন ভাতুড়িয়া থেকে ছুটে এল ব্রজ। সত্যবতী মৃত্যুশয্যায়। অনুরোধ করে পাঠিয়েছে, একবার শেষ দেখা দেখতে চায়।

মাথায় পর্বতপ্রমাণ কাজের বোঝা। দিনে রাতে এতটুকু অবসর নেই। তবু সব কাজ ফেলে ছুটে গেলেন তিনি স্ত্রীর মৃত্যু শয্যার পাশে। স্বামীকে দেখে সত্যবতীর পাণ্ডু ওষ্ঠে একটুকরো হাসি ফুটে উঠল।

হাসিটুকু দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না তিনি। তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠল। ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলেন, সত্য, সত্যবতী!

সত্যবতী মৃদুকণ্ঠে বলল, আমি জানতাম তুমি আসবে। তোমার পায়ের ধুলো একটু মাথায় দাও আমার।

সত্যবতী আমি যে···। কথাটা শেষ করতে পারলেন না তিনি।

হাসল সত্যবতী। বলল, এ আমার বহুদিনের সাধ।

না, না, আমি তোমাকে যেতে দেব না। যেমন করে পারি তোমাকে ধরে রাখবো।

সত্যবতীর মুখে আবার সেই টুকরো সুন্দর হাসিটি ফুটে উঠল।

সত্য, সত্যবতী!

সত্যবতী সাড়া দিল না।

চিৎকার করে উঠলেন তিনি। কত ডাকলেন। কিন্তু সে সাড়া দিল না আর। চোখ মেলে চাইল না, হাসল না।

তারপর!

বিষণ্ণ গণেশ নারায়ণ দিনে রাতে একাকী কী যেন চিন্তা করেন সবসময়। নির্ভুল ভাবে রাজকার্য করে যান, কিন্তু এত টুকু আগ্রহ নেই। পরিবর্তন দেখে সকলেই চিন্তিত। মহেন্দ্রর দুর্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু কী যে করবে কিছু ভেবে পায় না। বৃদ্ধ নায়েব মন্ত্রী হয়েছেন। তিনি তাঁকে বোঝান। হাসেন গণেশ নারায়ণ।

মহেন্দ্র প্রশ্ন করে, কী হয়েছে আপনার ?

কী হবে ? পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে তিনিও জানতে চান।

আপনি সব সময় বিষণ্ণ হয়ে থাকেন। মনে হয়···

হাসেন তিনি। বাধা দিয়ে বলেন, আমার কিছু হয়নি মহেন্দ্র। আমি ভাল আছি।

সকলকে তিনি বোঝালেন। কিন্তু পদ্মনাভের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন না। ভাতুড়িয়া থেকে অনেক কষ্টে তিনি নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন তাঁকে। বলেছিলেন, আপনাকে সেবা করার সৌভাগ্য থেকে আমাকে আপনি বঞ্চিত করবেন না।

বৃদ্ধ গম্ভীর হয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমাকে নয় বাবা, ঈশ্বরের সেবা কর তুমি। তিনি তুষ্ট হলেই জগৎ তুষ্ট হবে।

শোনেননি গণেশ নারায়ণ। জোর করে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন।

একদিন তিনি বললেন, কদিন ধরেই মনে করছি একটি কথা তোমাকে বলবো।

বৃদ্ধের কথা শুনে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন গণেশ নারায়ণ। একটু যেন কেঁপে উঠল তাঁর কণ্ঠটা। বললেন, বলুন!

তোমার কী হয়েছে বলতো? মিথ্যা চিন্তায় কেন মনটাকে ভারাক্রান্ত করে রাখছো?

চমকে উঠলেন গণেশ নারায়ণ। এ তাঁর মিথ্যা চিন্তা? সত্যবতীর মৃত্যুটা মিথ্যা? না, না, তা কেমন করে সম্ভব! মিথ্যা নয়, সত্যই তিনি আজ একা, কেউ নেই তাঁর।

তাঁর মনের কথা বুঝতে পারলেন যেন বৃদ্ধ। মৃদুকণ্ঠে বললেন, কথাটা আমি তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে বলিনি বাবা। কিন্তু যে নেই, তার কথা ভেবে মনটাকে যদি সব সময় ব্যস্ত রাখ, তাহলে যারা আছে তাদের কথা ভাববে কখন? তুমি যে রাজা, সকলের রক্ষক, আজ শুধু নিজের কথা ভাবলে তো চলবে না তোমার। আছে সবাই কিন্তু সবার ওপর আছো তুমি। সকলের দিকে দৃষ্টি যদি না দাও, তাহলে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। অমনযোগী হলে কী চলে।

কিন্তু···।

না, না, গণেশ, এমন করলে চলবে না। মনটা কঠিন করো। সকলের মঙ্গলামঙ্গল যে আজ তোমার ওপর নির্ভর করছে।

কিন্তু আমি যে পারছি না।

কেন পারছো না?

আমার মনে হচ্ছে আমি যেন ভুল করেছি। আমি···

কী?

সত্যবতী আমাকে একটি দিনের জন্যেও কিছু বলেনি। কোন অভিযোগ জানায় নি কোনদিন। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রিনী সত্যবতীর চোখের দিকে চেয়ে আমার যেন মনে হল তার মনে অনেক অভিযোগ জমেছিল আমার বিরুদ্ধে। সে যেন···

কী?

সে শুধু অসহায়ভাবে কেঁদেছে, ছটফট করেছে। আমার অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেইজন্যেই আমি ভাবি, চিন্তা করি, আমার অন্যায়। আমি কী করেছি?

পুত্রকে কারাগারে বন্দী করে রাখা কী তুমি অন্যায় বলে মনে করো?

না।

তবে?

আমি বুঝতে পারি না। সেইজন্যেই এই যন্ত্রণা, আমার মনের দাহ অস্থির করে তোলে। দিন রাত্রি অসহায়ভাবে আমি চিন্তা করেছি। আমি কী ভুল দেখেছি? সত্যবতীর দুই চোখে কী সত্য সত্যই অভিযোগের আগুন জ্বলে ছিল? আমি বুঝতে পারি না। আমি···

আর বলতে পারলেন না তিনি।। দুই হাতে মুখ ঢাকলেন। বারবার কেঁপে উঠল তাঁর শরীরটা। তিনি কাঁদতে চান। পারছেন না।

পদ্মনাভ বসে রইলেন নীরবে। ওকে যে কী বলে সান্ত্বনা দেবেন ভেবে পেলেন না তিনি।

মহেন্দ্র, জীবনে কোনদিন অন্যায় অসত্যকে স্থান দিইনি। যা ন্যায় সত্য বলে মনে করেছি, গ্রহণ করতে দ্বিধা করিনি এতটুকু। মহেন্দ্র, গণেশ নারায়ণ যদি তার আপন স্বার্থচিন্তায় মনটাকে ভরিয়ে

তুলতে পারতো, তাহলে সৌভাগ্যের স্বর্ণদ্বার তার কাছে খুলে যেত। আমি সকলের কথা ভেবেছি। ভেবেছি মানুষের কথা। মুসলমানের অন্যায় অত্যাচারে নিপীড়িত অসহায় হিন্দুদের কথা। মহেন্দ্র, আমি দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে পারি, কিন্তু আমার প্রাণের চেয়েও বড় সম্পদ ধর্ম নিয়ে কেউ যদি ছিনিমিনি খেলে, আমি সহ্য করতে পারি না। মুসলমানের অন্যায় অত্যাচার আর হিন্দুধর্মে আঘাত আমি সহ্য করতে পারিনি। আমি মানুষকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি মনুষত্বকে। মনুষত্বের অবমাননা আমার কাছে অসহ্য। আমি রাজ্য চাইনি, চাইনি সম্পদ। ভাগ্য আমাকে রাজা করেছে। বাংলার মানুষের দায়িত্বভার তুলে দিয়েছে আমার মাথায়। আমি সাধ্যমত সে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক সময় কঠিন হতে হয়েছে আমাকে, নির্মমভাবে উচ্চারণ করতে হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। তারজন্যে আমার মনে এতটুকু অনুশোচনা জাগেনি। কারণ আমি যা করেছি সকলের মঙ্গলের জন্যে। ভুলের ক্ষমা আছে মহেন্দ্র, অন্যায়ের ক্ষমা নেই। একের অন্যায় যে অন্যকেও প্রলোভিত করবে। আর যদুকে কারাগারে বন্দী করে রাখার প্রয়োজন আছে। তাকে আমি ক্ষমা করতে পারবো না। সে তার অন্যায়ের শাস্তি পাক। সে বুঝুক, তার পাপের পরিণাম।

৮২১ হিজরার (১৪১৮ খ্রীঃ) একটি অপরাহ্ন। পৌষের আকাশে রক্তজবার লাল। সন্ধ্যার ম্লান ছায়া নামছে ধীরে ধীরে। পাখিদের কাকলিধ্বনি ভেসে আসছে অস্পষ্টভাবে।

ঘরে ঘরে শোকের ছায়া। কাঁদছে মানুষ। কাজ ফেলে ছুটে এসেছে সবাই। স্ত্রী পুরুষ কেউই আজ কোন বাধা মানেনি।

পিতার কণ্ঠটা স্তব্ধ হয়ে যেতে মহেন্দ্র তাঁর মুখের দিকে তাকালো। ডুই চোখ নিমীলিত। অসহ্য ক্লান্তিতে তিনি যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কারা যেন আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মহেন্দ্র চোখ তুলে তাকাল সেদিকে। কাঁদছে মানুষ। গণেশ নারায়ণের মৃত্যুতে দুরন্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে সবাই।

মহেন্দ্রও তার চোখে হাত দিল। বুকের মধ্যে কান্নার কুণ্ডলীটা দুরন্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে। কিন্তু কাঁদতে পারছে না সে। তার একটি কথা বারবার মনে পড়ছে। কাঁদলে চলবে না। কান্না ভুলতে হবে আমাদের। কান্না দুর্বলের। সামনে কঠিন কর্তব্য! সন্ধ্যার ছায়া ঘনাচ্ছে। ম্লান অন্ধকার। রাত্রি নামছে। নিকষ কালো রাত্রি!

ষোল

একের শেষ, অন্যের শুরু। এই তো জগতের নিয়ম। আবহমান কাল থেকে এই নিয়মেই চলছে জগৎ-সংসার। সূর্য ওঠে, অস্ত যায়। রাত্রির প্রগাঢ় তমসা গ্রাস করে বিশ্বপ্রকৃতি। কিন্তু মানুষ জানে এই অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়। রাত্রির শেষে উষার স্পর্শ প্রবাহে দিনের সূর্য তার পথপরিক্রমায় পূর্বগগনে উদয় হবেই। হাসি অশ্রু আনন্দ বেদনা জীবনের ঘাটে ঘাটে কখনো বিষাদের ছায়ায়, কখনো বা খুশীর ঝর্নাধারায় চলার পথকে করবে অশ্রুশিক্ত অথবা প্রাণচাঞ্চল্যে দীপ্ত। এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। কর্ম শেষে মৃত্যুর অমৃতলোকে চিরবিশ্রামে নিদ্রিত হবে একদিন। নিত্যদিনের পথপরিক্রমায় শুরু হবে নবীনের যাত্রাকাল।

এল সেই যাত্রার লগ্ন। একের শেষ, অন্যের শুরু। মহেন্দ্রর নব জীবনের যাত্রারম্ভ হল একদিন। মহারাজা গণেশ নারায়ণের অসমাপ্ত কার্যভার ন্যস্ত হল রাজা মহেন্দ্র দেবের ওপর। কিন্তু··· আমি কী চেয়েছিলাম? এ জীবন কী কামনা করেছিলাম আমি? বাংলার রাজদণ্ড গ্রহণের ইচ্ছা—কামনা—স্বপ্ন কী আমার মনের নিভৃত কোণে সুপ্ত ছিল এতদিন? ছিল না। আমি এ জীবন কামনা করিনি, আমি চাইনি দণ্ডমকুট বা সিংহাসন। কেন চাইনি? আমার অক্ষমতা? অযোগ্যতা? আমি কী উপযুক্ত নই? না, না, তা নয়। আমি অক্ষম নই, অযোগ্যও নই। আমি জানি, এ কঠিন দায়িত্বভার বহনের ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু আমি এমন চাইনি, আজীবন কামনা করিনি। তবে? কী চেয়েছি আমি? আমার মন কী কামনা করেছে, স্বপ্ন দেখেছে? মুক্তি! কিন্তু এ তো বন্ধন নয়। যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই। তবে? কেন

আমি পারি না একটি মুহূর্তের জন্যে শান্তি? আমার মনের সেই আনন্দময় পুরুষটা কেন আমাকে বারবার সাবধান করে, পালিয়ে যেতে বলে? কেন একটি দিনের জন্যেও আমি এখন সেই আমার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা ভাবতে পারি না? কেন?

জালালুদ্দীন কারাগারে। পিতা, মহারাজা গণেশ নারায়ণের কঠিন আদেশে সারা জীবনের জন্যে বন্দী থাকবে সে। অথচ আমি রাজা। আমি আজ ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে বন্দীদের মুক্তি দিতে পারি। সে ক্ষমতা আমার আছে। তবু পারি না। কেন পারি না? না, রাজ্য আর রাজনীতির কঠিন বাঁধনে আমি বন্দী। আমি ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই পারি, প্রভূত ক্ষমতা আমার আছে, অথচ অনেক কিছুই আমি পারি না। কারণ আমি শুধু রাজা নই, রক্ষক। দশ এবং দেশের চিন্তাই প্রধান। তুচ্ছ হৃদয়বেগ মূল্যহীন। প্রজারা আমার সন্তানতুল্য। অতীত এবং বর্তমানের শত্রুকে ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে না, অথচ যত্ন আমার দাদা। যে সিংহাসনে আমি বসেছি, যে রাজদরবার আমাকে সম্মান দেয়, তার সমস্ত কিছুই তার প্রাপ্য, একমাত্র অধিকারী, আমি সেটুকু ভোগ করছি। কেন না সে অপরাধী। সে অতীতে অন্যায় করেছিল। অস্বীকার করেছিল আপন ধর্ম। ভুল করেছিল সে। মুসলমান হয়েছিল। অথচ একই রক্তধারা বইছে আমার শরীরে। সে রক্তধারার পরিবর্তন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ধর্ম আমাদের আলাদা করেছে। কিন্তু ধর্মটাই কী সব? মানুষের কোন মূল্য নেই? রক্তের সম্পর্ক কী মূল্যহীন?

কী জানি? কী জানি? আমি জানি না, বুঝতে পারি না। বিশ্বাস করি না, ধর্মের কঠিন নাগপাশ। সেইজন্যেই বন্দী জালালুদ্দীন, আর জেষ্ঠ ভাই যত্নর কাছে আমি একদিন ছুটে গিয়েছিলাম। রাতের অন্ধকারে চোরের মত চুপিচুপি নয়, দিনের আলোয় আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু

কথা বলতে পারিনি। কেন গিয়েছিলাম, আমি যেন ভুলে গিয়েছিলাম সে কথাটা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের মধ্যে হাহাকার জেগেছিল। মানুষের এমন সর্বহারা মূর্তি আমি দেখিনি।

আমি কথা বলতে না পারলেও সে বলেছিল। তার কণ্ঠটা যেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে করে উঠেছিল। আমাকে বিদ্রূপ করেছিল সে। বলেছিল, আমি খতম হয়েছি কী না দেখতে এসেছেন?

আমি মুখের দিকে চেয়েছিলাম। কী যেন বলতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই তার কণ্ঠটা গর্জে উঠেছিল। আমাকে যেন আদেশ করেছিল সে, আপনি এখান থেকে চলে যান।

চলে যাব! মুহূর্তে আমার মধ্যেও অধিকার বোধটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আমি রাজা। বাংলার সিংহাসন আমার। দেশ এবং মানুষের একমাত্র অধিকারী আমি। কাউকে কোন হুকুম করা, আদেশ দেওয়ার একমাত্র অধিকার আমারই আছে। সে বন্দী। তার কোন অধিকার নেই। সে আমার ইচ্ছায় বেঁচে আছে। আমি যদি ইচ্ছা করি যে কোন মুহূর্তে তাকে শেষ করে দিতে পারি। যদি ইচ্ছা করি, তার কারাজীবনকে যন্ত্রণাময় করে তুলতে পারি। আর সে কী না আমাকে আদেশ করছে? চলে যেতে বলছে! তাড়িয়ে দিচ্ছে!

কিন্তু নিজেকে আমি সংযত করেছিলাম। যদিও নিজেকে সংযত করতে আমার কষ্ট হয়েছিল। শান্ত কণ্ঠে বলেছিলাম, বন্দী, আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন, আপনার অধিকারের সীমারেখা। আপনি বোধহয় আমার পরিচয় জানেন না?

বিলক্ষণ জানি। আবার জ্বলে উঠেছিল তার কণ্ঠ।

তাহলে আপনার এমন ব্যবহারের অর্থ?

আমি আপনাকে সহ্য করতে পারছি না। আপনি এখানে

থাকলে নিজেকে স্থির রাখা হয়তো সম্ভব হয়ে উঠবে না আমার পক্ষে। সেইজন্যেই আমি আপনাকে চলে যেতে অনুরোধ করছি।

কিন্তু আপনার অনুরোধের প্রকাশভঙ্গীটা শ্রুতিমধুর নয়।

স্বাভাবিক কারণে।

কেন জানতে পারি কী ?

নিশ্চয়ই পারেন। আবার বিদ্রূপে ঝলসে উঠেছিল তার কণ্ঠ। বলেছিল, আমি জানি, আমি বন্দী। আপনাদের বিচারে জঘন্য অপরাধে অপরাধী আমি। আমার কোন অধিকার নেই। কিন্তু একটি প্রশ্ন করতে পারি কী, ন্যায় সত্যের সেবক হিন্দু ধর্মের জয়ধ্বজাধারী আপনি একদিন আমার জীবনের একটি নিষ্ঠুর সত্যকে কেন গোপন করেছিলেন ?

গোপন করেছিলাম ? বিস্মিত হয়েছিলাম আমি। তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম।

সে তেমনি ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলেছিল, স্মরণ না হওয়াই স্বাভাবিক। আমাকে আপনার পিতা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মে পুণঃ দীক্ষিত করেছিলেন। কিন্তু যে ধর্ম আমি ত্যাগ করেছি, সে ধর্মকে আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারি নি। কারণ আমিও যে জানি, বিশ্বাস করি, ধর্ম মানুষের প্রাণের সম্পদ। চিণ্ময়ীর সম্পদ ছিলাম আমি। আমার ধর্মান্তরিত হওয়া সে সহ্য করতে পারেনি। মৃত্যুর কোলে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল সে। আর এ সংবাদটা মহানুভব আপনারা··· ··

তার কণ্ঠটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ডুকরে কেঁদে উঠেছিল যেন সে। আমি মূক নির্বাক।

তার কণ্ঠটা শোনা গিয়েছিল। ম্লান, বিষণ্ণ। আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ও যে জীবন দিয়ে করলো, তার জন্যে এতটুকু অশ্রুপাতও করতে পারলাম না আমি। জেনেছি, মাত্র কদিন আগে। এখন আর ফিরতে পারি না, ফেরার পথ রুদ্ধ।

ব্রজদাদা, এখন কী আমি ফিরে যেতে পারি না আমার সেই আগের জীবনটায় ? ফিরে পেতে পারি না সেই কত শত মধুর স্মৃতি জড়ানো দিনগুলোয় ! আমার হারিয়ে যাওয়া জীবনের স্বপ্ন কী আর কোনদিন খুঁজে পাব না আমি ?

মহেন্দ্রর কণ্ঠের ব্যাকুলতায় তার মুখের দিকে চাইলো ব্রজ। বিস্মিত হল। পরিচিত ছেলেটাকে চিনতে পারল না সে। বলল, এসব তুমি কী বলছো মহেনদাদা !

এ আমার প্রাণের কথা ব্রজদাদা।

না, না।

আমি আর পারছি না ব্রজদাদা। আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন সুস্থ স্বাভাবিক নই। এমনি চললে আমি পাগল হয়ে যাব।

কেন ?

কেন ? একটু চুপ করে রইলো মহেন্দ্র। ব্রজকে দেখলো। বলল, আমি রাতে ঘুমাতে পারি না ব্রজদাদা। সারা রাত আমি জেগে থাকি।

ঘুমাতে পার না ? জেগে থাক ? কেন ?

কেন ? কেন জেগে থাকি জান, ভয়ে। ভয়ে আমি দু চোখের পাতা এক করতে পারি না। আমার মনে হয়, আমি চোখ বুজলে, ঘুমিয়ে পড়লে, কারা যেন শাণিত ছুরিকা হাতে ওৎ পেতে বসে আছে। অপেক্ষা করছে সুযোগের। সে সুযোগ এলে আমাকে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না এতটুকু। আমার ঘুমটা ভেঙ্গে যায়, আমি জেগে উঠি। মনে হয়, স্বপ্ন দেখেছি—দুঃস্বপ্ন। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর ব্রজদাদা, আমি স্বপ্ন দেখিনি। সত্য সত্যই ··

কী? ব্রজ প্রশ্ন করল, কিন্তু উত্তর পেল না।

মহেন্দ্রর দু চোখে আতঙ্কের ছায়া। দুঃস্বপ্নের কথাটা মনে পড়ছে তার। ভয় পেয়েছে সে। কিন্তু তার সেই আতঙ্কের ভাবটা এক সময় অন্তর্হিত হল। স্বাভাবিকতা ফিরে এল ধীরে ধীরে। ব্রজর দিকে চাইল, তাকে দেখল। বলল, আমি রাজ্য সিংহাসন চাই না ব্রজদাদা।

চাও না?

না। সত্যি বলছি, দিন দিন আমি হাঁফিয়ে উঠছি। নির্মম শাসক হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেন?

আমাকে তাহলে নিষ্ঠুর হতে হবে। রাজ্যের জন্যে ভাইয়ের বুকে ছুরি চালাতে হবে। আর···

মহেন দাদা! ব্রজ যেন আর্তনাদ করে উঠল।

হ্যাঁ ব্রজদাদা। এতটুকু মিথ্যা বলছি না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার শুরু হয়েছে। হয়তো একদিন···। কথাটা শেষ করলো না মহেন্দ্র। বাইরে গোধূলির রক্তবর্ণ আকাশটার দিকে দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিল।

ব্রজ বলল, এই ষড়যন্ত্র তুমি কী শেষ করতে পার না?

পারি। কিন্তু আমি তা চাই না ব্রজদাদা। ভাইয়ের বুকের রক্তে হাত রঞ্জিত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু যাকে তুমি ভাই ভাবছো, সেও কী তোমাকে আজ ভাই বলে ভাবে?

না, ভাবে না। ব্রজদাদা, শুধু আমাকে নয়, হিন্দুদের আজ সে শত্রুজ্ঞান করে।

তাহলে তার জন্যে তোমার মনে আজ এ মায়া, মমতা কেন?

সে যে আমার ভাই ব্রজদাদা।

সে মুসলমান। আপন ধর্মকে ত্যাগ করেছে।

কিন্তু রক্তের রঙ তো তেমনি টক্‌টকে লালই আছে।

কিন্তু সে তো তোমাকে শত্রু ভাবে।

ভুল করে। আমিও একদিন এমনই ভুল করেছিলাম। আমিও তাকে শত্রুজ্ঞান করেছিলাম। সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে। আমি জানি, বিশ্বাস করি, তারও একদিন ভাঙ্গবে।

কবে ?

জানি না। কিন্তু ভাঙ্গবেই। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একদিন মোহনিদ্রা ত্যাগ করে জেগে উঠবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একে অন্যকে ভাই বলে স্বীকার করবে, বুকে জড়িয়ে ধরবে। কত দিন, কত শত বছর পরে সে দিন আসবে, আমি জানি না। কিন্তু আমি বলছি ব্রজদাদা, সেদিন আসবেই।

ব্রজ কথা বলল না, চুপ করে রইল। মহেন্দ্রও নীরব।

বাইরে আকাশের বুকে লালের আলপনা। পাখিরা শুরু করেছে বৈকালিক কাকলী। উতলা বসন্তের দিন নবীন কিশলয়ে সবুজ সতেজ।

মহেন্দ্রর গলাটা একসময় শোনা গেল। নিজের মনেই কথা বলে উঠল, মুক্তি চাই আমি, মুক্তি। আলো-বাতাস-মাটি। আমার মন আজ মুক্তি কাঙ্গাল।

ব্রজর বুকটা শিউরে উঠল শুধু! কথা বলল না সে।

শ্যামসুন্দরকে বুকের কাছে নিয়ে প্রাসাদশীর্ষে একাকিনী দাঁড়িয়েছিল মৃণ্ময়ী। সুন্দর মুখখানি বিষণ্ণ, ম্লান। উদাস দৃষ্টি। অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে। কেমন করে যে সব শেষ হয়ে গেল, শত চেষ্টাতেও ভেবে পায় না সে। মনে হয়, সত্য নয়, স্বপ্ন। মনের আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের ছবিটা আজ রাহুগ্রস্থ। দুষ্ট রাহু গ্রাস করেছে চাঁদকে।

অন্ধকারে ভরে গেছে বিশ্বপ্রকৃতি। এতটুকু আলো নেই, শুধু অন্ধকার। অন্ধকারের সমুদ্রে আজ দিশাহারা সে।

আকাশে গোধূলির রক্তরাগ। বাতাসে বসন্তের খুশীর ছোঁয়া। এমন দিনে মৃণ্ময়ীর মনটা কেমন যেন স্বপ্নময় হয়ে উঠতো। শিহরণ জাগতো ক্ষণে ক্ষণে। বিহ্বল মনটা লজ্জা পেত বারবার। কী এক দুরন্ত প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থাকতো সমস্ত সত্বা, কিন্তু সব শেষ। তিনটি বছর আগের স্বপ্নময়ী মেয়েটার হঠাৎ একদিন সবকিছু শেষ হয়ে গেল। পাষাণে পরিণত হল মনটা।

আঘাতের পর আঘাত। সকলে চলে গেল একে একে। মৃণ্ময়ী আজ একা। বড় নিঃসহায় মনে হয় নিজেকে। ইচ্ছা হয় সেও···। না, পারে না সে। পারে না ছেলেটার জন্যে। মাতৃহারা ছেলেটার সে ছাড়া আর যে কেউ নেই। আজ তিনটি বছর ওকে বুকে নিয়ে সব ভুলে আছে সে। কিন্তু আর পারে না। মৃণ্ময়ী আর পারছে না। এ জীবনটা আজ তার কাছে বড় দুঃসহ। স্বামীর কথা মনে পড়ে। তিনি তাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। যেতে পারেনি সে। পারেনি ছেলেটার জন্যেই। যদি···

না, না, পারবে না। মৃণ্ময়ী পারবে না। তার মাতৃহৃদয় সুন্দরকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। তবে? তবে কী করবে মৃণ্ময়ী? কী করবে সে?

আজ কদিন হ'ল চোখে ঘুম নেই। সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে। জেগে বসে থাকে চুপচাপ। তবু সেই ভয়ের ছায়াটা দূর হয় না। একটা দুঃস্বপ্ন দিন রাত্রি অষ্টপ্রহর ঘিরে থাকে তাকে। মুক্তি চায়, নিষ্কৃতি। পায় না। কেবলই মনে হয়···

না, না, সত্য নয়। মৃণ্ময়ী যা দেখেছে মিথ্যা, ভুল। স্বপ্ন কখনো সত্য হতে পারে না। তার দুর্বল মনের ভ্রম। সে···

না, না, তাইবা কী করে হয়! সে যে স্পষ্ট দেখেছে। যন্ত্রণায়

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে গিয়েছিল। পারেনি। যাকে দেখেছিল সেও তার পরিচিত, আপন জন। আজ দূরে সরে গেছে। বন্দী হয়ে আছে সমস্ত জীবনের জন্যে। কিন্তু সিংহাসন, রাজনীতি অসম্ভবকেও সম্ভব করে। স্বার্থ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে। এই হয়তো শেষ পরিণতি। হয়তো···

না, না! মৃদু আর্তনাদ করে উঠল যেন মৃণ্ময়ীর কণ্ঠটা।

দূরে নদী আকাশ আর নীড়াভিমুখী পাখিদের দেখতে দেখতে সেই আর্তনাদটুকু শুনতে পেল বালক। ফিরে তাকাল মায়ের মুখের দিকে। অবাক হ'ল। ডাকল, মা!

বালকের সে আহ্বান মৃণ্ময়ীর কানে পৌঁছাল না। চোখের জল যে অজস্র ধারায় ঝরে পড়ছে বুঝতে পারল না।

তোমার কী হয়েছে মা? এবার উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল বালক।

কী হবে? আশ্চর্য হল মৃণ্ময়ী। শ্যামসুন্দরের মুখের দিকে তাকাল।

তুমি কাঁদছো কেন মা?

কাঁদছি! অবাক হল মৃণ্ময়ী। চোখে হাত দিতেই বুঝতে পারল, সত্যই কাঁদছে সে। তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ দুটি মুছে ফেলল সে।

শ্যামসুন্দর ডাকল, মা।

কী বাবা?

তুমি কাঁদছিলে কেন মা?

কাঁদিনি বাবা।

তবে?

চোখে কী যেন একটা পড়েছিল। আমি বুঝতে পারিনি। কথাগুলো তাড়াতাড়ি বলল মৃণ্ময়ী। ওকে বোঝাতে চাইল।

হয়তো বুঝল না বালক। বলল, আমি অনেক সময় তোমার

চোখে জল দেখি। সব সময়ই তোমার চোখে কী পড়ে? আমি রাতে ঘুম ভেঙ্গে দেখতে পাই, তুমি জেগে বসে আছ! তুমি কাঁদছো। তুমি···

চল বাবা, আমরা নীচে যাই। ওর হাত ধরে নীচে নেমে এল মৃণ্ময়ী।

বালক একটিও কথা বলল না আর। প্রশ্ন করল না। কিছু জানতে চাইল না। হঠাৎ ছেলেটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে। মৃণ্ময়ীও কিছু বলতে পারল না। বলতে পারল না, কেন সে কাঁদছিল।

সেই রাত্রি।

ঘুমিয়ে পড়েছিল মৃণ্ময়ী। স্বপ্ন দেখছিল।

আজ বিকেলের পর থেকে ছেলেটা কেমন যেন নীরব। কথা বলেনি। রাত্রে বুকের কাছে শুয়ে অন্যদিনের মত গল্প বলতে বলেনি। মৃণ্ময়ী জিজ্ঞাসা করেছিল, গল্প শুনবে না সুন্দর?

ও বলেছিল, ঘুম পেয়েছে।

কিন্তু ও যে ঘুমায়নি, বুঝতে পেরেছে মৃণ্ময়ী। বেদনায় ভরে গেছে বুকখানা। ওকে কাছে টেনে নিয়েছে। দুই হাতে মৃণ্ময়ীর গলা জড়িয়ে ধরেছে শ্যামসুন্দর।

মৃণ্ময়ী ডেকেছে, সুন্দর!

মা। এবার সাড়া দিয়েছে শ্যামসুন্দর।

তোর বড় কষ্ট হয়, না রে?

কষ্ট?

হ্যাঁ।

না, মা।

তবে?

কী মা?

তবে তুই মাঝে মাঝে অমন হয়ে যাস কেন ? আমার সঙ্গে কথা বলিস না।

আমি তোমার কথা ভাবি যে ?

আমার কথা! আশ্চর্য হয় মৃণ্ময়ী।

হ্যাঁ! একটু চুপ করেছিল ছেলেটা। মৃণ্ময়ীর বুকে ঘন হয়েছিল আরো। মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, তোমার বড় কষ্ট, না মা ?

কষ্ট! মৃণ্ময়ীর কষ্ট ? তার যে কষ্ট হয়, যন্ত্রণা বোধ করে, তাও বুঝতে পারে ওই দুধের বালক! বুঝতে পারেন না শুধু···। না, না, তা কেন ? তিনিতো তাকে কোনদিন কষ্ট দেননি। বরং যাতে সে সুখী হয়, সেই চেষ্টাই করেছেন। নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সে-ই যায়নি। তাঁর শত অনুরোধেও ভাতুড়িয়া ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। কিন্তু কেন যে যায়নি, যেতে পারেনি, তাও বোঝাতে পারেনি সে। হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়েছেন তিনি, অভিমান জেগেছে, তাই জোর করেননি। আজও মাঝে মাঝে ব্রজ আসে। আগের দিনের মতই সে পাণ্ডুয়ার সংবাদ নিয়ে আসে। নিয়ে যায় ভাতুড়িয়ার সংবাদ। কিন্তু···

মা! শ্যামসুন্দর ডেকেছিল।

মৃণ্ময়ী বলেছিল, কী বাবা ?

একটা কথা বলবো ? বল রাগ করবে না ?

না বাবা।

চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

চলে যাব ?

হ্যাঁ মা।

কোথায় ?

তা জানি না। অনেকদূরে। অনেক, অনেকদূরে।

ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল মৃণ্ময়ী। তার মনের কথা। সেও তো এই চায়। অনেক, অনেকদূরে কোথাও চলে যেতে চায়। আর

সেই স্বপ্নই দেখছিল মৃণ্ময়ী। দূরের স্বপ্ন। অজানা পথে এগিয়ে চলেছে সে, একাকিনী।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল তার। রাধার মা ডাকছে। ফিরে এসেছে মহেন্দ্র।

অনেকক্ষণ পরে একসময় মৃদুকণ্ঠে মহেন্দ্র বলল, একটা কথা বলবো মৃণ্ময়ী?

স্বামীর বুকে মাথা রেখে আবেশেবদ্ধ আঁখি মৃণ্ময়ী সাড়া দিল, উঁ!

মহেন্দ্র বলল, চল মৃণ্ময়ী, আমরা কোথাও চলে যাই।

উঠে বসল মৃণ্ময়ী। বলল, কোথায় যাবে?

যেখানে হোক। অনেকদূরে। নতুন কোন দেশে। যেখানে আমাদের কেউ জানবে না, চিনবে না।

কিন্তু···। কী যেন বলতে গেল মৃণ্ময়ী।

বাধা দিল মহেন্দ্র। বলল, আমি পাণ্ডুয়া ছেড়ে চিরদিনের মত চলে এসেছি মৃণ্ময়ী। সেখানে আর আমি ফিরে যাব না কোনদিন।

কেন?

আমি মুক্তি চাই। রাজ্য আর রাজনীতর কঠিন বন্ধন আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছিল···

কিন্তু তুমি রাজ্য ত্যাগ করলে কে রাজা হবে? প্রজাদের দেখবে কে?

যে ছিল সেই দেখবে। আমি সেই ব্যবস্থা করে এসেছি।

বেশ।

যাবে তুমি?

কেন যাব না। তুমি যেখানে বলবে, সেখানেই যাব আ।ম।

আজই?

হ্যাঁ, আজই।

সেইদিনই রাত্রি শেষে ভোরের আলো তখন সবে মাত্র রাতের অন্ধকারকে ম্লান করে ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে। পাখিদের নীড়ে তখনও শুরু হয়নি জাগরণ। আকাশের বুক থেকে মিলিয়ে যায়নি তারারা। ভাতুড়িয়ার ঘাটে সুদূর যাত্রায় প্রস্তুত নৌকাখানিতে উঠে বসল ওরা। মহেন্দ্র আর মৃণ্ময়ী।

শ্যামসুন্দরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিল মৃণ্ময়ী। রাজি হয়নি মহেন্দ্র। সঙ্গে যেতে চেয়েছিল ব্রজ। কিন্তু তার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছে, তাতে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

মৃণ্ময়ী বলেছিল, ওকে তুমি···

বাধা দিয়েছিল মহেন্দ্র। বলেছিল, তাই করতে হবে। বিধর্মী হলেও পিতা। ও যদি সাবালক হত, যদি সঙ্গে যেতে চাইত, বাধা ছিল না। এখন ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কোন অধিকার আমাদের নেই মৃণ্ময়ী।

কোন অধিকার নেই। মহেন্দ্রর কথায় আঘাত পেয়েছিল মৃণ্ময়ী। বুকে যেন শেল হেনেছিল তার। অনেক কষ্টে সে আঘাত সহ্য করেছিল সে। ছেলেটা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে পালিয়ে এসেছিল সে।

বিদায় দিল ব্রজ। বৃদ্ধের দুই চোখে বেদনার অশ্রু। তবু সে হাসতে হাসতে বলল, ভাল থেক মহেন দাদা। বউমা, এ বুড়োটাকে ভুলে যেও না যেন।

ওরা দুজনের কেউই কথা বলতে পারল না। পারল না বিদায় নিতে। অশ্রু আজ বাঁধভাঙ্গা বন্যা যেন। ডুকরে কেঁদে উঠল মৃণ্ময়ী। ওর হাত ধরল মহেন্দ্র।

মহানন্দার বুকের ওপর দিয়ে ভোরের আবছায়া আলোয় এগিয়ে চলল মহেন্দ্রর নৌকাটি। সূর্য সন্ধানে নতুন জীবনের পথে যাত্রা

করল গণেশ নারায়ণের পুত্র কুমার মহেন্দ্র দেব। তীরের মাটিতে নীরব সাক্ষী ব্রজ। অতীতে ছিল সে, বর্তমানে আছে, হয়তো অনাগত ভবিষ্যতেও তাকে থাকতে হবে। দিন কাটবে তার দুরন্ত প্রতীক্ষায়। যদি ফিরে আসে। যদি কোনদিন···

৮২১ হিজরায় (১৪১৮ খ্রীঃ) আবার বাংলার মসনদে বসেছে জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ। দুশো বছরের মুসলমান শাসনের অবসানে হিন্দুর যে বিজয়পতাকা উড়েছিল বাংলার আকাশে, সে পতাকা একদিনও উঠল না আর। বাংলার বুকে আবার শুরু হল মুসলমান শাসন। আবার শুরু হল বাঙ্গালী হিন্দুর দুর্ভাগ্যের দিন। ব্যর্থ কান্নায় ডুকরে উঠল বাঙ্গালী। অশ্রু ঝরল অঝোর ধারায়। কিন্তু সে অশ্রু মুছিয়ে দেওয়ার জন্যে কেউ এগিয়ে এল না। বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল না কেউ। বলল না, বাংলা বাঙ্গালীর। বলল না, শাসক হয়েছো শাসন কর, কিন্তু অন্যায় কোর না। যদি অন্যায় কর, তাহলে সে অন্যায় সহ্য করবে না বাঙ্গালী। যে হাতে তুমি অত্যাচার করছো, সে হাত তোমার দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে দেব।

কেউ বলল না। কেউ না। বাঙ্গালী শুধু মার খেল, আর কাঁদল। প্রতিবাদ করতে কেউ এগিয়ে এল না।

৮২১ হিজরা থেকে ৮৩৬ হিজরা দীর্ঘ ষোল বছর বাংলার মসনদে বসে রাজত্ব করল জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ। একদিন শেষ হল তার দিন। বাংলার রাজধানী তখন গৌড়ে। গৌড়ের মসনদে বসল শামসুদ্দীন আহমদ শাহ। যদুর পুত্র। মাত্র তিনটি বছর। তিন বছর পরে একদিন দুই বান্দা সাদী খাঁন আর নাসির খাঁনের হাতে নিহত হল শামসুদ্দীন। শেষ হল বাংলার বুক থেকে রাজা গণেশ নারায়ণের বংশের রাজত্বকাল।

ফিরে আসেনি মহেন্দ্র দেব। পৃথিবীর জনারণ্যে চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে তারা। ব্যর্থ হয়েছে ব্রজর নীরব প্রতীক্ষা।

শেষ

মুসোলিনীর শেষ বিচার

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সেটা ১৯৩৯ সাল।

বিশ্বযুদ্ধের সবে শুরু। হিটলারের নাৎসী বাহিনী সমগ্র ইউরোপ দখল করছে। সঙ্গে জুটি হয়েছেন মুসোলিনী। একের পর এক দেশ দখল করবার পর শেষে একদিন স্তব্ধ হল এই যুদ্ধ ১৯৪৫ সনে। তারপরই বিচার আরম্ভ হল। নাৎসী বাহিনীর সমস্ত সমর নায়কদের। সঙ্গে মুসোলিনী। তারপর...

অদৃশ্য হাত

চিরঞ্জীব সেন

চিরঞ্জীব সেনের সি. আই. এ. ওপর লেখা এই গ্রন্থখানি পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করবে। সারা ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে এই সি. আই-এ চক্রের যে ভীষণ ক্রিয়া কলাপ চলছে লেখক এ গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।